القواعد الفقهية والأصولية
في ضوء الأحاديث النبوية

[আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ ওয়াল-উসুলিয়্যাহ
ফি যাওইল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ]

হাদিসের আলোকে

ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা

প্রফেসর ড.
আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী

القواعد الفقهية والأصولية
في ضوء الأحاديث النبوية

হাদিসের আলোকে

ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি
সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

হাদিসের আলোকে
ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা

মূলগ্রন্থ
আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ ওয়াল-উসুলিয়্যাহ ফি যাওইল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ

লেখক
প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি

সংস্করণ
আরবি ৩য় সংস্করণ: চট্টগ্রাম, ২০২১
বাংলা ১ম সংস্করণ: চট্টগ্রাম, ২০২২
ইংরেজি ১ম সংস্করণ: চট্টগ্রাম, ২০২২

ভাষান্তর
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন (প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম)
আব্দুস সালাম রিয়াদি (প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম)
হামেদ উল্লাহ বিন আহমদ উল্লাহ (শিক্ষক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম)

সার্বিক সমন্বয় ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
মাওলানা মাহমুদ মুজিব
শিক্ষক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম

মুদ্রণে
বুনন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

অঙ্গসজ্জা ও বর্ণবিন্যাস
আয-যিহান পাবলিকেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ
হাশেম আলী, থিম ডিজাইন হাউজ, ঢাকা

প্রকাশনায়
সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড পাবলিকেশন (CRP), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন (প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগ)

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
আল মানার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মাকতাবাতুন-নুর, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

শুভেচ্ছা মূল্য: ৮০০ (আটশত) টাকা মাত্র

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী। বাংলাদেশে উদার ও মধ্যপন্থী চিন্তাধারা প্রচারের অন্যতম অগ্রনায়ক, শীর্ষ ইসলামিক স্কলার ও ঝানু রাজনীতিবিদ। বহুমুখী সেবামূলক কাজে সপ্রতিভ, কর্মচঞ্চল, গুণী ও স্বনামধন্য এই প্রতিভাধর আলেমেদ্বীন। কর্মপাগল এ গুণীজন দ্বীন-ধর্ম, দেশমাতৃকা ও জাতির কল্যাণে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে প্রকাণ্ড সব কর্মযজ্ঞ নিরন্তর নিরলসভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছেন।
বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষার্ধে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বিখ্যাত মক্কার বাড়ির নিতান্ত সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম ধর্মভীরু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার, দাওয়াত ও তাবলিগে দ্বীনের স্বার্থে তার উর্ধ্বতনপুরুষ শেখ ইয়াসিন মক্কী (রহ.)-এর নেতৃত্বে মক্কা মুকাররামা থেকে তাঁর পূর্বপুরুষগণ এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।
জনাব নদভী চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইসলামি বিদ্যাপীঠ 'আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া' থেকে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের লাখনৌতে অবস্থিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা'য় ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সেরা ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট তিনি নানারৈখিক জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও ইসলামি গভীর চিন্তার পাঠ অর্জন করেন। ড. আবু রেজা নদভী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সুসম্পন্ন করে লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।
১৯৮৯ ঈসায়ি সনে বাংলাদেশের কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রত্যয় নিয়ে বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান যওক নদভী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ায় আরবি সাহিত্য ও হাদিসের শিক্ষক হিসেবে শুরু হয় ড. আবু রেজা নদভীর কর্মজীবন। এরপর ১৯৯৫ ঈসায়ি সনে তিনি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ২০১২ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যেসকল কীর্তিমান প্রাণপুরুষ নিজেদের নিঃস্বার্থ শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করেছেন এবং সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন, ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী তাঁদের অগ্রগণ্য। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, অবকাঠামোগত ও শিক্ষাগত সার্বিক উন্নয়ন

ও অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিদেশ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক ও যোগাযোগ জোরালো করার কাজে তিনি রাতদিন একাকার করে অন্তঃপ্রাণ হয়ে শ্রম দিয়েছিলেন।

২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম ১৫ আসনের এমপি নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি একাধিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও নেতৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি সংসদীয় মৈত্রী কমিটির সদস্য এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্টের সদস্য।

এছাড়া তিনি অসংখ্য সামাজিক, রাজনৈতিক, জনকল্যাণমূলক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন একটি জনকল্যাণধর্মী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বহুমুখী সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিমূলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর অধীনে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রায় ৭০০০টি জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ফাউন্ডেশন সেবামূলক কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, আমানতদারিতা, আস্থার একটি অসামান্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

২. এরাবিয়ান লিডারশীপ মাদরাসা।

৩. চিটাগাং ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল (সিআইএস)।

৪. আরব আমীরাত জনকল্যাণ শিক্ষা কমপ্লেক্স।

ড. আবু রেজা নদভী কেবল একজন প্রথাগত আলেম বা জনসেবক-ই নন। বরং, বহুমুখী প্রতিভাধর এ ইসলামিক স্কলার লেখালিখি, গবেষণা-আলোচনা, সভা সেমিনারে লেকচার, নানামুখী দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেও প্রতিনিয়ত বিশ্বময় দাওয়াতি অঙ্গনেও দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। বহু আন্তর্জাতিক গবেষণাধর্মী সেমিনারে তিনি প্রধান আলোচক ও গবেষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত একাধিক গবেষণা ও শিক্ষামূলক পুস্তক, অনুবাদগ্রন্থ, সম্পাদনা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর প্রায় অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অঙ্গনে একজন সফল মানুষের জীবন্ত প্রতিভা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর অসামান্য অবদানের মূল্যায়ণস্বরূপ বিগত ২০২১ সনে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

কৃতজ্ঞতা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় নবির ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কিরামের ওপর। যেসকল মনীষী ইসলামি আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে এবং এর গবেষণা ও উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে অবদান রেখেছেন তাঁদের জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি– আল্লাহ যেনো তাঁদের কঠোর শ্রম কবুল করেন এবং তাঁদেরকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করেন।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামি জীবনব্যবস্থার সার্বজনীনতা, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মেলে ইসলামি আইন, মূলনীতি ও ইসলামি বিচারব্যবস্থায়। ইসলামি আইন অন্যান্য মানবরচিত আইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর কোনো আইনের সাথে ইসলামি আইনের তুলনা চলে না। কারণ, এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র কিছু নীতিমালা (Principles)। এসব নীতিমালা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিকহশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে এগুলো বিভিন্ন স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। তন্মধ্যে "আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ্" (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) অন্যতম। যুগে যুগে এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আমি "আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ্ ওয়াল-উসুলিয়্যাহ্ ফি যাওইল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ্" (হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) শীর্ষক গ্রন্থখানা আরবি ভাষায় রচনা করি। পরে লক্ষ করে দেখি, এবিষয়ে আরবিতে প্রচুর কিতাবাদি থাকলেও বোধগম্য ভাষায় বাংলায় কোনো ডকুমেন্টারি গ্রন্থ নেই। বলা চলে বাংলায় এসম্পর্কিত গ্রন্থের শূন্যতা বিরাজ করছিলো। অন্তরে বিশ্বাস জন্মালো– এ বিষয়ে আমার স্বরচিত আরবি গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, পাঠকসমাজের মাঝে বিরাজমান শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হবে। কারণ, উপর্যুক্ত গ্রন্থে মোট ১০৭টি মূলনীতি স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক মূলনীতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, প্রামাণ্যসূত্র আয়াত ও হাদিস, সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্বসূরি উম্মতের বক্তব্য, ন্যায়নিষ্ঠ বিজ্ঞ মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণাপ্রসূত রায় ও যুক্তি ইত্যাদি বিষয় দিয়ে দলিলনির্ভর আলোচনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিটি মূলনীতির শেষে কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ ও সমকালীন মাসআলা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট মূলনীতিকে অধিকতর স্পষ্ট ও তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থে এমন কিছু মূলনীতি স্থান পেয়েছে যা সরাসরি বিচার বিভাগ ও

রাষ্ট্রপরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। বলা বাহুল্য, এসব মূলনীতি যেভাবে ইসলামের সার্বজনীনতা ও সামগ্রিকতার দিকটিকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রায়িত করে তোলবে, তেমনিভাবে দেশের আইনজীবীবর্গ, বিচারকমণ্ডলী ও মন্ত্রীবর্গকে ইসলামি আইনের আলোকে পরিচালিত বিচারকার্য ও রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে কিছুটা হলেও পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম হবে। কাজেই এসব তথ্য বাংলায় অনূদিত হয়ে আসা সময়ের দাবি ছিলো। অতএব যারা তাদের অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন, তারা সত্যিই আন্তরিক মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন (প্রভাষক, কুরআনিক সায়েন্সেস, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম), আব্দুস সালাম রিয়াদি (প্রভাষক, কুরআনিক সায়েন্সেস, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম) এবং হামেদ উল্লাহ বিন আহমদ উল্লাহ (শিক্ষক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম)। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

যাদের হাতে সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম পেয়েছে, তারা হলেন- ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হুসামুদ্দিন (বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামিয়া কলেজ চট্টগ্রাম), ড. এনামুল হক (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), ড. নাজমুল হক নদভী, (অধ্যাপক, হাদিস বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম), ড. সাউদ বিন মুহাম্মদ (সহকারী অধ্যাপক, দাওয়াহ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম) এবং শাইখুল আজম আবরার (প্রভাষক, হাদিস বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আল্লাহর নিকট তাদেরও উত্তম বিনিময় কামনা করি।

এছাড়াও গ্রন্থের অনুবাদকর্ম সম্পাদনে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা মাহমুদ মুজিব (শিক্ষক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম) ও আলাউদ্দিন কবির (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আল-হক)। আল্লাহ তাদেরকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আশা করি, ইসলামি আইন ও এর নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত এ বিষয়ক শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকগণ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি- তিনি যেনো গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের যাবতীয় ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিয়ে নিজের অনুগ্রহে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার অসিলা হিসেবে গ্রন্থটিকে কবুল করে নিন। আমিন।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৩০/০৮/২০২১ ইংরেজি

অভিমত

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল গাফফার শরিফ
সাবেক ডিন, শরিয়া অনুষদ, কুয়েত ইউনিভার্সিটি
সেক্রেটারি জেনারেল, কুয়েত পাবলিক ওয়াকফ ফাউন্ডেশন

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين.

ছয় বছর পূর্বে (১৪১৪ হি.) মদিনা শরিফে অনুষ্ঠিত একটি উৎসবমুখর মজলিসে বন্ধুবর শায়খ আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উক্ত মজলিসে আরো বহু প্রিয়জনদের উপস্থিতি ছিলো। তাঁর চারিত্রিক সুষমা এবং ইলম ও ওলামাপ্রীতি আমার মন ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে যুগশ্রেষ্ঠ দা'ই (দ্বীনি স্কলার), সর্বজনবরেণ্য স্কলার শায়খ আবুল হাসান আলি নদভীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিলো স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ইসলামি দাওয়াহর প্রতি তাঁর অনুরাগ-অনুরক্তি যেমন ছিলো লক্ষণীয়, তেমনি আরবি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো চোখে তাক-লাগানোর মতো। মনে হয় যেনো আরব বিশ্বেরই একজন সন্তান তিনি। তবে আমি বিস্মিত হইনি। কারণ, তিনি তো বাংলাদেশ-ভারতের নববি ইলমের আলোয় মুখরিত পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন। যেখানে ওলামায়ে কিরাম ইলমের পাশাপাশি আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন এবং যাবতীয় ইসলামি শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

যেহেতু বন্ধুবর আবু রেজা নদভী আমার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতেন, তাই তিনি তাঁর "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক অনবদ্য গ্রন্থটির ব্যাপারে আমার অভিমত প্রকাশের আবেদন করলেন। আমার দৃষ্টিতে গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য সমানভাবে গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ, অধিকাংশ 'কাওয়াইদ-উসুল' (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি)-এর গ্রন্থসমূহে মূলনীতিসংশ্লিষ্ট বর্ণনানির্ভর দলিল/Traditional Evidence (কুরআন, হাদিস, ইজমা ইত্যাদি) উপস্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এর কারণ হলো- হয়তো সংশ্লিষ্ট স্কলারদের মাঝে মূলনীতিসমূহ এতোই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, এগুলোর প্রামাণ্য দলিলের প্রয়োজন তখন অনুভব হয়নি; অথবা মূলনীতির প্রামাণিকতার জন্য তাঁরা শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর দলিল/Intellectual Evidence কে যথেষ্ট মনে করেছিলেন।

গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দ্রুত চোখ বুলানোর পর আমার মনে হয়েছে যে, গ্রন্থটি ছাত্র এবং শরয়ি জ্ঞানপ্রিয় পাঠকের জন্য খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। একইভাবে বিশেষজ্ঞ স্কলারগণও এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। মূলত এটি একটি নোটবই সমতুল্য, যেখানে পাঠকের জন্য প্রতিটি মূলনীতি উপস্থাপিত হয়েছে সুন্দর বাক্যমালার গাঁথুনি দিয়ে। মূলনীতির সমর্থনে বর্ণনানির্ভর দলিল উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে মূলনীতিকে আরো সমৃদ্ধ ও স্পষ্টকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহর নিটক প্রার্থনা, তিনি যেনো বন্ধুবর আবু রেজাকে জ্ঞানের এই সুদীর্ঘ যাত্রা পূর্ণ করার তাওফিক দেন এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ইখলাসের নেয়ামত দান করেন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল গাফফার শরিফ
১৩/০৪/১৪৩০ হিজরি

অভিমত

আল্লামা মুফতি জহুর আহমদ (রহ.)

প্রাক্তন প্রধান, ইফতা ও আইন বিভাগ, দারুল ওলুম নদওয়াতুল ওলামা ভারত

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।

মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছেন। হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থাবলি এবং আধুনিক রেফারেন্সবুকসমূহ থেকে বিপুলভাবে সহায়তা নিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের শিরোনামটি স্বাতন্ত্রিক উপকারী বৈশিষ্ট্যাবলির বিচারে নতুন ও অনন্য।

এসব উসুল ও কাওয়াইদকে (মূলনীতি ও বিধিসমূহকে) সুবিন্যস্ত ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপস্থাপনপূর্বক এসবের আলোকে আধুনিক মাসআলাগুলোর (আধুনিক সময়ের সমস্যাবলি) সমাধান বের করা খুব জরুরি ছিলো।

মাশাআল্লাহ, বর্তমান অভিসন্দর্ভের রচয়িতা সেই শূন্যতাপূরণে যথার্থ প্রয়াস পেয়েছেন। আর আগামীতেও এতে পরিবর্ধন ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন।

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি, আল্লাহ যেনো তাকে এই মহৎ গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে সমাপনের তাওফিক দান করেন। আমিন!

মুহাম্মদ জহুর নদভী
২৬/০৬/১৪১৩ হি.
২২/১২/১৯৯২ ইং.

অভিমত

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও স্কলার আল্লামা সৈয়দ সালমান আল-হুসাইনি নদভী

প্রধান, জামেয়া সৈয়দ আহমদ বিন ইরফান আশ-শহিদ, লাখনৌ, ভারত

সাবেক ডীন, শরিয়াহ অনুষদ, দারুল ওলুম নদওয়াতুল ওলামা, ভারত

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

প্রিয় স্নেহাস্পদ ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক যে গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য একটি কর্মযজ্ঞ। এমন একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া সময়ের দাবিও ছিলো বটে। মূলত আমার পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় তিনি এমন একটি সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। এতে ফিকহি-উসুলি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মূলনীতিসমগ্রের হাদিসীয় উৎস বর্ণনার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে এই গবেষণাকর্ম থেকে আমরা দুই দিক থেকে উপকৃত হতে পারবো।

প্রথম দিক: গ্রন্থে আলোচিত মূলনীতিসমূহের প্রামাণিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সাব্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি শরিয়া আইনের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ্‌র সাথে এগুলোর গভীর সূত্র প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় দিক: উসুলি-ইসলামি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসে নববির গবেষণা।

প্রিয় আবু রেজাকে এই সূক্ষ্ম উসুলি (মৌলিক) বিষয়ে গবেষণা চালানোর পরামর্শ আমি এ জন্য দিয়েছি যে- তার মাঝে আমি বহু গুণের সমাগম দেখতে পেয়েছি। জ্ঞানপ্রীতি, অধ্যয়ননিবিষ্টতা, পঠিত পাঠক্রম আয়ত্তের পারঙ্গমতা, আরবি ভাষায় গভীর দক্ষতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তি, নিরবচ্ছিন্ন কাজ করা এবং প্রয়োজনে এর জন্য রাত্রিজাগরণে বদ্ধপরিকর থাকা ইত্যাদি গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান।

আমার প্রবল বিশ্বাস, বাংলাদেশ থেকে আমাদের নিকট যারা আগমন করেছে, তাদের মধ্যে আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, ধীশক্তিসম্পন্ন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী পেয়েছি। অধ্যয়ন করা বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখা, যেকোনো বিষয় লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহর নিকট আমার প্রার্থনা, তিনি যেনো এ গ্রন্থকে আলোর মুখ দেখার তাওফিক দেন, বোদ্ধামহলে এর গ্রহণযোগ্যতা দান করেন এবং আলেম ও জ্ঞানপিপাসুদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। পরিশেষে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি– তিনি যেনো এ গ্রন্থকে লেখকের সৎ কর্মের পাল্লায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আমিন!

সালমান আল-হুসাইনি নদভী

২৬/১২/১৯৯২ ইং.

অভিমত

প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও ইসলামি স্কলার
আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভি
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদিস, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্রগ্রাম
সভাপতি, ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা বোর্ড)

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবিকুলের শিরোমণি আমাদের প্রিয় নবিজি মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবির ওপর।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে দু'কলম লিখতে বসেছি, যদিও আমি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত ও বার্ধক্যজনিত কারণে চলৎশক্তিহীন। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মেধাবী মুখ, গর্বিত ছাত্র প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (বর্তমান সংসদ সদস্য ও জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রামের হাদিস ও আরবি সাহিত্যের প্রাক্তন শিক্ষক) "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক তাঁর রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু লিখতে আবেদন করেছেন। জ্ঞাতব্য যে, কুয়েত সরকারের ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো প্রথম সংস্করণের পর আমি গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছিলাম। আমি দেখতে পাই যে— গ্রন্থটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তথ্যবহুল এবং কুরআন-হাদিস ও শরয়ি দলিলনির্ভর। লেখক ইসলামি আইনশাস্ত্রে শরয়ি বিধি-বিধান ও আহকাম 'ইসতিনবাত' (উদ্ভাবন) এবং ইসতিদলাল (দলিল পেশকরণ)-এর মূলনীতির বিবরণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। কাওয়াইদুল ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) এমন একটি শাস্ত্র যা থেকে সাধারণভাবে কোনো আলেম ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং বিশেষভাবে ফিকহ ও ফাতওয়া চর্চাকারী মুফতিগণ অমুখাপেক্ষী নন; বরং সকলেই সমানভাবে এর মুখাপেক্ষী।

বর্তমান সংস্করণটিতে নতুন আঙ্গিকে বেশ কিছু নতুন মূলনীতি, তদীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংযোজন করা হয়েছে। তাই এর মাঝে সার্বিক সৌন্দর্য ও বহুমুখী বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জ্ঞানের এ বিশেষ শাখায় লেখক অনন্য ও অগ্রগণ্য মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। কারণ, আমার জানামতে আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান সাহেবের "কাওয়াইদুল ফিকহ" ব্যতীত এই বিষয়ে বাংলাদেশী কোনো স্কলার স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। অতএব রচনাটি সত্যিই নতুন গবেষণাকর্ম ও নতুন সংযোজন। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডার ও লাইব্রেরিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

প্রিয় কীর্তিমান লেখকের জন্য আমার শুভ কামনা রইলো। আসলে মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে এমন প্রখর মেধা, অনুধাবনশক্তি, আরবি ভাষা দক্ষতা, সময়ানুবর্তীতা এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, রচনা ও গ্রন্থনা এবং সমাজসেবা ও রাজনীতিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। এটি তাঁর জন্য মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ, তিনি তো জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘরে লালিতপালিত হয়েছেন। তিনি তো নামযাদা প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, সুসাহিত্যিক আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য সন্তান ও তাঁর ইলমের উত্তরসূরী।

পরিশেষে রাব্বে করিমের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেনো গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন এবং আলেম ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করেন। আরো দোয়া করছি, তিনি যেনো এ গ্রন্থকে লেখকের নেকির পাল্লায় হিসাব করেন এবং তাঁকে দ্বীনের আরো বেশি খিদমতের সুযোগ করে দেন। আমিন!

মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী
২৫/১১/১৪৪১ হি.
১৬/০৭/২০২০ ইং.

অভিমত

শায়খুল হাদিস, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন
আল্লামা শায়খ আবদুল হালিম বুখারি (রহ.)
সাবেক মহাপরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম
সাবেক সেক্রেটারি, ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবিজি সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যিনি আস-সাদিক, আল-আমিন-এর উপাধিতে ভূষিত। আরো বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবির ওপর এবং অনাগত মানবতার ওপর যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণে নিবেদিত প্রাণ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম স্বভাবগতভাবে তার অনুসারীদের নিকট আবেদন রাখে- তারা যেনো জ্ঞানী ও শিক্ষিত হয়। কারণ, সাংস্কৃতিক দৈন্য পরিণতির দিক থেকে ঐশ্বরিক দৈন্য অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। জাতির মধ্যে যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতা এবং চিন্তা ও জ্ঞানগত শূন্যতা বিরাজ করবে তখন তারা কীভাবে ইসলামের মহান বাণী বহন ও সংরক্ষণ করবে। হজরত আবু উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

"আলেমের মর্যাদা আবেদ (ইবাদতগুযার)-এর ওপর তেমনই যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের ওপর।" অতঃপর তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও জমিনবাসী সকলেই এমনকি গর্তের পিপিলিকা এবং সমুদ্রগর্ভের মৎস্য পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দানকারীদের জন্য দোয়া করতে থাকে।" সাধারণভাবে জ্ঞানের যদি এমন গুরুত্ব ও মর্যাদা হয় তাহলে বিশেষভাবেত ইলমুল ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্রের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য শীর্ষে হবে নিঃসন্দেহে। তাই তো নবিজি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করেন।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফিকহশাস্ত্র মর্যাদার দিক থেকে অতিশয় মহান, উপকারিতার দিক থেকে অতিশয় বিস্তৃত, এবং সম্মানের দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মাপের একটি শাস্ত্র। কারণ, এর সাহায্যে হালাল-হারামের পরিচয় লাভ করা যায়। এজন্য এটিকে মানব জীবনের প্রতিটি সেক্টর পরিবেষ্টনকারী শাস্ত্র হিসেবে বিশেষিত করা হয়। নব আবির্ভূত নানা বিষয়াদি ও নানান সমস্যার সাথে যুৎসই এবং নমনীয় সমাধান এই শাস্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য। বস্তুত যারা এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে তারাই পারে আল্লাহপ্রদত্ত হুকুম-আহকাম ও শরিয়তের বিধি-বিধান মানব জীবনের প্রত্যেক সেক্টরে বাস্তবায়ন করতে; যাতে এর মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জন সম্ভব হয়।

বলা বাহুল্য, মুসলমানদের নিকট যখন ইলমুল ফিকহ-এর জন্য এমন মর্যাদা বা অবস্থান স্বীকৃত-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে এই শাস্ত্র থেকে নির্গত অন্যান্য ইলম বা শাখা শাস্ত্রের জন্যও বিশেষ শান ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এসব শাখা শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ইলমু কাওয়াইদুল ফিকহ (ইসলামি আইনের মূলনীতিশাস্ত্র)। এটি এমন একটি শাস্ত্র যা এই উম্মাহর বিদগ্ধ স্কলারগণ উদ্ভাবন করেছেন এমন কতিপয় সূত্র বা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যদ্দ্বারা ইসলামি আইনশাস্ত্রের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন শাখাগত বিষয়াবলিকে খুব সংক্ষিপ্ত ইবারতে (ভাষায়) সূত্রভুক্ত এবং একীভূত করা সম্ভব হয়। সেটি এভাবে যে, এই শাস্ত্র ইসলামি আইনশাস্ত্র ও তদীয় বিধি-বিধান ও 'ইল্লাত' (কার্যকারণ)সমূহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যস্ত করে যে, শাখা-প্রশাখাগত অনেক বিষয় রীতিসিদ্ধ একক সুতোয় গেঁথে যায়। এতে করে ফকিহ বা ইসলামি আইনবিদের জন্য যাবতীয় মাসআলা আয়ত্ত ও মুখস্থ রাখা এবং মুফতির জন্য ফাতওয়া চর্চা ও ফাতওয়া প্রদান করা সহজ হয়ে যায়। যারা গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন তাদের নিকট এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তো প্রাচীন ও বর্তমানকালে প্রত্যেক মাজহাবেই এই বিষয়ে রচিত হয়েছে হাজারো গ্রন্থ ও রচনাভাণ্ডার। এমনকি এর গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক চতুর্দশ শতাব্দীর স্কলারগণও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কাওয়াইদুল ফিকহ-এর বিশ্বকোষ তৈরির জন্য।

আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছি, যখন দেখেছি যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মেধাবী ছাত্র প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী -আল্লাহ

তাকে সত্যের পথে চলার তাওফিক দান করুন- (বর্তমান সংসদ সদস্য ও জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রামের হাদিস ও আরবি সাহিত্যের প্রাক্তন শিক্ষক) সাহেব যখন "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করেন।

গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় এবং এর গ্রন্থপঞ্জিতে দৃষ্টি বুলানোর পর আমার মনে হয়েছে— এটি অত্যন্ত উপকারী, তথ্যসমৃদ্ধ, গবেষণালব্ধ, সহজ পদ্ধতি ও সহজ ভাষার ওপর সন্নিবেশিত একটি অনন্য গবেষণা। বলা যায়, এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মুহতারাম লেখক যাদের কাওয়াইদুল ফিকহের গ্রন্থসমূহ আয়ত্তে নেই এবং এর পারিভাষিক নিয়ম-পদ্ধতিতে যাদের অনুশীলন নেই তাদের জন্য এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের এক অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলে শাস্ত্রীয় বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, মূলনীতি ও নতুন পরিভাষা অনুধাবনে পাঠকের যে সময় ব্যয় হতো, সে সময়টি তার সাশ্রয় হবে।

তিনি শুধু তালিবুল ইলমের জন্য নয়, বরঞ্চ বিশেষজ্ঞ আলেমের জন্য উপযোগী সব মূলনীতিসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিজ্ঞ লেখকের কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য শরয়ি দলিল দ্বারা মূলনীতিসমূহকে সমৃদ্ধিকরণ গ্রন্থটির সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতাকে আরো অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত তিনি গ্রন্থটিকে চমৎকারভাবে উপাদেয় করে লিখেছেন যা পাঠকের হৃদয়কে শীতল ও প্রশান্ত করবে।

তার এমন প্রতিভায় আমি বিস্মিত নই। কারণ, তিনি তো বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক ও কবি, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা আবুল বরকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)এর মতো সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান।

পরিশেষে মহান প্রতিপালকের দরবারে এই প্রার্থনা করছি— তিনি যেনো গ্রন্থটিকে কবুল করেন, এর দ্বারা তালিবুল ইলমদের উপকৃত করেন এবং সাথে সাথে তাঁর এ আমলটিকে যেনো কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ পূণ্যসহকারে নাজাতের ওসিলা করেন। আমিন!

মুহাম্মদ আব্দুল হালিম বুখারি
০৭/১২/১৪৪১ হি.
২৮/০৭/২০২০ ইং.

অভিমত

প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ধর্ম মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেয়া ইকরা, ঢাকা, বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিস দ্বীনিয়া বাংলাদেশ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا ومعلمنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

নিঃসন্দেহে 'কাওয়াইদুল ফিকহ' (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) এমন একটি শাস্ত্র যাকে ইসলামি জ্ঞানজগতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য ও গৌরবময় কীর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেসব শাস্ত্র নিরেট ইসলামি শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত, তন্মধ্যে 'কাওয়াইদুল ফিকহ' অন্যতম। মুসলমানদের হাতেই এ শাস্ত্রের নব রচনা সূচিত হয়। কোনো জাতির সভ্যতার ইতিহাসে এই ধরনের শাস্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অনন্য শাস্ত্র উদ্ভাবনের পেছনে মুসলমানদের লক্ষ্য ছিলো– ইসলামি আইনশাস্ত্রের পারস্পরিক সাযুজ্যপূর্ণ বিভিন্ন শাখাগত মাসআলাকে এক সুতোর গাঁথুনিতে সন্নিবেশিত করা। যাতে সে মাসআলাসমূহ সহজে আয়ত্ত ও মুখস্ত রাখা যায় এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। ফলে একজন মুজতাহিদ ফিকহের বিভিন্ন প্রায়োগিক উদাহরণ সহজে বের করতে সক্ষম হবেন, নব নব আবির্ভূত বিভিন্ন সমস্যার শরয়ি সমাধান দিতে পারবেন অনায়াসে। তিনি আরো সক্ষম হবেন শরিয়তের বিভিন্ন বিধান রচনার পেছনে যেসব অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলো অনুধাবনে। তখন তাঁর নিকট উত্থাপিত নতুন নতুন বিষয়ের শরয়ি সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা কমে যাবে।

তাই পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অসংখ্য স্কলারগণ এই শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় তাঁদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। তবে এই বিষয়ে বাংলাদেশি ওলামাসমাজের মধ্য হতে আল্লামা মুফতি সৈয়দ আমিমুল এহসান মুজাদ্দেদি বারকাতি (রহ.) রচিত "কাওয়াইদুল ফিকহ' গ্রন্থটি ব্যতীত অন্য কোনো আলেমের স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। অবশেষে "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। যা রচনা করেছেন প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যা-

লয় চট্টগ্রামের দা'ওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক)।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু দেখে মনে হলো, গ্রন্থটি পাঠকের জন্য খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। সহজ-সরল বাক্যমালা, প্রকৃষ্ট ও সাবলীল উপস্থাপনা-পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইত্যাদি গুণাবলি দ্বারা গ্রন্থটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রতিটি মূলনীতি প্রমাণে শরয়ি নুসুস (কুরআন-সুন্নাহ্‌র বক্তব্য) উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে মূলনীতিকে অধিক স্পষ্টকরণের প্রতি লেখক বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ফিকহশাস্ত্রে অসংখ্য মূলনীতির মধ্য হতে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি নির্বাচনের মাধ্যমে লেখক বিজ্ঞজনোচিত পরিচয় দিয়েছেন। এসব মূলনীতি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে কেউ-ই এর থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে না। আমার জানা মতে বাংলাদেশের কোনো আলেম ইতোপূর্বে এ পদ্ধতিতে "কাওয়াইদ ফিকহিয়্যাহ"সংশ্লিষ্ট কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। এই ময়দানে তিনিই প্রথম ও অগ্রগামী। লেখকের ভাষায় আমি বলতে চাই: "অত্র গবেষণাকর্মটি স্ববিষয়ে প্রথম উদ্যোগ, প্রথম পদক্ষেপ। যারা এ বিষয়ে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চায় তাদের জন্য এই গবেষণাকর্মটি হতে পারে একটি মাইলফলক বা রোডম্যাপ।"

আমি মনে করি, ছাত্ররা বিশেষ করে যারা ফিকহ ও ফতওয়া চর্চা করে, তাদের জন্য গ্রন্থটি খুবই জরুরি সাব্যস্ত হবে। গ্রন্থটি ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র) সম্পর্কে তাদের জ্ঞানজগৎ সমৃদ্ধ হবে। ফলে এই শাস্ত্রে রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ থেকে তারা উপকৃত হতে পারবে।

বর্তমান প্রজন্মকে ঘিরে এমন কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য লেখক সত্যিই আন্তরিক মোবারকবাদ ও বিশেষ দোয়া পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো সুধী মহলে এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেন এবং এর উপকার ব্যাপক করেন। আশা করছি, বর্তমান প্রজন্মের কল্যাণের জন্য লেখকের এই নিরলস সাধনা আল্লাহ অব্যাহত রাখবেন। তিনিই সফলতা ও তাওফিকদাতা।

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

১৯/০৮/২০২০ ইং.

অভিমত

মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া

মুহাদ্দিস ও মুফতি, আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, বাংলাদেশ

الحمد لله الذي أتقن دينه بالفقه وأصوله، والصلاة والسلام على محمد نبيه، وعلى آله وصحبه الذين أيدوا الشرع بفروعه وشموله، وعلى المجتهدين الذين مهدوا قواعد الفقه –بعون الله تعالى وحوله–.

নিঃসন্দেহে 'ইসলামি আইনতত্ত্ব ও নীতিমালাশাস্ত্র' অতিশয় উপকারী একটি শাস্ত্র, যা এর অধ্যয়নকারীকে মর্যদার সউচ্চ শিখরে উন্নীত করে। তাই ইসলামি স্কলারগণ বলেছেন:

مَنْ حُرِمَ الْأُصُوْلَ حُرِمَ الْوُصُوْلَ

"কোনো শাস্ত্রের মূলনীতিতে যার ব্যুৎপত্তি নেই, সেই শাস্ত্রের গন্তব্যে পৌঁছা তার পক্ষে অসম্ভব।" মূলত 'ইসলামি আইনতত্ত্ব ও নীতিমালাশাস্ত্র' সেসব মৌলিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত একজন মুফতি কিংবা বিচারকের পক্ষে শরয়ি বিধিবিধান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এমনকি এই শাস্ত্রে চরম উন্নতির শিখরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত একজন মুজতাহিদ (ইসলামি আইনগবেষক) শরয়ি বিধি-বিধান উদঘাটনে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হন। কারণ, এই শাস্ত্রের ওপরই শরিয়তের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই শরয়ি বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। তাই তো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামা কিরাম এই শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শাস্ত্র ইজতিহাদের সবচেয়ে নিকটতম ও সহযোগী মাধ্যম। অতএব ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ আয়ত্ত করা এর শাখাগত বিধিবিধান আয়ত্তের পেছনে শ্রম ব্যয়ের তুলনায় অধিক শ্রেয়।

সুতরাং যারা ফিকহশাস্ত্র তথা ইসলামি আইন গবেষণায় নিবেদিত, তাদের উচিত গবেষণার প্রাথমিক সময় ফিকহের মূলনীতিসমূহ অধ্যয়নে ব্যবহার করা। যদি মুসলিমরা এই জ্ঞানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত থাকতো, তবে এর পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করা তাদের জন্য খুবই সহজ ও স্বস্তিকর মনে হতো। মূলত ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালাকে সর্বপ্রথম শাস্ত্র ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তারপর এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত থেকে শুরু করে মাঝারি ও বৃহদাকারের বিভিন্ন গ্রন্থাবলি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এই শাস্ত্রে কলম ধরার জন্য প্রত্যেক যুগেই বিদগ্ধ ওলামা কিরামের আবির্ভাব ঘটে। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যার যার ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির অনুসরণ করে। ফলে এক পর্যায়ে এই শাস্ত্রে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলাদেশে অসংখ্য বিদগ্ধ ওলামা কিরামের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কারো পক্ষ থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ শাস্ত্রে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ

পরিদৃষ্ট হয়নি। তাই আমি খুবই পুলকিত হই যখন শ্রদ্ধাষ্পদ ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী রচিত "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক গ্রন্থের ব্যাপারে জানতে পারি। আমার জানামতে, লেখক এমন একজন প্রতিভাশালী আলেম যাঁর মাঝে সমন্বয় ঘটেছে আল্লাহপ্রদত্ত তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অসাধারণ উপলব্ধিশক্তি। আরবি ভাষায় তাঁর রয়েছে অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাঁর তড়িৎ উদ্যোগ গ্রহণ ও দ্রুত কার্যসম্পাদনের যোগ্যতা তাঁকে করে তুলেছে অনন্য। তাই তো রাজনৈতিক, সামাজিক ও জ্ঞান-তাত্ত্বিক ময়দানে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে উৎকর্ষের শিখরে অবস্থান করছেন।

অতএব এতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না, এই শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থের তুলনায় তার রচিত গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলে। আর এমন হবেই তো! তিনি তো জ্ঞান-প্রজ্ঞার গৌরবোজ্জ্বল পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন। দেশ-বিদেশের সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী ও আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কিরামের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন।

গ্রন্থের সূচিপত্রসহ বিভিন্ন স্থানে চোখ বুলানোর পর আমার মনে হয়েছে– গ্রন্থটি চমৎকার, সুখপাঠ্য ও খুবই উপকারী। উপস্থাপনা পদ্ধতি, বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাশৈলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনন্য বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। আশা করা যায়– গ্রন্থটি পাঠকমহলে বেশ প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হবে, এর ফায়েদা ব্যাপক-বিস্তৃত হবে।

অতএব, বিভিন্ন জামেয়া ও মাদরাসার পরিচালক ও দায়িত্বশীলদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে, তাঁরা যেনো এই গ্রন্থটিকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে পাঠ্যভুক্ত করেন। আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা সুদূরপ্রসারী করে দেন এবং ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের উপকারে ব্যবহৃত হবার উপযোগিতা দান করেন। আশা করছি, আল্লাহ তাঁকে এ ধরনের ইলমি কীর্তির জন্য আরো বেশি বেশি তাওফিক দান করবেন।

মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া
১৭/০৮/২০২০ ইং.

অভিমত

ড. গিয়াস উদ্দিন তালুকদার
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান, ইসলমি ব্যাংক শরিয়া বোর্ড
চেয়ারম্যান, শরিয়া বোর্ড, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বিশেষজ্ঞতা মানুষকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। মৌলিক-সামগ্রিক বিষয়ের পরিবর্তে গৌণ-আংশিক বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে। মূলত বিশেষজ্ঞতার কনসেপ্টটি শুনতে বেশ ভালো লাগে এবং উত্তরোত্তর এর প্রচলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এর কারণে যে জ্ঞানস্বল্পতা ও স্থূলতা সৃষ্টি হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি তখন এমন সব ক্ষুদ্র মলিকিউলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, যা উদঘাটনে অনেক সময় Magnifying Glass (বিবর্ধক কাচ)-এর প্রয়োজন পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞতা মানে অন্যান্য অপরিহার্য দিগ-দিগন্ত থেকে চোখ বুজে রাখা। আর ইসলামের মতো উদারনৈতিক শরিয়ত (জীবনবিধান)-এর সাথে এই অধুনা স্থূল চিন্তাধারা মোটেও খাপ খায় না। যে শরিয়তের উৎস হলো সেই কুরআনে কারিম, যাকে অবতরণকারী সর্বজ্ঞ স্রষ্টা অভিহিত করেছেন: "প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ" হিসেবে। যে শরিয়তের জ্ঞানের ঝর্ণাধারা উৎসারিত সে সত্যবাদী মহাপুরুষের কাছ থেকে যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বমর্মী বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী আমাদের হৃদয়জগৎকে সম্বোধন করে বলে: "আমাকে পূর্বেকার ও পরবর্তীদের সমস্ত জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

মূলত ইসলামি শরিয়তের সার্বজনীনতা ও সামগ্রিকতার প্রমাণ আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ, তৎকালে দেখা যেতো– একজন তাফসিরবিশারদ ছিলেন একজন দার্শনিক, একজন দার্শনিক ছিলেন একজন ডাক্তার, একজন ডাক্তার ছিলেন ইসলামি আইনবিশারদ, একজন ইসলামি আইনবিশারদ ছিলেন একজন গণিতশাস্ত্রবিদ, আর একজন গণিতশাস্ত্রবিদ ছিলেন একজন হাদিসবিশারদ। আমাদের প্রতীতি, শ্রদ্ধেয় আবু রেজা নদভী এই হারানো কাঙ্ক্ষিত ঐতিহ্য বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মাঝে পুনঃবিকাশের মাধ্যমে তাঁর সফলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাঝে বহু প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। তিনি একাধারে ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক, সমসাময়িক বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, ইতিহাসবিদ, অতি পরিব্রাজক, দক্ষ কলম সৈনিক, তুমুল বিতার্কিক, সাহসী রাজনীতিবিদ, সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিবেদিত একজন কর্মনিষ্ঠ সেবক। তাঁর রচিত গ্রন্থ: "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সফল গ্রন্থ। গ্রন্থটি অধ্যয়নে মনে হয় জ্ঞান যেনো তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে, অস্পষ্টতা ও সংশয়ের যাবতীয় ধূলিকণা দূরীভূত হয়েছে, অজ্ঞতার মরীচিকা কেটে গিয়েছে এবং বিবেকের স্থূলতা ও জড়তা যেনো ধীরে ধীরে লোপ পেতে চলেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) গ্রন্থটি যেনো একটি পাসকোড, যার সাহায্যে ফিকহ (ইসলামি আইন)-এর জগতে বিচরণ করে যাবতীয় ফিকহি সূত্র ও মূলনীতি কাজে লাগিয়ে বাস্তবতা উদঘাটন সম্ভব।

(২) এটি যেনো একটি মনিটর, যাতে ফিকহের রকমারি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়। যেকোনো কাল ও স্থানে, যেকোনো নতুন জীবনোপকরণ ও সমস্যা সমাধানে ফিকহের নমনীয়তা ও উপযোগিতা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৩) এতে আলোকপাত করা হয়েছে ইসলামি বিধি-বিধানের অলৌকিকতা এবং প্রমাণ করা হয়েছে মানব রচিত আইনের ওপর ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ।

(৪) এতে ইসলামি আইনশাস্ত্রের প্রত্যেক মূলনীতির সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্র দলিল উল্লেখের পাশাপাশি শরিয়তের বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(৫) এটি এমন এক চাবিকাঠি যা বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে ফিকহের দুর্বোধ্য রহস্য এমনভাবে খুলে উপস্থাপন করে যে, মেধাবী ও মেধাহীন সকলেই তা অনুধাবনে সক্ষম হয়।

(৬) গ্রন্থের বাক্যমালা সুবিন্যস্ত, বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কারপূর্ণ। বর্ণনা এতো দীর্ঘ না যাতে বিরক্তি চলে আসে এবং এতো সংক্ষিপ্তও না যাতে ত্রুটি রয়ে যায়। গ্রন্থটি এতো সহজ যে, পাঠক তা লাইন-বাই-লাইন মুখস্থ ও আত্মস্থ করতে পারবে।

(৭) সমসাময়িক সমস্যা সমাধানে গ্রন্থটি একজন মুজতাহিদ কিংবা গবেষকের জন্য সহায়ক সাব্যস্ত হবে। পাশ্চাত্যের আমদানিকৃত সমাধানের পরিবর্তে ইসলামি সমাধান উদঘাটনে অনন্য পাথেয়রূপে ভূমিকা রাখবে।

অবশেষে এই গ্রন্থের ব্যাপারে আমি তা-ই বলতে চাই যা কুয়েতের শ্রদ্ধেয় ড. আব্দুল গাফফার শরিফ গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন: "প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি একটি অভিধান; ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক-তত্ত্বাবধায়ক, এডভোকেট-বিচারক এবং মুকাল্লিদ-মুজতাহিদ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবে বলে আমি আশা করছি।"

ড. গিয়াস উদ্দিন তালুকদার
তারিখ: ০৩/০৬/২০২১ইং.

অভিমত

মুফতি ওয়ালিউর রহমান খান আল-আযহারী

মুহাদ্দিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
খতিব, গাওসুল আজম জামে মসজিদ উত্তরা-১৩

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

শরয়ি জ্ঞানান্বেষণ অন্যতম মানবিক সুকুমারবৃত্তি ও আল্লাহপ্রদত্ত এক প্রকৃষ্ট অনুগ্রহ হিসেবে পরিগণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার তাওফিকপ্রাপ্ত হয়, জ্ঞানান্বেষণ তার জন্য গৌরবজনক ও সম্মানবর্ধক সাব্যস্ত হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সবচেয়ে সম্মানজনক ও গুরুত্ববহ জ্ঞান হলো "আল-ফিকহুল ইসলামি" (ইসলামি আইনশাস্ত্র)। এই শাস্ত্রের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহর অমোঘ বাণী থেকে প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾

"অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেনো বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।"[১]

অন্যদিকে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ (গভীর জ্ঞান) দান করেন।"[২]

মুসলিম উম্মাহর নিকট ফিকহশাস্ত্রের সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই তো সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়িন ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ শাস্ত্রের প্রতি এতোই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, এক পর্যায়ে ফিকহকে (ইসলামি আইনশাস্ত্র) কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাজহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সেগুলো দিগ-দিগন্তে প্রচার-প্রসার লাভ করে। অতএব এই শাস্ত্রের যখন ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং তা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গ্রন্থবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে, তখন এর থেকে বিভিন্ন শাখাশাস্ত্র উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো "ইলমু কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ" (ইসলামি আইনশাস্ত্রের নীতিমালাশাস্ত্র)। এই শাস্ত্রের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো– তা অসংখ্য শাখাগত বিষয়াবলিকে একটি সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ মূলনীতির আওতায় সন্নিবেশিত করে।

---

[১] সূরা আত-তাওবা: ১২২

[২] বুখারি ও মুসলিম

এতে করে সেসব মাসআলা আয়ত্ত করা এতোই সহজ সাব্যস্ত হয় যে, ফাতওয়া, ইজতিহাদ কিংবা কোনো শরয়ি বিধান বাস্তবায়নের সময় খুব সহজেই সেগুলো স্মৃতির পাতায় উপস্থিত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তির পর থেকেই এই শাস্ত্র জ্ঞানের জগতে বিশেষ গুরুত্বের কেন্দ্রে অবস্থান করে আসছে। তাই তো প্রত্যেক মাজহাবের পূর্ববর্তী-পরবর্তী বিদগ্ধ স্কলারদের হাতে এই শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন- শ্রদ্ধেয় আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (হাফি.) (সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ; গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন; অধ্যাপক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)।

গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠায় আলতো নজর বুলানোর পর এর বেশ কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গি, সহজ-সরল ভাষা, চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা-পদ্ধতি, স্পষ্ট ভাষায় উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ–এসব বিষয় আলোচ্য গ্রন্থকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। সব স্তরের পাঠকের জন্য গ্রন্থটি মানানসই। যে কেউ এর থেকে উপকৃত হতে পারবে, কোনো প্রকার অস্পষ্টতা কিংবা দুর্বোধ্যতার গেঁড়াকলে না পড়েই। লেখক গ্রন্থের প্রতিটি ফিকহি মূলনীতির সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বক্তব্য ও ইজতিহাদের বিভিন্ন উৎস থেকে দলিলনির্ভর আলোচনা উপস্থাপনের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। বর্ণনা এতো দীর্ঘ না যাতে বিরক্তি চলে আসে কিংবা এতো সংক্ষিপ্ত-ও না যাতে ক্রটি রয়ে যায়। ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রে যেসব মূলনীতির অনির্বচনীয় গুরুত্ব রয়েছে, সেসব মূলনীতিকে আলোচনায় স্থান দিয়ে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করে লেখক জ্ঞানতত্ত্বের জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, ইতোপূর্বে তিনি সমাজসেবা ও রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গর্ভনর থাকাবস্থায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিভিন্ন ইসলামি কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, অসংখ্য দাওয়াতি পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি। ভুলে গেলে চলবে না যে, 'হারামাইন শরিফাইন'-এর সম্মানিত ইমামদের বাংলাদেশ সফরসংক্রান্ত সর্বপ্রকারের ব্যবস্থাপনা তাঁরই একান্ত তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছিলো।

অবশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো সম্মানিত লেখককে ইলমের খিদমতের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এ ধরনের আরো কল্যাণময় উপহার দিয়ে পাঠক সমাজকে সমৃদ্ধ করে যাবেন।

মুফতি ওয়ালিউর রহমান খান আল-আযহারী
১০/০৮/২০২০ইং.

১ম সংস্করণের অবতরণিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালকের যিনি বান্দাদেরকে তাঁর সরল পথে পরিচালিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যিনি পরম আমানতদার ও উম্মি, যিনি নিখিল বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। যিনি দ্বীনের নীতিমালার ভিতকে মজবুত ও সুদৃঢ় করেছেন এবং প্রজ্ঞাময় ইসলামি জীবনবিধান ও তদীয় নিদের্শনাকে সুচারুরূপে অঙ্কিত করেছেন। পাশাপাশি শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ, এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করে, তাঁদের সকলের ওপর।

যেসব জ্ঞানভাণ্ডার বহুকাল ধরে জনসাধারণের মুখে মুখে বর্ণিত হয়ে এসেছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে সংরক্ষিত হয়েছে এবং ইসলামি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে- সম্ভবত তন্মধ্যে ফিকহি (Islamic Jurisprudential) জ্ঞানভাণ্ডার হচ্ছে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। কারণ, মানব জীবনের প্রত্যেকটা ইটের গাঁথুনি নির্ভর করে ইসলামি ফিকহশাস্ত্র-এর ওপর, এর পারদর্শিতার ওপর, এবং এর স্ববিস্তারে জ্ঞান লাভের ওপর। এই শাস্ত্র এতো মহান যে তা মানবতার সৌভাগ্য নিশ্চিত করে। কারণ, ইসলামি আইন প্রণয়নের মূলভিত্তি তথা "মানবতার কল্যাণকে অবাধকরণ ও অনিষ্টকে প্রতিহতকরণ" শীর্ষক মূলনীতি এই শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।

শরয়ি দলিল থেকে সংগৃহীত এই শাস্ত্র মুজতাহিদ ইমামগণের যুগেই সমৃদ্ধি লাভ করা শুরু করে এবং পর্যায়ক্রমে তার সংকলন ও স্বতন্ত্র গ্রন্থায়ণ শুরু হয়। এই সংকলন প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবনের পাশাপাশি ইসলামি আইনশাস্ত্রের উন্নয়নে আইনবিদগণ নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ইসলামি আইনশাস্ত্রের খিদমতে আইনবেত্তাগণ যুগ যুগ ধরে যে বিশাল ত্যাগ ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো উসুলুল ফিকহের (ইসলামি আইনতত্ত্ব/Principles of Islamic Jurisprudence) সেসব গ্রন্থভাণ্ডার এবং তথ্যসূত্রসমূহ যাতে উসুলবিদ এবং ফিকহবিদগণ ফিকহের উসুল (ইসলামি আইনতত্ত্ব) এবং শাখা-প্রশাখাগত বিবিধ বিষয়কে নানা পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন।

ফিকহি জ্ঞানসমগ্রের (Islamic Jurisprudential Literature) প্রথম সমষ্টি গঠিত হয় সেসব গ্রন্থপঞ্জি দ্বারা যেগুলো ইসলামি আইনতত্ত্বের বিভিন্ন কাওয়াইদুল উসুল (Methodological Rules) এর ওপর সন্নিবেশিত। দ্বিতীয় সমষ্টি গঠিত হয় ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত কিংবা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবা-তাবেয়িনের উক্তি থেকে গৃহীত বিশ্লেষণমূলক বিষয়াদি দ্বারা।

সেসব শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াদির ক্রমবর্ধমান আধিক্য ও বহুমাত্রিকতার অন্যতম ফসল হচ্ছে- জ্ঞান জগতে আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামি আইনশাস্ত্রের

মূলনীতি)-এর উৎপত্তি এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ। কারণ, ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ কুরআন-সুন্নাহ্‌র গভীর গবেষণা, শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াদির সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং শরয়ি বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত রহস্য নির্ণয় এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়েগের মাধ্যমে এইসব সারগর্ভ মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন যেগুলো চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্ট ফিকহ্ বিষয়ক নানা শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম শাস্ত্ররূপে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে।

একটি গবেষণাকর্ম শুরু করার ব্যাপারে মনস্থির করার পর আমি তার শিরোনাম নিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। দীর্ঘ ইতস্তত ও প্রচুর দ্বিধার পর যে বিষয়টি আল্লাহর রহমতে আমার গবেষণার শিরোনাম হিসেবে গৃহীত হয় তা হলো-

"القواعد الفقهية والأصولية في ضوء الأحاديث النبوية" "হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা"। কারণ, আমি এমন একটি বিষয় নির্ণয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলাম, যে বিষয়টি গবেষণার উপযুক্ত ও হকদার এবং উপাদেয়ও বটে। আমি আশা করি- গবেষণাকর্মটি আমার নিজের জন্য এবং গবেষক মহলের জন্য বেশ উপকারী হবে। কারণ, গবেষণকর্মটি দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সন্নিবেশিত:

এক. ইসলামি আইনশাস্ত্র ও তদীয় নীতিমালা বিষয়ক মূলনীতিগুলো বের করা।

দুই. সেসব হাদিস উদ্ধৃত করা যা উল্লিখিত মূলনীতিগুলোর জন্য প্রযোজ্য।

আমার বিশ্বাস যে, এই পদ্ধতিতে উপর্যুক্ত বিষয়ে কোনো গবেষণাকর্ম ইতোপূর্বে সম্পাদন করা হয়নি। আমরা যখন ইসলামি আইনশাস্ত্র ও তদীয় নীতিমালা বিষয়ক মূলনীতিসংশ্লিষ্ট গ্রন্থরাজিতে দৃষ্টি দিই তখন দেখতে পাই যে, সেগুলো নিছক মূলনীতিসমূহের বিবরণের ওপর সন্নিবেশিত। কিন্তু তাতে মূলনীতির দালিলিক হাদিসসমগ্রের কোনো উদ্ধৃতি-বিবৃতি বিদ্যমান নেই। হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি হাদিসের উদ্ধৃতি চোখে পড়ে যা একেবারেই নগণ্য। এসব কারণে বলতে পারি যে, এই গবেষণাকর্মটি স্ববিষয়ে এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ, প্রথম পদক্ষেপ। যারা এই বিষয়ে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চায় তাদের জন্য এই গবেষণাকর্মটি হতে পারে একটি মাইলফলক বা রোডম্যাপ। আমি মহান রব সমীপে বিনীত প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাকে এই ক্ষুদ্র গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তাওফিক দান করেন। আমি যা লিপিবদ্ধ এবং সংকলন করেছি তার প্রতিটি বিষয়ের সাথে যেনো থাকে বিশুদ্ধতা ও সার্থকতা। সফলতার চাবিকাঠি মহান রাব্বুল আলামিনের হাতে। তিনিই একমাত্র সরল পথ প্রদর্শনকারী।

এ গ্রন্থ রচনায় আমি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি তা হলো- প্রথমে আমি মূলনীতিগুলোকে বর্ণানুক্রমে উদ্ধৃত করেছি। অতঃপর তুলনামূলক কঠিন মূলনীতিগুলোর সরল ব্যাখ্যা পেশ করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেসব হাদিসের উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছি যা মূলনীতির দালিলিক ভিত্তিতুল্য। কেননা মূলনীতি হাদিস থেকেই

সংগৃহীত। অতঃপর কতিপয় শাখাগত মাসআলা উল্লেখ করেছি যা ঐ মূলনীতি থেকে নির্গত হয়।

জ্ঞাতব্য যে, এই গবেষণাকর্মে আমার কর্মপন্থা সাধারণ গবেষকদের কর্মপন্থার চেয়ে ব্যতিক্রম। তাই গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভাজন না করে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাজিয়েছি। যেমন, প্রথমে মুকাদ্দিমা বা অবতরণিকা, তারপর রয়েছে বিষয়সংশ্লিষ্ট পরিভাষা, কায়িদা বা মূলনীতিসমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবরণ। অতঃপর মূল বিষয় সম্বলিত একুশটি মাবহাস বা গবেষণা বিষয় (অধ্যায়)। এর প্রত্যেকটি মাবহাসে রয়েছে বর্ণানুক্রমে সাজানো ইসলামি আইনশাস্ত্র ও আইনতত্ত্ব বিষয়ক মূলনীতি। অতঃপর সেসব হাদিসের উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছি যা মূলনীতির দালিলিক ভিত্তিতুল্য। এতে সর্বসাকুল্যে সাতাত্তরটি (৭৭) কায়িদা (মূলনীতি) স্থান পেয়েছে।[১]

পরিশেষে, এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে যাঁরা আমাকে তাঁদের বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ ও অকৃপণ সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে ধন্য করেছেন, তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে আমার উস্তাদদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আল্লামা সালমান হুসাইনি নদভীর নাম স্মরণ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার, যা গবেষণার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আমার এই কাঙ্ক্ষিত গবেষণাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা প্রদান করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক, বর্তমানে ব্রিটেনে দাঈ ও মুবাল্লিগ হিসেবে অবস্থানরত বন্ধুবর মাহমুদুল হাসানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি তথ্যসূত্র পর্যালোচনা ও হাদিসের তাখরিজের (তথ্যসূত্র উল্লেখ) মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এভাবে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট তাদের উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা করি। অবশেষে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেনো এই কর্মযজ্ঞের শুভ সমাপ্তির ফায়সালা করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সাড়াদানকারী।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
২০/০৮/২০০৭ ইং.

[১] পরবর্তীতে আরো ত্রিশটি কায়িদা সংযোজনের পর বর্তমান কায়িদা সংখ্যা ১০৭ পর্যন্ত উপনীত হয়েছে।

২য় সংস্করণ নিয়ে কিছু কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মোহাম্মদের ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নবির আবির্ভাব হবে না।

"আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ্ ওয়াল-উসুলিয়্যাহ্ ফি যাওইল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ্" (হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) শীর্ষক স্বরচিত গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে। তখন গ্রন্থের ১৫০০ কপি ছাপানো হয়েছিলো-যেগুলো ইতোমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে।

এক্ষেত্রে আমি অন্তরের গভীর থেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি, যা ইসলামি বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। প্রকৃতপক্ষে যদি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতা না থাকতো, তবে এ গ্রন্থ হয়তো প্রকাশনার আলো দেখতে পেতো না।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে যেনো প্রকারান্তরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" রাসুলের এ পবিত্র বাণীর অনুসরণে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় ডেপুটি মিনিস্টার ড. আদিল আব্দুল্লাহ আল-ফালাহ (হাফি.)-এর প্রতি। আমি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করছি যে, তিনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন এবং অদ্যাবধি করে যাচ্ছেন। তিনি সর্বদা আমাকে জ্ঞানচর্চা, দাওয়াতি কার্যক্রম ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রকাশে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে।

সাথে সাথে আমি বিনয়াবনত হয়ে স্মরণ করছি কুয়েত পাবলিক ওয়াকফ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনেরাল ড. মুহাম্মদ আব্দুল গাফফার শরিফের অনুগ্রহের কথা, যিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত দিয়ে আমার এ গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি- জ্ঞানের জগৎ ও দাওয়াতের ময়দানে যেসব মহামানব তাঁদের অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে এ দু'জন ব্যক্তি অন্যতম।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক (বর্তমানে অধ্যাপক) মোহাম্মদ রশিদ জাহেদ সাহেবের প্রতি, যিনি 'ইমলা' (বানানতত্ত্ব) ও 'তারকিম' (যতিচিহ্নের ব্যবহার)-এর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব কামাল উদ্দিনের প্রতি, যিনি এ গ্রন্থ প্রকাশে তার নিরলস প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে আমি 'কায়িদা'-এর অর্থ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং এর প্রামাণিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য যোগ করেছি।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি- তিনি যেনো আমাদের কর্মক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও উত্তম পরিসমাপ্তি দান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বশ্রোতা ও দ্রুত সাড়াদানকারী।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
তারিখ: ২০/০৮/২০০৭ ইং.

৩য় সংস্করণ নিয়ে কিছু কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মোহাম্মদের ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নবির আবির্ভাব হবে না।

"আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ্ ওয়াল-উসুলিয়্যাহ্ ফি যাওইল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ্" (হাদিসের আলোকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিমালা) শীর্ষক স্বরচিত গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থের সব কপি ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। দেশি-বিদেশি জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের পক্ষ থেকে গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের উপর্যুপরি আবেদন আসছিলো। তাই আমি পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ৩য় সংস্করণের জন্য নতুন করে ১০০০ কপি ছাপানোর সংকল্প করলাম।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে যেনো প্রকারান্তরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" রাসুলের এ পবিত্র বাণীর অনুসরণে আমি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডেপুটি মিনিস্টার ড. আদিল আব্দুল্লাহ আল-ফালাহ (হাফি.)-এর প্রতি। মূলত এ গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। কারণ, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণ অর্থায়নে।

অনুরূপভাবে আমি কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেসব সম্মানিত ওলামায়ে কিরামের প্রতি, যারা তাঁদের মূল্যবান অভিমত দিয়ে আমার এ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন–

১. কুয়েত ইউনিভার্সিটির শরিয়া অনুষদের সাবেক ডিন ড. মোহাম্মদ আব্দুল গাফফার শরিফ

২. দেশবরেণ্য ইসলামি স্কলার ও খ্যাতনামা আরবি সাহিত্যিক, আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার বাংলাদেশ শাখার প্রধান ও আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সভাপতি, শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভি (হাফি.)

৩. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রামের সাবেক মহাপরিচালক, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের সাবেক সেক্রেটারি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারি (রহ.)

৪. প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার ও চিন্তাবিদ আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
৫. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি, জনাব শামসুদ্দীন জিয়া।

এছাড়া বাংলাদেশের আরো অন্যান্য প্রতিভাশালী ওলামায়ে কিরামের অভিমতও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার হাদিস ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক আমিনুল্লাহ এবং জামেয়া দারুল মা'আরিফের শিক্ষক (বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইনের প্রতি। তারা দু'জনই 'ইমলা' (বানানতত্ত্ব) ও 'তারকীম' (যতিচিহ্নের ব্যবহার)-এর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থের সম্পাদনা করেছে।

পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জামেয়া দারুল মা'আরিফের শিক্ষক স্নেহভাজন মাহমুদ মুজিবের প্রতি, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থটি সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই সংস্করণে আমি বেশ কিছু নতুন 'কায়িদা' (মূলনীতি) যোগ করেছি। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'কায়িদা'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন 'কায়িদা'-এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। ফলে এই সংস্করণে 'কায়িদা' সংখ্যা ১০৭ পর্যন্ত অতিক্রম করে।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের কর্মে একনিষ্ঠতা ও উত্তম সমাপ্তি দান করেন।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
তারিখ: ২৮/০৫/২০২১ ইং.

সূ/চি/ক্র/ম

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
'কায়িদা' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৪৩
'ফিকহি কায়িদা' ও 'ফিকহি জাবিত' এর মাঝে পার্থক্য	৪৫
'ফিকহি কায়িদা' ও 'উসুলি কায়িদা' এর মধ্যে পার্থক্য	৪৬
'কাওয়াইদুল ফিকহ' এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪৮
'কাওয়াইদুল ফিকহ' এর প্রয়োগক্ষেত্র	৫০
কাওয়াইদুল ফিকহ এর প্রামাণিকতা	৫১
প্রথম অধ্যায় الف/আলিফ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি কোনো ইজতিহাদ তার সমপর্যায়ের অন্য ইজতিহাদ দ্বারা প্রত্যাখাত হবে না	৫৩
দ্বিতীয় মূলনীতি কার্যের বিচার হয় তার অন্তনির্হিত নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে	৬০
তৃতীয় মূলনীতি সকল বস্তুর ক্ষেত্রে মৌলিক বিধান হলো বৈধতা	৬৬
চতুর্থ মূলনীতি শরিয়তের মূলনীতি হলো- নব উদ্ভূত ঘটনাকে নিকটতম সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করা	৭১
পঞ্চম মূলনীতি কোনো বিষয়ে সংকট বা কষ্ট সৃষ্টি হলে, সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রশস্ততা চলে আসে। উক্ত বিষয়ে প্রশস্ততা এলে বিধান (পুনরায়) সংকুচিত হয়ে যায়	৭৩
ষষ্ঠ মূলনীতি ইসলাম সর্বদা প্রাধান্য পাবে, কখনো অপ্রধান বা গৌণ হবে না	৭৬

সপ্তম মূলনীতি জরুরি অবস্থা অন্যের অধিকার হরণের বৈধতা প্রদান করে না	৭৮
অষ্টম মূলনীতি সম্পদের সাথে আল্লাহর অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সম্পদ স্থানান্তর কিংবা রূপান্তরের অধিকার নিষিদ্ধ হয় না	৮০
নবম মূলনীতি রীতিসিদ্ধ অনুমতি মৌখিক অনুমতির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য	৮১
দশম মূলনীতি সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের প্রামাণিকতা	৮৩
একাদশ মূলনীতি বিপরীত মর্মের প্রামাণিকতা	৮৭
দ্বাদশ মূলনীতি সাধারণ-শর্তহীন অনুজ্ঞার দাবি হলো- কাজের একবার অনুশীলন বা পুনঃপুন অনুশীলন	৯৬
ত্রয়োদশ মূলনীতি 'মুরসাল' হাদিসের প্রামাণিকতা	১০০
চতুর্দশ মূলনীতি আম্‌র (অনুজ্ঞা)-এর দাবি হলো (কোনো কাজের) বাধ্যবাধকতা সাব্যস্ত হওয়া	১০২
পঞ্চদশ মূলনীতি সাধারণ-শর্তহীন 'আম্‌র' (অনুজ্ঞা) অবিলম্বে কর্মসম্পাদন কামনা করে কিংবা বিলম্বে কর্মসম্পাদনের অবকাশ প্রদান করে	১০৪
ষষ্ঠদশ মূলনীতি নাহ্‌য়ি (নিষেধাজ্ঞা)–এর অন্তর্নিহিত দাবি হলো অসিদ্ধতা কিংবা অকার্যকরতা	১০৬
সপ্তদশ মূলনীতি যখন কোনো বিষয়ে হালাল ও হারাম একত্রিত হয়, তখন হারামকে হালালের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে	১১০
অষ্টাদশ মূলনীতি যদি দুটি ক্ষতি একত্রিত হয়, তখন গুরুতর ক্ষতি দূরীকরণের স্বার্থে লঘুতর ক্ষতিতে জড়ানো যায়	১১৫
ঊনবিংশ মূলনীতি স্বীকারোক্তি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল, যা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে	১১৭
বিংশ মূলনীতি যখন আসল-মূল বস্তু বাতিল হয়ে যায়, তখন তা বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত হয়	১১৯
একবিংশ মূলনীতি বিচারকের নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণ করা পিতার নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণের সমতুল্য	১২১

দ্বাবিংশ মূলনীতি পাপিষ্ঠদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের তুলনায় পুণ্যবানদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা অধিক শ্রেয়	১২২
ত্রয়োবিংশ মূলনীতি যখন একই ধরনের দুটি ইবাদত একত্রিত হয় এবং উভয়টি সমপর্যায়ের হয়	১২৩
চতুর্বিংশ মূলনীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে বিধান, উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রয়োগ হবে	১২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

الباء/বা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি অতীতে যা যে অবস্থায় ছিলো, পরবর্তীকালেও তা সে অবস্থায় বলবৎ থাকা-ই শরিয়তের মূলনীতি	১২৭
দ্বিতীয় মূলনীতি প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীপক্ষের দায়িত্ব, আর কসম করবে বিবাদী	১৩০
তৃতীয় মূলনীতি দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা-ই মৌলিক বিধান	১৩২
চতুর্থ মূলনীতি (বিচারালয়ে উপস্থাপিত) প্রমাণ সংক্রমণশীল দলিল এবং স্বীকারোক্তি সীমাবদ্ধ দলিল	১৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

التاء/তা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি প্রজাদের ওপর হস্তক্ষেপ তাদের কল্যাণের মধ্যেই সীমিত থাকবে	১৩৭
দ্বিতীয় মূলনীতি প্রয়োজনের সময়ে বিবরণ প্রকাশ না করে বিলম্ব করা বৈধ নয়	১৪১
তৃতীয় মূলনীতি অগ্রাধিকার প্রদান সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না	১৪৩
চতুর্থ মূলনীতি "মূলনীতি হলো- একই বিষয়ের দু'টি মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বিরোধপূর্ণ হলে, যে মতের ওপর আমল করলে উভয় মতের শব্দের ওপর আমল হয়ে যায়, সেটি গ্রহণ করা উত্তম	১৪৬

পঞ্চম মূলনীতি মালিকানার কারণ-মাধ্যম পরিবর্তন হওয়া বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হওয়ার নামান্তর	১৪৮
ষষ্ঠ মূলনীতি হারাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বনও হারাম	১৫১
সপ্তম মূলনীতি কোনো বস্তুর নিষিদ্ধতা এর অন্তর্নিহিত নিকৃষ্টতা ও ক্ষতিকে কেন্দ্র করেই সাব্যস্ত হয়	১৫৩
অষ্টম মূলনীতি প্রবল ধারণা শরয়ি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি অন্য কোনো দলিল বিদ্যমান না থাকে	১৫৬
নবম মূলনীতি অপবাদ (বিচারসংশ্লিষ্ট) কার্যাবলিকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ করে	১৫৯
দশম মূলনীতি (বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে অন্যের) অনুগামী বিষয় (বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অন্যের) অনুগামী	১৬১

চতুর্থ অধ্যায়

ثاء/সা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

মূলনীতি অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের মতো	১৬৪

পঞ্চম অধ্যায়

جيم/জিম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি সুদ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভালো এবং মন্দ উভয়টি সমান	১৬৮
দ্বিতীয় মূলনীতি গৃহপালিত পশুর অনিষ্টাচরণে ক্ষতিপূরণ নেই	১৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

حاء/হা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি সন্দেহের কারণে 'হুদুদ' (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) রহিত হয়ে যায়	১৭২
দ্বিতীয় মূলনীতি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে বলে কারো অধিকার রহিত হয় না, যদিও অতিবাহিত সময়ের পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয়	১৭৫
তৃতীয় মূলনীতি কার্যকারণের সাথে বিধানের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা আবর্তিত হয়	১৭৬

সপ্তম অধ্যায়

خاء/খা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি খবরে ওয়াহিদ (শরিয়তস্বীকৃত) মূলনীতির পরিপন্থী হলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে	১৭৯
দ্বিতীয় মূলনীতি বিচারকের (রায় প্রদানে) ভুল হলে, এর ক্ষতিপূরণ 'বায়তুল মাল' (ইসলামি রাষ্ট্রীয় কোষাগার) বহন করবে	১৮২
তৃতীয় মূলনীতি (লাভ-লোকসানের) ঝুঁকি বহনের শর্তেই মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়	১৮৪

অষ্টম অধ্যায়

دال/দাল দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি হানাফি স্কলারদের মতে 'আম' (ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ)-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য হয়	১৮৭
দ্বিতীয় মূলনীতি শাফেয়ি ও হাম্বালি স্কলারদের মতে 'আম' (ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ)-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য ধারণানির্ভর হয়	১৮৯

নবম অধ্যায় راء/রা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি বর্ণনাকারী নিজের বর্ণনা অস্বীকার করলে কিংবা বর্ণিত হাদিসের বিপরীত কার্যকলাপে জড়িত হলে, তাঁর বর্ণিত হাদিসটির ওপর আমল করা হবে না	১৯৪
দ্বিতীয় মূলনীতি মূলনীতি হলো, যেসব শর্তের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে বৈধতার রুখসাত প্রদান করা হয়, সেসব শর্তের কোনো একটি লঙ্ঘিত হলে হারামের মৌলিক বিধানটি আবারও ফিরে আসবে	১৯৯
দশম অধ্যায় زاء/যা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি	
মূলনীতি হানাফি বিশেষজ্ঞদের মতে, নসের (শরিয়তের বক্তব্যের) সাথে কিছু যোগ করা এর বিধান রহিত করার নামান্তর	২০২
একাদশ অধ্যায় ضاد/দোয়াদ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি ক্ষতি (যেকোনো মূল্যে) অপসারণ করতে হবে	২০৮
দ্বিতীয় মূলনীতি যা অপরিহার্য, তা নিষিদ্ধ বিধান বা বস্তুকে বৈধ করে দেয়	২১৪
তৃতীয় মূলনীতি যা অপরিহার্য, তার ব্যবহার প্রয়োজন অনুপাতেই নির্ধারিত হয়	২১৮
দ্বাদশ অধ্যায় عين/আইন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি (আইন প্রণয়নে) সামাজিক রীতি নিয়ামকরূপে বিবেচ্য	২২১
দ্বিতীয় মূলনীতি চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচ্য হয়, শব্দ ও সাংকেতিক চিহ্ন (বিবেচ্য) নয়	২২৭

তৃতীয় মূলনীতি দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতা	২৩০
চতুর্থ মূলনীতি খবরে ওয়াহেদ এবং কিয়াস পরস্পরবিরোধী হলে, খবরে ওয়াহেদ-এর ওপর আমল করা হবে	২৩৪
পঞ্চম মূলনীতি (ধাররূপে) গৃহীত বস্তু ফেরত না দেয়া পর্যন্ত গ্রহীতা দায়বদ্ধ থাকবে	২৩৮
ষষ্ঠ মূলনীতি নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিক অবস্থা হলো- অবিদ্যমানতা	২৪০
সপ্তম মূলনীতি অধিকাংশের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ হয়, বিরল বিষয় অবিবেচ্য	২৪২
ত্রয়োদশ অধ্যায় غين/গাইন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি	
মূলনীতি লাভ যেখানে ঝুঁকিও ঠিক সেখানেই	২৪৪
চতুর্দশ অধ্যায় فاء/ফা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি	
মূলনীতি কোনো নাম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলে, এর অর্থ নির্ধারণে প্রচলিত রীতি বিবেচ্য হয়	২৪৮
পঞ্চদশ অধ্যায় قاف/ক্বফ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি সচরাচর ঘটে থাকে– এরূপ কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদকে গ্রহণ করা	২৫২
দ্বিতীয় মূলনীতি পুরনো জিনিসকে পুরনো অবস্থাতেই বহাল রাখা হয়	২৫৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায় كاف/কাফ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি যেকোনো ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া কিংবা পান করা হারাম	২৫৯
দ্বিতীয় মূলনীতি লিখিত বিবরণ উক্তির সমতুল্য	২৬১
তৃতীয় মূলনীতি যেসব প্রাণীর কারণে মানুষের জান বা মালের ক্ষতি সাধিত হয় তা হত্যা করা বৈধ	২৬৩
সপ্তদশ অধ্যায় لام/লাম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি নস (কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল) বিদ্যমান থাকতে ইজতিহাদ (গবেষণাপ্রসূত মত প্রদান)-এর কোনো সুযোগ নেই	২৬৬
দ্বিতীয় মূলনীতি জুলুমের কারণে জালেমের কোনো হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না	২৭০
তৃতীয় মূলনীতি শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া কারো জন্য অন্য কারো সম্পদ অধিকার করা বৈধ নয়	২৭৩
চতুর্থ মূলনীতি চুপ থাকা ব্যক্তির দিকে কোনো উক্তির সম্বন্ধ করা যাবে না	২৭৬
পঞ্চম মূলনীতি কালের বিবর্তনে বিধি-বিধানের পরিবর্তন অনস্বীকার্য	২৭৯
ষষ্ঠ মূলনীতি তাসরিহ (সুস্পষ্ট ভাষ্য)-এর উপস্থিতিতে দালালাত (শব্দের নির্দেশগত অর্থ)-এর কোনো মূল্য নেই	২৮১

অষ্টাদশ অধ্যায়

مِيْم/মীম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

প্রথম মূলনীতি ইসলামের যে বিধান কিয়াস-যুক্তির ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়নি...	২৮৪
দ্বিতীয় মূলনীতি কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে	২৮৭
তৃতীয় মূলনীতি সহজসাধ্য বিষয় কষ্টসাধ্য বিষয়ের কারণে বিলুপ্ত হয় না	২৯৩
চতুর্থ মূলনীতি শরিয়তের দৃষ্টিতে অজ্ঞাত বস্তু অস্তিত্বহীন কিংবা সাধ্যাতীত বস্তুর মতো	২৯৭
পঞ্চম মূলনীতি মুসলমানরা যা উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম বলে বিবেচিত	৩০০
ষষ্ঠ মূলনীতি যা আমাদের থেকে অদৃশ্য (দৃষ্টির অগোচরে), সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না	৩০১
সপ্তম মূলনীতি অস্পষ্ট বিশেষ ইঙ্গিতসূচক উক্তি মিথ্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দেয়	৩০৪
অষ্টম মূলনীতি শরিয়তসমর্থিত নীতিমালা শর্তসাপেক্ষ নীতিমালার ওপর অগ্রগণ্য থাকবে	৩০৭
নবম মূলনীতি যা কর্মে অধিক (সাওয়াব ও) মর্যদায়ও তা অধিক	৩১১
দশম মূলনীতি হারাম বা অবৈধের দিকে যা নিয়ে যায় তাও হারাম	৩১৩
একাদশ মূলনীতি মুসলমানের ধন-সম্পদ কোনো অবস্থায় অন্য মুসলমানের জন্য গনিমতরূপে বৈধতা পাবে না	৩১৫
দ্বাদশ মূলনীতি যা গ্রহণ করা অবৈধ তা প্রদান করাও অবৈধ	৩১৭
ত্রয়োদশ মূলনীতি যার কর্মসম্পাদন নিষিদ্ধ তার আবেদনও নিষিদ্ধ	৩১৭
চতুর্দশ মূলনীতি যার ব্যবহার অবৈধ তা গ্রহণ করাও অবৈধ	৩১৭

পঞ্চদশ মূলনীতি যে চাপের মুখে নয়, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর শর্তারোপ করে তা তার ওপর আবর্তিত হয়	৩২০
ষষ্ঠদশ মূলনীতিঃ ব্যক্তি নিজ স্বীকারোক্তির কাছে দায়বদ্ধ	৩২২
সপ্তদশ মূলনীতি পাওনার [ভাগ-বাটোয়ারা] নিষ্পত্তি [পরস্পরের] শর্তানুযায়ী হবে	৩২৪
ঊনবিংশ অধ্যায় نون/নুন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি হাদিস বিশেষজ্ঞরা যে প্রসিদ্ধ হাদিসকে (হাদিসে মাশহুর) গ্রহণ করেছেন তার মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ (কুরআন)-এর বিধানকে রহিত করা বৈধ	৩২৬
দ্বিতীয় মূলনীতি কোনো বিষয়ে সাধারণভাবে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধতার দাবি করে	৪২৭
বিংশ অধ্যায় واو/ওয়াউ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি	
মূলনীতি বিশেষ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সাধারণ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অপেক্ষা শক্তিশালী হয়	৩৩০
একবিংশ অধ্যায় ياء/ইয়া দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা	
প্রথম মূলনীতি সন্দেহের কারণে দৃঢ় বিশ্বাস দূরীভূত হয় না	৩৩৪
দ্বিতীয় মূলনীতি পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে বহির্গমন মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)	৩৩৯
তৃতীয় মূলনীতি সামর্থ্যানুযায়ী কৃত শর্ত মেনে চলা আবশ্যক	৩৪৩

চতুর্থ মূলনীতি কর্তৃত্ব ক্ষমতাপ্রয়োগ সাব্যস্ত করে তবে মালিকানা সাব্যস্ত করে না	৩৪৫
পঞ্চম মূলনীতি ব্যাপক ক্ষতি রোধ করার জন্য বিশেষ ক্ষতি সহ্য করতে হবে	৩৪৬
ষষ্ঠ মূলনীতি সকল প্রশাসনিক দায়িত্বে স্ব-স্ব স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ বিধানে যোগ্যতরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে	৩৪৮
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা	৩৫০
গ্রন্থপঞ্জি	৩৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

কায়িদা-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

কায়িদা[১]-এর আভিধানিক অর্থ:

'কায়িদা' (قاعدة) শব্দটির অর্থ হলো- বুনিয়াদ, ভিত্তিমূল, স্তম্ভ (Foundation/Basis)। অর্থাৎ, যার ওপর কোনো বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয় তাকে কা'য়িদা বলা হয়। 'কায়িদা' শব্দটি একবচন, এর বহুবচন 'কাওয়াইদ'(قواعد), যার অর্থ: কোনো বস্তুর ভিত বা বুনিয়াদসমূহ। হোক সে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন- "قَواعِد البَيْت" তথা ঘরের ভিত বা খুঁটি (এখানে ঘর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু); কিংবা হোক তা বিমূর্ত, যেমন- "قَواعِد الدِّيْن وَدَعائِمُه" তথা দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদসমূহ (এখানে দ্বীন এমন বিষয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়)।[২] পবিত্র কুরআনে কাওয়াইদ শব্দটি একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে।

কায়িদা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামি আইন বিশারদগণ কায়িদা -এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।
এক দলের মতে কায়িদা হলো- "এমন এক সামগ্রিক বিষয়, যা তার অন্তর্গত সমস্ত শাখা-প্রশাখার ওপর প্রয়োগ হয়।"[৩] কারো কারো মতে, "এটি এমন এক সামগ্রিক নীতি, যা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্গত শাখাসমূহের বিধি-বিধানকে পরিব্যাপ্ত করে।"[৪]

মুহাম্মাদ আলি থানভি (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, "বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় এর কয়েকটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়:

'কায়িদা' শব্দটি ভিত্তি (الأصل), আইন-কানুন (القانون), মাসআলা (المسألة), নিয়ম-বিধি (الضابط) ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (المقصد) প্রভৃতি শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

---

[১] বাংলা পরিভাষায় কায়িদাকে 'মূলনীতি' বলা হয়।

[২] রাগিব আল-ইস্পাহানি, আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, পৃ. ৪০৯; আলি জুমআ, আল-মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাজাহিবিল ফিক্হিয়্যা, পৃ. ৪০৪।

[৩] শরিফ আল-জুরজানি, আত-তারিফাত, পৃ. ১৭১।

[৪] আবুল বাকা আল-কাফাভি, আল-কুল্লিয়্যাত, পৃ. ৭২৮।

আর এর সংজ্ঞা হলো- "তা এমন এক সামগ্রিক বিষয়, যা তার অধীন সমস্ত শাখার ওপর প্রযোজ্য হয় এবং এর সাহায্যে এসব শাখা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যায়।"[১]

প্রখ্যাত স্কলার আল্লামা তাফতাজানি [মৃ.৭৯১ হিজরি] (রহ.) 'কায়িদা'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "এটি এমন এক সামগ্রিক বিধান, যা তার অধীন শাখাসমূহের ওপর প্রয়োগ হয়; যাতে এর সাহায্যে শাখা-বিষয়ের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।"[২]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে 'কায়িদা'-এর একটি সাধারণ পরিভাষা সুস্পষ্ট হয়। মূলত এই পরিভাষার ব্যবহার সকল শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, প্রত্যেক শাস্ত্রের কিছু কায়িদা (মূলনীতি বা নীতিমালা) রয়েছে। সুতরাং সব শাস্ত্রের পরিভাষায় 'কায়িদা' হলো- এমন একটি সামগ্রিক বিষয়, যা তার অন্তর্গত সকল শাখা-প্রশাখার ওপর প্রয়োগ হয়। কিছু কায়িদা 'উসুলুল ফিকহ' (ইসলামি আইনতত্ত্ব)সংক্রান্ত, আর কিছু আইনশাস্ত্রসংক্রান্ত, আবার কিছু কায়িদা রয়েছে যা নাহুশাস্ত্র (আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র)-এর সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণত, নাহুশাস্ত্রে বলা হয়- কর্তৃকারক (Subject) রফা[৩] বিশিষ্ট হয় (الفاعِلُ مَرْفوْع), কর্মকারক (Object) নসব বিশিষ্ট হয় (المفعول منصوب) ও সম্বন্ধসূচক পদ যর বিশিষ্ট হয় (المضاف إليه مجرور)।

উসুলবিদগণ বলে থাকেন, (শরিয়তের) অনুজ্ঞা বাধ্যবাধকতা আরোপের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হয় (الأمْرُ لِلْوُجُوْب) আর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হয় নিষিদ্ধতা আরোপের জন্য (النهي للتحريم) ইত্যাদি। মোটামুটি কথা হলো- নাহুশাস্ত্র, উসুলুল ফিকহ কিংবা অন্য যেকোনো শাস্ত্রের কায়িদা (মূলনীতি) তার অধীন সব শাখার ওপর প্রয়োগ হবে, কোনো শাখা তার আওতার বাইরে যাবে না। উল্লেখ্য, কোনো বিচ্ছিন্ন শাখা মূলনীতির (কায়িদার) আওতার বাইরে থেকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন বিষয়টি ধর্তব্যের বাইরে থাকবে এবং অবিবেচিত বলে গণ্য করা হবে। এতে মূলনীতির (কায়িদার) ব্যাপকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে না।

উসতাজ মুস্তাফা আহমদ আজ-জারকা-এর ভাষ্য মতে 'কায়িদা' হলো- "সংক্ষিপ্ত সাংবিধানিক ভাষ্য নিয়ে গঠিত ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্র) এমন কিছু সামগ্রিক মৌলিক নীতিমালা, যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঘটনাপ্রবাহের সার্বিক শরয়ি বিধি-বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।"[৪]

---

[১] মুহাম্মদ আলি থানভি, কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন ওয়াল উলুম, খ.২, পৃ. ১২৯৫।

[২] সাদ আত-তাফতাজানি, আত্-তালউইহ আলাত্ তাওজিহ, খ.১, পৃ. ২০।

[৩] আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে 'রফা', 'নসব' ও 'জর' বলতে শব্দের শেষের বিশেষ অবস্থাকে বুঝানো হয়।

[৪] মুস্তাফা আজ-জারকা, আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খ. ১, পৃ. ৯৬৫।

ফিকহি কায়িদা (ইসলামি আইনের মূলনীতি) ও ফিকহি জাবিত (ইসলামের আইনি সূত্র)-এর মাঝে পার্থক্য

- 'কায়িদা' (Islamic Legal Maxim) ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন ব্যবহারিক ও শাখাগত বিধি-বিধান (فروع) কে অন্তর্ভুক্ত করে, পক্ষান্তরে 'জাবিত' (Jurisprudential Controllers) একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের বিভিন্ন ব্যবহারিক ও শাখাগত বিধি-বিধানকে সন্নিবেশিত করে। সুতরাং ফিকহি জাবিত-এর পরিসর ফিকহি কায়িদা-এর তুলনায় সীমিত। কারণ ফিকহি জাবিতের পরিধি ফিকহের বিভিন্ন মাসআলা অন্তর্ভুক্তকারী একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে কায়িদা কোনো নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না।[১]
- 'জাবিত'-এর অর্থের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের অনেকেই কায়িদা ও জাবিত-এর মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি।
- জাবিত-এর তুলনায় কায়িদা-এর ব্যতিক্রমী মাসআলার সংখ্যা বেশি। মূলত জাবিত-এর অধীনে ফিকহের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় সন্নিবেশিত হওয়াতে এতে ব্যতিক্রমী মাসআলার সংখ্যা অপ্রতুল।

সারসংক্ষেপ কথা হলো, 'জাবিত'-এর তুলনায় 'কায়িদা' শব্দটি অধিক ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক আর এর উপজাত বিষয়সমূহ (فروع)-এর সংখ্যা 'জাবিত' অপেক্ষা বেশি। যেমন- الأمور بمقاصدها-"নিয়ত-উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কার্যের বিচার হয়"।

এই কায়িদা (মূলনীতি) ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে যেমন- ইবাদত, জিনায়াত (অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড), উকুদ (পারস্পরিক চুক্তি ও লেনদেন) ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ হয়।

আর 'জাবিত'-এর উদাহরণ হলো- আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

[১] হাশিয়াতুল বান্নানি আলা শরহিল জালাল আল-মাহাল্লি আলা জামইল জাওয়ামি, খ. ২ পৃ. ২৯০।

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"যখন চামড়া দাবাগাত (চামড়া দুর্গন্ধমুক্ত করতে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ) করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।"[১]

এই হাদিস একটি ফিকহি জাবিত (আইনি সূত্র); কারণ, তার বিষয় নির্দিষ্ট এবং তা ফিকহের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত।

মূলত ফিকহি কায়িদা ও ফিকহি জাবিত-এর মধ্যকার পার্থক্য প্রতিভাত হয় পরবর্তী যুগে। কেননা, ইসলামি আইন গবেষকদের নিকট 'জাবিত' পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়। ফলে এখন ফিকহি পরিমণ্ডলে এতোদুভয়ের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

'ফিকহি কায়িদা' (ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি) ও 'উসুলি কায়িদা' (ইসলামি আইনতত্ত্বের মূলনীতি)-এর মধ্যে পার্থক্য

- এক দিক দিয়ে ফিকহি কাওয়াইদ (Islamic Legal Maxims) ও উসুলি কাওয়াইদ (Principles of Islamic Law)-এর মাঝে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, আবার অন্য দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে দেখা যায় বৈসাদৃশ্য। সাদৃশ্যের দিক হলো- উভয়ের প্রত্যেকটি এমন কিছু মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত, যার অধীনে রয়েছে কিছু শাখা-প্রশাখা। বৈসাদৃশ্যের দিক হলো- উসুলি কাওয়াইদ এমন কিছু নীতিমালার নাম, যেগুলোকে শরিয়তের বিস্তারিত দলিলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। এই নীতিমালা শরয়ি বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে, ফিকহি কাওয়াইদ বলা হবে এমন কিছু নীতিমালাকে যার অধীনে সন্নিবদ্ধ হয় ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি-বিধান, যে বিধি-বিধান সম্পর্কে একজন মুজতাহিদ (আইন-গবেষক) 'উসুলুল ফিকহ'-এর মধ্যে গ্রন্থিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে জ্ঞান লাভ করে।[২]
- ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.)-এর ভাষায়, "উসুলুল ফিকহ হলো কিছু ব্যাপ্তিশীল দলিলের সমষ্টি আর কাওয়া'ইদুল ফিকহ হলো কিছু সামগ্রিক বিধি-বিধানের সমষ্টি।[৩]

---

[১] তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৭৩, হা. নং. ১৭২৮ তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান ও সহিহ।

[২] আলি জুমআ, আল-মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাজাহিবিল ফিক্হিয়্যা, পৃ. ৪১২।

[৩] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ১৬৭।

মূল উৎস তথা কুরআন-হাদিস ও অন্যান্য 'ইজতিহাদ' (ইসলামি আইন গবেষণা) নির্ভর সম্পূরক দলিলসমূহ থেকে ফিকহি বিধি-বিধান উদ্ভাবনের কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁরা যেকোনো উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য শরয়ি বিধান প্রণয়নের অভিপ্রায়ে মগ্ন হন। অবশেষে 'আল-ফিকহুল ইসলামি'-এর শাখাগত মাসআলার একটি বিশাল ভাণ্ডার গ্রন্থবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। হিজরি প্রথম শতক জুড়ে এভাবে ফিকহ-এর যাত্রা অব্যাহত থাকে। এ সময় ফিকহশাস্ত্র ও 'কাওয়াইদুল ফিকহ'-এর উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ যুগপৎ চলতে থাকে। ফলে হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরুতেই তিন ধরনের শাস্ত্রীয় নীতিমালার প্রবর্তন হয়।

প্রথম প্রকার: (শরয়ি বিধি-বিধান) উদ্ভাবন ও 'ইজতিহাদ'-এর নীতিমালা, যেগুলো 'উসুলুল ফিকহ' (ইসলামি আইনের নীতিশাস্ত্র/Principles of Islamic Jurisprudence)-এর নীতিমালা হিসেবে পরিচিত।

দ্বিতীয় প্রকার: 'তাখরিজ' তথা হাদিস বর্ণনা ও সংকলনের নীতিমালা, যেগুলো একদল হাদিসবিশারদ ও সংকলকদের হাতে প্রণীত হয়। পরবর্তীতে এই নীতিমালা শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করে *'ইল্মু মুস্তালাহিল হাদিস'* (হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা) অভিধায় বিকাশ লাভ করে।

তৃতীয় প্রকার: (শরয়ি) বিধি-বিধান বিষয়ক নীতিমালা, যা মাজহাবের (School of Thoughts within Islamic Jurisprudence) প্রতিনিধিত্বশীল মুজতাহিদগণ তাঁদের ইমামদের অনুসৃত মূলনীতির আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। মূলত এই নীতিমালা হলো ফিকহশাস্ত্রের 'কাওয়াইদ কুল্লিয়া' বা সাধারণ-সামগ্রিক মূলনীতি, যা পরস্পর সাযুজ্যপূর্ণ বিধি-বিধানকে একত্রিত করে। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে এই মূলনীতিসমূহ স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করে গ্রন্থিত ও সংকলিত হতে থাকে।

কাওয়াইদুল ফিকহ-এর প্রয়োগক্ষেত্র

'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' তথা 'ইসলামি আইশাস্ত্রের নীতিমালা' হলো ফিকহশাস্ত্রের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পরিভাষা, যা ইসলামি আইনের অন্তর্গত কিছু নির্ধারিত নীতিমালাকে নির্দেশ করে। মূলত এই নীতিমালার সাহায্যে ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মাজহাবসমূহ শরয়ি বিধি-বিধান উদ্ভাবন করেছে এবং উক্ত বিধানবলির আলোকে নব নব উদ্ভূত সমস্যাবলি ও ঘটনাপ্রবাহের শরয়ি সমাধান দিতে প্রয়াস পেয়েছে। ফলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ফিকহি কাওয়াইদ-এর প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে গণ্য হয়:

(ক) ইবাদত (আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ বিনয় ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বান্দা যেসব আমল সম্পাদন করে এবং যার সাহায্যে বান্দা তার প্রভুর সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে। যেমন- সালাত, সাওম, জাকাত, হজ, কুরবানি ইত্যাদিসংশ্লিষ্ট বিধানবলি)।

(খ) মুআমালাত (পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ)।

(গ) পারিবারিক বিধিবদ্ধ আইন।

(ঘ) 'সিয়াসাতে শারইয়্যাহ' (শরয়ি পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা)

(ঙ) 'উকুবাত' (দণ্ড/Sanctions, Penalties)

(চ) 'আল-আখলাক ওয়াল আদাব' তথা মানুষের নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচারসম্পর্কিত বিষয়সমূহ

(ছ) বৈদেশিক লেনদেন, যা আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law) ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগত আইন (Private International Law) উভয়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত সাতটি বিষয় হলো শরয়ি বিধি-বিধানের আলোচনাক্ষেত্র ও শাখা-প্রশাখা।

কাওয়াইদুল ফিকহ-এর প্রামাণিকতা

ফিকহি কায়িদা (মূলনীতি) তখনই শরিয়তের প্রামাণ্য দলিলরূপে বিবেচিত হবে, যখন কুরআন ও হাদিস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং তা যদি শরিয়তস্বীকৃত কোনো দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তা নস (কুরআন ও হাদিস), ইজমা (ইসলামি আইনতত্ত্ববিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত/ Consensus of Islamic Jurists) ও প্রকাশ্য কিয়াস[১] (Analogical Reasoning)-এর মতো শক্তিশালী দলিলের স্তরে উন্নীত হবে। সুতরাং এমন ফিকহি কায়িদা-এর সাথে কাজি (বিচারক)-এর যেকোনো সাংঘর্ষিক ফায়সালা প্রত্যাখ্যাত হবে। উল্লেখ্য, ফিকহি কায়িদা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে:

(ক) যার মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্র দলিলের ওপর। তা মৌলিক কায়িদা হিসেবে বিবেচিত হয়।

(খ) যা 'উসুলুল ফিকহ'-এর কোনো দলিলের সম্যক অভিব্যক্তি হবে।

(গ) যা স্বতন্ত্র প্রমাণসিদ্ধ হাদিস হবে।

যেমন, "الأمور بمقاصدها" (কার্যের বিচার হয় তার অন্তর্নিহিত নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে) কায়িদাটি। মূলত এই কায়িদার প্রামাণিকতা প্রতিপাদিত হয় এর মূল দলিল إنما الأعْمالُ بِالنِّيَّات–"সমস্ত কর্মের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল" হাদিসটি থেকে। অনুরূপভাবে لا ضرر ولا ضرار- "(ইসলামে) নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো সুযোগ নেই" ও البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه- "বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীকে শপথ করতে হবে" ইত্যাদি।

[১] কিয়াস: ইল্লত (কার্যকারণ) একই হওয়ার কারণে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য সম্বলিত বিধানের ওপর ভিত্তি করে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য নেই এমন বিষয়ের বিধান সাব্যস্ত করা।

প্রথম অধ্যায়

ألف (আলিফ) দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ২৪টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلاِجْتِهَادُ لَايُنْقَضُ بِمِثْلِه.

প্রথম মূলনীতি

কোনো ইজতিহাদ[১] তার সমপর্যায়ের অন্য ইজতিহাদ দ্বারা প্রত্যাখাত হবে না”[২]

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘নাক্দ’ (نَقْض) শব্দটি (نَقَضَ) ক্রিয়াপদের মাসদার (ক্রিয়া-বিশেষ্য)। এর মৌলিক অর্থ হলো- কোনো বিষয় ভঙ্গ করা, নষ্ট করা কিংবা নস্যাৎ করা। আরবিতে এর বিপরীত শব্দ হলো ‘ইবরাম’ (إِبْرَام), যার বাংলা অর্থ সুদৃঢ়করণ, চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি। সুতরাং, ‘নাকদ’ বলা হবে- কোনো বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করার পর তা বাতিল বা নস্যাৎ করে দেয়া।[৩]

আল্লামা শাতিবি (রহ.)-এর মতে, কাজি (বিচারক) ও হাকিম (রাষ্ট্রনায়ক)-এর দায়িত্ব হলো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আদেশ ও নিষেধসূচক নির্দেশনা (ফায়সালার মাধ্যমে) উম্মাহর নিকট পৌছে দেয়া। অতএব, তাঁরা উম্মাহর নিকট যে নির্দেশনা পৌছে দেবে, তা তাঁদের কাছ থেকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা হবে যে, তাঁরা নববি বার্তা প্রচারে শুধুমাত্র নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন; তারা কখনোই তাঁর ন্যায় নিরঙ্কুশ বিধান প্রণেতা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

কারণ, আল্লাহ কেবল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেই বিধান প্রণয়নের নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো বিচারক বা প্রশাসক তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। কারণ, তারা ভুলের উর্ধ্বে নয়। অপরদিকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মাসুম (নিষ্পাপ); তাঁর কোনো ভুল হলেও তাঁকে সেই ভুলের ওপর বহাল রাখা হতো না; বরং ওহির (Revelation) মাধ্যমে আল্লাহ সেই ভুল শুধরে দিতেন।

---

[১] শরয়ি দলিলের আলোকে ইসলামি আইনবিশারদের গবেষণাপ্রসূত মত বা সিদ্ধান্ত।

[২] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৮, ধারা. ১৬; জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১০১ (ভিন্ন শব্দে: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد); ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৮৯।

[৩] ইবনু ফারিস, মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ, খ. ৫, পৃ. ৪৭০; ফায়রুজ আবাদি, আল-কামুসুল মুহিত, পৃ. ৮৪৬।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারক তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হলো- তাঁদের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা শরিয়তের অনুকূল হতে হবে। যদি তাঁদের কোনো ফায়সালা শরিয়তের প্রতিকূলে চলে যায়, তবে ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে তা বাতিল হিসেবে পর্যবসিত হবে।[১]

অধিকন্তু, বিচারক কোনো বিধানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা প্রদানের পরে যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, তার দু'টি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: উক্ত বিধানটি ইজতিহাদনির্ভর মাসআলাসংক্রান্ত হবে, আর বিচাকের কৃত ভুল কোনো নস (কুরআন ও সুন্নাহ) বা 'ইজমা' (ইসলামি আইনজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত) পরিপন্থী ফায়সালা প্রদানের কারণে নয়; বরং চিন্তা-গবেষণাপ্রসূত ত্রুটির কারণে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: উক্ত বিধানটি কুরআন-সুন্নাহ কিংবা ইজমা পরিপন্থী হবে। এই অবস্থায় তার সে ফায়সালা বাতিল বলে বিবেচ্য হবে।

মূলত বিচারক বা হাকিম (রাষ্ট্রনায়ক) দ্বারা কৃত ফায়সালা প্রত্যাখাত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে চারটি পয়েন্টে ভাগ করা যায়:

প্রথম: ফায়সালাটি কুরআন পরিপন্থী হলে, তা বাতিল বিবেচিত হবে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে কারো কোনো দ্বিমত নেই। কারণ, কুরআন অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ/Proven Authentically (قَطْعِيُّ الثُّبُوْت); অপরদিকে মানবীয় যুক্তিনির্ভর ফায়সালা হলো ধারণানির্ভর দলিল/Proven Speculatively (ظَنِّيُّ الثُّبُوْت)।

দ্বিতীয়: ফায়সালাটি 'সুন্নাহ মুতাওয়াতিরা' (নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় বর্ণিত সুন্নাহ)-এর বিপরীত হলে, বাতিল বিবেচিত হবে। এতেও কারো কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ, কুরআনের মতো 'সুন্নাহ মুতাওয়াতিরা'ও অকাট্য দলিলসিদ্ধ। তবে 'সুন্নাহ আহাদিয়্যা' (একক সূত্রে বর্ণিত সুন্নাহ)- চাই 'মাশহুর' হোক বা না হোক, এর বিপরীতে বিচারকের কৃত ফায়সালা বাতিল হবে কি হবে না- সেক্ষেত্রে ইসলামি আইনজ্ঞদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

তৃতীয়: অনুরূপভাবে 'ইজমা' পরিপন্থী যেকোনো ফায়সালা রহিত হবে। এক্ষেত্রে উসূলবিদদের (ইসলামি আইনতত্ত্ববিদ) অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে, যা ইমাম শাতিবির বক্তব্যের সাথে জোরালো একাত্মতা প্রকাশ করে। তবে তাঁদের কেউ কেউ এক্ষেত্রে 'ইজমা' অকাট্য হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, আর কেউ কেউ এই শর্ত বিবেচনায় নেননি।

চতুর্থ: কোনো ফায়সালা 'কিয়াস'(Analogical Reasoning)-এর বিপরীত হলে, তা রদ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদদের দুটি মত পরিলক্ষিত হয়।

---

[১] শাতিবি, আল-ইতিসাম, খ.২, পৃ. ৫০২।

১. কিয়াস যদি স্পষ্ট (جَلِيّ) হয়, তবে এর বিপরীত বিচারকের ফায়সালা বাতিল বিবেচিত হবে।
২. ফায়সালা বাতিল হবে না- চাই কিয়াস স্পষ্ট (جَلِيّ) হোক কিংবা অস্পষ্ট (خَفِيّ) হোক।

ফিকহের দৃষ্টিতে আলোচ্য মূলনীতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। বিশেষত বিচারিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মূলনীতির সংক্ষিপ্ত অর্থ:

আভিধানিকভাবে 'ইজতিহাদ'[১]-এর অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পরবর্তীতে তা শরিয়তের বিস্তারিত দলিলসমূহ থেকে শরিয়তের উপজাত বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে 'ফকিহ' (ইসলামি আইনজ্ঞ) কর্তৃক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো[২]–এ অর্থ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

মূলনীতির মর্মার্থ হলো- অপরিহার্য শর্তাবলির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ইজতিহাদের মাধ্যমে যদি কোনো প্রশাসনিক বা বিচারিক রায় কার্যকর হয়, পরবর্তী নতুন ইজতিহাদের দ্বারা সে রায়ের কার্যকারিতা বাতিল হবে না। কারণ, দালিলিক মর্যাদার বিচারে ইজতিহাদ ধারণানির্ভর দলিল হিসেবে গণ্য। আর একটি ধারণাসাপেক্ষ বিষয় তার মতো আরেকটি ধারণাসাপেক্ষ বিষয়কে অপসারণ করতে পারে না।

তাছাড়া একটি ইজতিহাদের সিদ্ধান্ত যদি অন্য ইজতিহাদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় ইজতিহাদও অনুরূপভাবে পরবর্তী ইজতিহাদের দ্বারা অসিদ্ধ প্রমাণিত হতে পারে। ফলে এভাবে চলতে থাকলে 'দাউর'-বৃত্তাকার যুক্তি (Circular Reasoning) ও 'তাসালসুল'-অসীম অনুক্রমিকতা (Infinite regress)-এর মতো সমস্যা দেখা দেবে।[৩]

তদুপরি, কোনো ইজতিহাদকে যদি সমপর্যায়ের আরেকটি ইজতিহাদের মাধ্যমে রদ করা হয়, তাহলে বিধি-বিধানের প্রতি জনগণের অনিশ্চয়তা দেখা দেবে, বিচারকবৃন্দ তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসবে, হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির সূত্রপাত হবে এবং দুর্নীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সর্বোপরি, মানুষের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ সুষ্ঠভাবে মীমাংসার মাধ্যমে সমাজের যে দিকপ্লাবী কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিচারকদের নিযুক্ত করা হয়েছে, তা সর্বোতভাবে ভেস্তে যাবে।

---

[১] Interpretation and reasoning based on sacred texts.
[২] শাওকানি, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল, খ.১, পৃ. ১৮।
[৩] আবু হামিদ আল-গাজালি, আল-মুস্তাস্ফা, খ.২, পৃ. ৩৮৩।

এর সমর্থনে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'আস-সিয়ারুল কাবির' গ্রন্থে বলেন: "যদি আমির (রাষ্ট্রপ্রধান) নিজ ইজতিহাদ মতে সুসংবাদবাহী ও বার্তাবাহকদেরকে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত দেন, তারপর সে বিষয় কোনো মুসলিম বিচারকের নিকট উত্থাপন করা হয়, তিনি আমিরের কৃত ফায়সালার পক্ষে রায় দেবেন, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত রায় উক্ত ফায়সালাকে সমর্থন করে না।[১]

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে বলা যায়- যদি দুজন ব্যক্তি বিচারকের নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে: "একটি বিষয়ে আমাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে আমরা জনৈক বিচারকের নিকট মামলাটি নিয়ে উপস্থিত হই। তিনি আমাদের মাঝে মামলাটি এ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করে দেন। তবে আমরা উক্ত রায়ের বিপক্ষে নতুর রায়ের আশায় আপনার নিকট আপিল করতে চাই।" এ-কথা শুনে বিচারকের জন্য তাদের আবেদন গ্রহণ করা বৈধ হবে না; বরং তিনি উক্ত রায়কে বহাল রাখবেন এবং নতুন কোনো ফায়সালা দেবেন না। আর এটিই ওলামায়ে কিরামের নিকট বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত।[২]

মূলনীতির সমর্থনে সাহাবায়ে কিরামের প্রামাণ্য বক্তব্যসমূহ:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বক্ষ্যমাণ মূলনীতির কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু, এর সমর্থনে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ইজমা (সর্বসম্মত অভিমত) পরিলক্ষিত হয়।[৩]

সামনে এ বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হবে।

(ক) একদা নাজরানের অধিবাসীরা হজরত আলি (রা.)-এর নিকট আগমন করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো- হজরত ওমর (রা.) খলিফা থাকাকালীন তাদের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে (তাদেরই আবেদনের ভিত্তিতে) যে রায় প্রদান করেছিলেন, এর বিপক্ষে আলি (রা.)-এর নিকট আপিল করা। তারা বললো- আমিরুল মু'মিনিন, আমরা আপনার নিজ হাতের লেখা ও নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আপনার সুপারিশের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাদের আগের আবেদনটি প্রত্যাহার করুন। তখন হজরত আলি (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন,

وَيْحَكُم! إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيْدَ الْأَمْرِ.

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ. ৩, পৃ. ১১১।

[২] জারকাশি, আল-মানসুর ফিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৯৩।

[৩] ইবনু কুদামা, আল-মুগনি, খ. ১০, পৃ. ৫১; সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১০১।

"দূর হও তোমরা! নিঃসন্দেহে ওমর (রা.) উপযুক্ত ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।"

অতঃপর তিনি ওমর (রা.)-এর ফায়সালাকে পূর্ববৎ অবস্থায় বহাল রাখেন।[১]

(খ) ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিরাসের একটি মাসআলায় (মৃতের) বৈপিত্রেয় ভাইদের অংশে সহোদর ভাইদেরকে শরিক করেননি। পরবর্তীতে একই ধরনের আরেক মাসআলায় তিনি বৈপিত্রেয় ভাইদের অংশে সহোদর ভাইদের অংশীদারিত্বের রায় প্রদান করেন।

এক বর্ণনায় এভাবে আছে যে- জনৈকা মহিলার মৃত্যুর পরে উত্তরাধীকারী হিসেবে তার স্বামী, মা, কয়েকজন বৈপিত্রেয় ও সহোদর ভাই রয়ে যায়। এক্ষেত্রে ওমর (রা.)-এর ফায়সালা ছিলো- পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশে বৈপিত্রেয় ভাই ও সহোদররা শরিক হবে। তাঁর দু'ফায়সালার মধ্যকার স্পষ্ট বিরোধ দেখে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করলো- আপনি অমুক সনে এ ধরনের আরেক মাসআলায় তাদের মাঝে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করেননি। প্রত্যুত্তরে ওমর (রা.) বললেন-

تِلْكَ عَلٰى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهٰذِه عَلٰى مَا قَضَيْنَا

"তখন (ইজতিহাদের ভিত্তিতে) যে ফায়সালা গৃহীত হয়েছিলো, তার ওপরই মাসআলা বলবৎ থাকবে। আর এ মাসআলাটি তেমনই হবে, যেমনটি আমি এখন (নতুন ইজতিহাদ অনুযায়ী) ফায়সালা করলাম।"[২]

তাঁর এই সারগর্ভ উক্তিটি পরবর্তীতে প্রবচনরূপে প্রচলন লাভ করে।

(গ) আরেকটি মাসআলা তাঁর কাছ থেকে এভাবে বর্ণিত যে- জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন- ঐ বিষয়ে কেমন সিদ্ধান্ত পেলে? সে বললো- আলি (রা.) এবং জায়েদ (রা.) এভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বললেন- আমি হলে তো অন্যভাবে সিদ্ধান্ত দিতাম। লোকটি বললো- তাহলে আপনার নিজস্ব রায় প্রয়োগে বাধা কোথায়? বিষয়টি তো আপনার হাতেই আছে। জবাবে ওমর (রা.) বললেন-

لَوْ كُنْتُ أَرُدُّكَ إِلٰى كِتَابِ اللّٰه أَوْ إِلٰى سُنَّةِ نَبِيِّه ﷺ لَفَعَلْتُ، ولٰكِنِّيْ أَرُدُّكَ إِلٰى رَأْيٍ، وَالرَّأْيُ مُشْتَرَكٌ.

"যদি পুনর্বিবেচনার জন্য আমি তোমাকে আল্লাহর কিতাব বা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হতে বলতাম, আমি তা করতাম। তবে আমি তোমাকে শরণাপন্ন করছি আমার গবেষণানির্ভর রায়ের প্রতি। আর রায় তো

[১] ইবনু কুদামা, আল-মুগনি, খ. ১০, পৃ. ৫১; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ১০, পৃ. ২০৫, হা. ২০৩৭৫।

[২] আব্দুর রাজ্জাক আস-সানআনি, আল-মুসান্নাফ, খ. ১০, পৃ. ২৪৯, হা. ১৯০০৫; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, পৃ. ৪১৮. হা. ১২৪৬৯।

শরিকি[১] বিষয়।" এতে করে তিনি আলি (রা.) ও জায়েদ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত পূর্ববৎ বিদ্যমান রেখেছিলেন।[২]

হজরত ওমর (রা.) দাদার মিরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রায় প্রদান করেছেন। ইবনু সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা.) বলেন-

إِنِّيْ قَضَيْتُ فِيْ الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْحَقِّ.

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দাদার মিরাসের ব্যাপারে আমি ভিন্ন ভিন্ন ফায়সালা দিয়েছি; (তবে আমি তা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে করিনি। কারণ) আমি সত্যের সন্ধানে চেষ্টার কোনো প্রকার ত্রুটি করিনি।[৩]

হজরত ওমর (রা.)-এর উপর্যুক্ত উক্তির ব্যাপারে মন্তব্য করে আল্লামা সদর আশ-শাহিদ (রহ.) বলেন– "ওমর (রা.)-এর বক্তব্য এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে, মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন, ঠিকও করতে পারেন। সাথে সাথে স্পষ্ট হয় যে, একটি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ফায়সালা বাস্তবায়িত হলে, তা পরবর্তী নতুন ইজতিহাদের মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত হবে না"[৪]

শাবি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ ﷺ فِيْ الْجَدِّ سَبْعِيْنَ قَضِيَّةً لَا يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

"আমি হজরত ওমর (রা.) থেকে দাদার (মিরাসের) বিষয়ে সত্তরটি ফায়সালা সংরক্ষণ করেছি, যেগুলোর একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা"[৫]

বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছিলো বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উপস্থিতিতে। তবে এ প্রসঙ্গে কারো পক্ষ হতে কোনো প্রকার আপত্তি-অস্বীকৃতি কিংবা মতভিন্নতা প্রমাণিত নেই।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ঘটনাপ্রবাহ ও বক্তব্যসমূহ এ কথার প্রাঞ্জল প্রমাণ বহন করে যে- আলোচ্য মূলনীতির সিদ্ধতা ও কার্যকারিতার ওপর তাঁদের সর্বসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ইসলামের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবেয়িনের মধ্য থেকে যারা বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের নিকট এটি অনুসৃত ও প্রয়োগযোগ্য নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো।

---

[১] যেখানে প্রত্যেক বিচারকের নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণা অনুযায়ী ফায়সালা দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

[২] ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিইন আন রব্বিল আলামিন, খ. ১, পৃ. ৬৫; কামাল ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কদির, খ. ৭, পৃ. ৩০৪।

[৩] আব্দুর রাজ্জাক আস-সানআনি, আল-মুসান্নাফ, খ. ১০, পৃ. ২৬২, হা. ১৯০৪৫।

[৪] খাসসাফ, শরহু আদাবিল কাযি, খ. ১, পৃ. ১৭৯; শরহুল জালাল আল-মাহাল্লি আলা জামৃইল জাওয়ামি, খ. ২, পৃ. ৩৯১।

[৫] ইবনু কুদামা, আল-মুগনি, খ. ৯, পৃ. ৫৭; সারাখসি, আল-মাবসুত, খ. ১৬, পৃ. ৮৪।

তাই এই মূলনীতির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম (ইসলামের প্রাথমিক যুগের আইনতত্ত্ববিদগণ) ও উসুলবিদদের (ইসলামি আইনের নীতিশাস্ত্র) বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

'শরহু জাম্‌ইল জাওয়ামি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "নিতান্ত গবেষণাধর্মী কোনো বিষয়ে হাকিম (রাষ্ট্রনায়ক) কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত কাজি (বিচারক) কর্তৃক কার্যকর হওয়া ফায়সালা রদ হবে না, যদিও তা পরবর্তী নতুন ইজতিহাদ-গবেষণার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়।"[১]

তবে এ মূলনীতির সম্পর্ক হলো এমন অতীত ঘটনার সাথে- যে ব্যাপারে হাকিম কিংবা বিচারকের রায়নির্ভর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। অপরদিকে তদনুরূপ ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন বিচারকের জন্য বিধেয় হলো- উক্ত ঘটনার বিধান উদ্ভাবনে নতুন গবেষণা চালিয়ে তদনুসারে রায় প্রদান করা।

বদরুদ্দিন জারকাশি (রহ.) বলেন- "পূর্ববর্তী ইজতিহাদকে পরবর্তী ইজতিহাদ দিয়ে অপসারণের নিষিদ্ধতার যে বিধান, তার সম্পর্ক হলো অতীতে কার্যকর হওয়া রায়ের সাথে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিচারে বর্তমান রায়ের পরিবর্তন হতে পারে।" কারণ, এতে অন্য রায়ের অসিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।

তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে আবু মুসা আল-আশআরি (রা.)-এর বরাবর ওমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক হিরণ্ময় পত্র থেকে। পত্রের এক পর্যায়ে তিনি বলেন-

وَلَا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَه بِالْأَمْسِ -رَاجَعْتَ فِيْهِ رَأْيَكَ وَهُدِيْتَ فِيْهِ لِرُشْدِكَ- أَنْ تُرَاجِعَ فِيْهِ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيْمٌ لَا يُبْطِلُه شَيْءٌ.

"অতীতে কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদানের পর তা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা-গষেণা করে যদি সঠিক ও সত্যের সন্ধান পেয়ে যাও, তবে নির্দ্বিধায় সত্যের দিকে ফিরে আসতে কুণ্ঠাবোধ করো না। কারণ, সত্য সব সময় চিরভাস্বর, কোনো বস্তুই তাকে বাতিল করতে পারে না।"[২]

উপর্যুক্ত উক্তির মর্মবাণী হলো- নব্য উদ্ভূত ঘটনার ক্ষেত্রে বিচারক তার ইজতিহাদনির্ভর রায় প্রদানের পরে যদি একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং তদসংশ্লিষ্ট ইজতিহাদের ধরনও পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন বিচারকের জন্য আবশ্যক দ্বিতীয়বার ঘটে যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইজতিহাদ মতে রায় প্রদান করা। তবে এর ফলে তার প্রথম ইজতিহাদের রায় বাতিল হবে না।

সারকথা হলো, "একটি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো বিচারিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, তা সমপর্যায়ের আরেকটি ইজতিহাদ দ্বারা রদ হবে না।"[৩]

---

[১] মাহাল্লি, শরহুল জালাল আল-মাহাল্লি আলা জাম্‌ইল জাওয়ামি, খ. ২, পৃ. ৪৩০।
[২] দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯-৩৭০, হা. ৪৪৭১-৪৪৭২।
[৩] আলি আহমদ নদভি, আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪৪৫।

القاعدة الثانية: اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا.

দ্বিতীয় মূলনীতি

কার্যের বিচার হয় তার অন্তর্নিহিত নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে[১]

মূলনীতির সারমর্ম:

বান্দার জাগতিক কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, লেনদেন সবই তার নিয়তের প্রেক্ষিতে বিচার্য হবে। কারণ, কার্যের সিদ্ধতা-অসিদ্ধতা, এবং এর বিনিময়ে পাপ-পুণ্য কিংবা পুরস্কার-শাস্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়তকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। উক্ত মূলনীতিতে লক্ষণীয় বিষয় হলো- একই অর্থে বর্ণিত হাদিসের শব্দদ্বয় اَلْأَعْمَال (কাজ-কর্ম) ও اَلنِّيَّات (নিয়ত/উদ্দেশ্য/সংকল্প) এর পরিবর্তে যথাক্রমে اَلْأُمُوْر (বিষয়াবলি/কাজ-কর্ম) ও اَلْمَقَاصِد (লক্ষ্য/উদ্দেশ্য/ইচ্ছা) শব্দ দুটি চয়ন করা হয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন- 'উমূর' শব্দটি বাচনিক-কায়িক নির্বিশেষে সকল মানবীয় কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে 'আমাল' শব্দটি শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। এমনিভাবে 'নিয়্যাত' শব্দটি 'কাস্‌দ' অপেক্ষা অধিক নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক। কারণ, ওলামায়ে কিরাম 'নিয়্যাত' পরিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যেগুলো 'কাসদ'-এর ক্ষেত্রে বিবেচনাতীত রাখা হয়েছে। ফলে কতিপয় আলেমের দৃষ্টিতে 'কাস্‌দ' অধিক ব্যাপ্তিশীল বিবেচিত হয়। তাই এই ধাতু থেকে 'মাকাসিদ' শব্দটি চয়ন করা হয়েছে।

এজন্য ইমাম শাফেয়ি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি নিয়তসংশ্লিষ্ট হাদিসটির গুরুত্বের ব্যাপারে বলেন- "এ হাদিসের অধীনে দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ প্রবেশ করেছে।"[২]

ইবনু তায়মিয়া (রা.) বলেন- "এই হাদিস যে বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করছে, মূলত তা দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত।"[৩]

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৬, ধারা. ২।

[২] বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ২৮৯; বায়হাকি, আস-সুনানুস সুগরা, খ. ১, পৃ. ১২।

[৩] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ১৮, পৃ. ২৪৪।

ইবনুল কায়্যিম (রা.) বলেন- "নিয়ত তো দ্বীনের মূল ও সারবস্তু। তা আমলের প্রাণশক্তি ও চালিকাশক্তি আর আমল তার অনুবর্তী ও অনুগামী বিষয় । নিয়তের স্তর অনুসারে ইহজীবন ও পরজীবনে মর্যাদার উন্নতি-অবনতি হয়।"[১]

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি ফিকহ তথা ইসলামি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্মবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ইসলামি আইনবিশারদগণ এ মূলনীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁরা এ মূলনীতিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণে মনোনিবিষ্ট হয়েছেন এবং এর থেকে বিভিন্ন শাখাগত বিষয় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কারণ শরয়ি বিধি-বিধানের বড়ো একটি অংশ এই মূলনীতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। নিম্নে আলোচিতব্য হাদিসের আলোকে এই মূলনীতি প্রণয়নের পেছনে ইসলামি আইনবিদদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য যে- মানুষের বিচিত্র নিয়ত-উদ্দেশ্যের প্ররিপ্রেক্ষিতে তার কর্মকাণ্ড, লেনদেন ও আচার-আচরণসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও ফলাফলও বিচিত্র হবে।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

এই মূলনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোল্লিখিত বাণী থেকে:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُه إِلى اللهِ وَرَسُوْلِه، وَمَنْ كَانَت هِجْرَتُه لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"সমস্ত কর্ম (অর্থাৎ এগুলোর ফলাফল কিংবা বিশুদ্ধতা) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকেই হয়েছে। আর যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে; তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।[২]

হাদিসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ হাদিসটি তাদের গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন- যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- "অধ্যায়: আমলসমূহ সংকল্প ও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য তার সংকল্প অনুযায়ী (নির্ধারিত হয়)। কাজেই ঈমান, ওজু, সালাত, জাকাত, হজ, সিয়াম ও অন্যান্য বিধানসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।"

---

[১] ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিইন, খ. ৬, পৃ. ১০৬।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৬, হা. ১, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।

উক্ত শিরোনামের মাঝে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে হাদিসের বিষয়বস্তুর প্রতি ও হাদিস থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন অধ্যায় ও বিধি-বিধান সম্বলিত মূলনীতির প্রতি।

উপর্যুক্ত হাদিসের মতো আরো অসংখ্য হাদিস রয়েছে যার সাহায্যে আলোচ্য মূলনীতির সিদ্ধতা সুপ্রাণিত হয়। নিম্নে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো-

(ক) ইমাম বুখারি (রহ.) আবু মূসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– এক ব্যক্তি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো– 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর পথে জিহাদ কোনটি? কেননা, আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশবর্তী হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে গোত্রীয় অহমিকা রক্ষার বশবর্তী হয়ে। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন- লোকটি দাঁড়ানো থাকার কারণে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন-

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"যে ব্যক্তি লড়াই করে আল্লাহর বাণী (দ্বীন ইসলাম) সমুন্নত করার জন্যে, তার লড়াই আল্লাহর পথে পরিগণিত হয়।"[১]

এই হাদিসে আমরা দেখতে পাই– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে– আল্লাহর বাণী তথা দ্বীন ইসলাম সমুন্নত করাই হবে জিহাদের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য–যে লক্ষ্যকে অন্তঃকরণে লালন করে এবং এবং দু'নয়নের সামনে উদ্ভাসিত রেখে জিহাদের ময়দানে পাড়ি জমাতে হবে। এ বিষয়ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, বান্দার আমল নিষ্কলুষ হওয়া জরুরি। প্রদর্শনেচ্ছা, যশ-খ্যাতির অভিলাষ, অজ্ঞতার যুগের গোত্রীয় অহমিকার মতো অশিষ্ট আচরণের কদর্যতা ও কলুষ থেকে বান্দার আমল হতে হবে রিক্ত ও মুক্ত।

হাদিসের ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানি (রহ.) উক্ত হাদিসের বিশ্লেষণকালে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করে বলেন- "যে ব্যাক্তি লড়াই করবে..." হাদিসটি মূলত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বমর্মী কথামালার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি আরো অসংখ্য মর্মকে পরিব্যপ্ত করে। উপরন্তু এই হাদিসে 'সমস্ত কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'[২] হাদিসের পক্ষে সমর্থন রয়েছে।

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৩৬, হা. ১২৩।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৬, হা. ১।

(খ) মূলনীতির সমর্থনে আরেকটি প্রমাণসিদ্ধ হাদিস হচ্ছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিম্নোক্ত বাণী-

ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلى نِيَّاتِهِمْ.

"তারপরে (কিয়ামত দিবসে) তাদেরকে নিজেদের নিয়ত অনুসারে পুনরুত্থিত করা হবে।"[১] (মূলত এটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত একটি লম্বা হাদিসের খণ্ডিত অংশ।)

(গ) ইমাম বুখারি তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে নকল করেন- সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

"তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই খরচ করো না কেন, তোমাকে নিশ্চিতরূপে তার প্রতিদান প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।"[২]

(ঘ) ইমাম বায়হাকি (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَه.

"যার (পরিশুদ্ধ) নিয়ত নেই, তার কোনো আমলই নেই।"[৩]

'মুসনাদুশ শিহাব' গ্রন্থে আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে নিয়তসংক্রান্ত আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِه.

"মুমিন ব্যক্তির নিয়ত তার আমল অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[৪]

(ঙ) ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল তাঁর 'মুসনাদ'-এর মধ্যে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

رُبَّ قَتِيْلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِه.

"যুদ্ধের দু কাতার (মুমিন ও কাফির)-এর মাঝে এমন অনেক নিহত ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যার নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।"[৫]

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ৬৫, হা. ২১১৮।
[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২১, হা. ৫৬।
[৩] বায়হাকি, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৭, হা. ১৭৯।
[৪] কুজায়ি, মুসনাদুশ শিহাব, খ. ১, পৃ. ১১৯, হা. ১৪৭।
[৫] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ৩১৪, হা. ৩৭৭২।

(চ) আবু মাসউদ বাদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"মানুষ যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় ব্যয় করে, তখন সেটা তার জন্য সাদাকাহ হিসেবে পরিগণিত হয়।"[১]

এ বিষয়ে আরো অজস্র হাদিস রয়েছে যার সবটুকু এখানে উদ্ধৃত করা দুষ্কর ব্যাপার। আর এখানে সব হাদিস বর্ণনা করে আলোচনা দীর্ঘায়িত করাও বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বসাকুল্যে উল্লিখিত সব হাদিসই একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে- আমলের সময় নিয়ত উপস্থিত থাকা এবং তা কলুষমুক্ত হওয়া জরুরি। আর এ হাদিসসমূহকে কেন্দ্র করে ইবাদত ও লেনদেনসংক্রান্ত অসংখ্য বিধি-বিধান ও প্রশাখিক মাসআলা প্রণীত হয়েছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফিকহশাস্ত্রে আলোচ্য মূলনীতির রয়েছে অসীম গুরুত্ব ও অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য।

তাই এ মূলনীতির আলোকে সকল ইমাম এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত প্রদান করেছেন যে, নিয়তের অনুপস্থিতিতে কোনো আমলের সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে নিয়ত ছাড়া আমল শুদ্ধ হবে কি হবে না- তা অন্য বিষয়।

ইবাদত যদি সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ ইত্যাদির মতো নিখাদ নৈকট্য হয়, তবে নিয়ত ছাড়া তা আদায় হবে না। আর এর ওপরই ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এ সমস্ত ইবাদতের মূল হলো নৈকট্য। আর নৈকট্যের বিদ্যমানতা নির্ভর করে নিয়তের বিদ্যমানতার ওপর। সুতরাং নিয়তের অনুপস্থিতি মানে নৈকট্যের অনুপস্থিতি, আর নৈকট্যের অনুপস্থিতি মানে এসব ইবাদত অন্তঃসারশূন্য ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে এগুলো সম্পাদন করলেও অসম্পাদিত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে যেসব ইবাদত নিখাদ নৈকট্য নয়, বরং নৈকট্য লাভের মাধ্যম সেগুলো নিয়তের অনুপস্থিতিতে নৈকট্য-ইবাদত হবে না ঠিক, তবে ইবাদত আদায়ের মাধ্যম হবে। যেমন- সালাতের জন্য ওজু। নিয়ত ছাড়া ওজু নৈকট্য হিসেবে গণ্য হবে না, তবে তার মাধ্যমে সালাত আদায় হবে।

অনুরূপভাবে বিয়ে-শাদি, তালাক-ইদ্দাত, অর্থনৈতিক লেনদেন, মামলা-মুকাদ্দামা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, আমানাত, হুদুদ (বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি), কিসাস (Just Retribution) ইত্যাদি আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়; বরং এগুলোর বিধান নিয়ত ব্যতীতই প্রযোজ্য হয়। কারণ, এগুলো নিখাদ নৈকট্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারবস্তু হলো- ফিকহশাস্ত্রের ভিত্তি যে পাঁচটি প্রধান মৌলিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অন্যতম। কারণ,

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২০, হা. ৫৫।

যেকোনো কথা বা কাজের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, গ্রহণযোগ্যতা-অসারতা যাচাই করা হয় এ মূলনীতির কষ্টিপাথরে। অধিকন্তু, এই মূলনীতি ফিকহশাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায়ের মাসআলাকে অভিব্যাপ্ত করে।

القاعدة الثالثة: اَلْأَصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ اَلْإِبَاحَةُ.

তৃতীয় মূলনীতি

সকল বস্তুর ক্ষেত্রে মৌলিক বিধান হলো বৈধতা[১]

উপরিউক্ত মূলনীতির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কিরামের অভিমত রয়েছে। হানাফি মাজহাবের মধ্যে অগ্রগণ্য মত হলো- বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণ ও প্রকৃত মূলনীতি হলো- তা বৈধ হওয়া। হিদায়া গ্রন্থাকার বলেন-

اَلْإِبَاحَةُ اَلْأَصْلُ، وَقَالُوْا أَيْضاً: إِنَّ الْأَصْلَ فِيْ الْأَشْيَاءِ اَلْإِبَاحَةُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ ﷺ.

"(বস্তুর ক্ষেত্রে) বৈধ হওয়া-ই প্রকৃত মূলনীতি। তাঁরা (হানাফি ফিকহ বিশারদগণ) আরো বলেন- আমাদের কোনো কোনো ইমাম -যাঁদের মধ্যে ইমাম কারখি (রহ.) অন্যতম- এ মত প্রকাশ করেছেন যে- সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো- তা বৈধ হওয়া।"

ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত প্রধান মূলনীতি হলো- আল্লাহ্ তাআলা এ ধরাধামে মানুষের জন্য যতো প্রকার বস্তু সৃষ্টি করেছেন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন, সবই বৈধ ও হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন বস্তু তখনই হারাম হবে যখন তার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে 'শারি' (বিধানপ্রণেতা) তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে বিশুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি কোনো বিষয়ে দুর্বল হাদিস ব্যতীত কোনো বিশুদ্ধ নস (শরয়ি বক্তব্য) বিদ্যমান না থাকে, কিংবা তার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোনো দ্ব্যর্থহীন শরয়ি নির্দেশনা পাওয়া না যায়, তবে তা বৈধ হিসেবেই বহাল থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"তিনিই যমিনে যা আছে সবই তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন।" [সুরা বাকারা, আয়াত: ২৯]

---

[১] শাওকানি, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল, খ. ২, পৃ. ২৮৪; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৬৬; সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৬০।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

"তোমরা কি দেখো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছুই আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।" [সুরা লোকমান, আয়াত: ২০]

বিশেষ কারণ ও অন্তর্নিহিত হিকমাত (উদ্দেশ্য) ব্যতীত আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম করেননি।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আলোচ্য বৈধতার বিধান ও মূলনীতি শুধুমাত্র বস্তু ও দ্রব্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঐ সকল কার্যকলাপ ও লেনদেনও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত নয়। যা আমাদের মাঝে 'আদাত' তথা প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ ও মুআমালাত বা পারস্পরিক লেনদেন হিসেবে পরিচিত। সুতরাং যেকোনো সামাজিক রীতি ও মানবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হলো- তা বৈধ ও শর্তমুক্ত হওয়া, যদি না তা অবৈধ ও শর্তযুক্ত হওয়ার পক্ষে শরয়ি কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে।
এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

"যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।" [সুরা আল-আনআম, আয়াত: ১১৯]

উপর্যুক্ত আয়াতটি নির্বিশেষে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও মানবিক কার্যকলাপকে পরিব্যপ্ত করে।

তবে ইবাদতের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তা একান্ত দ্বীনসংশ্লিষ্ট বিষয় যা সরাসরি ওহির পথ ধরে না আসলে গ্রহণযোগ্য হয় না।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন- "বান্দার বাচনিক ও কায়িক কর্মকাণ্ডসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত:

(ক) কিছু হলো ইবাদত, যার দ্বারা তাদের দ্বীন পরিশুদ্ধ ও সুরক্ষিত হয়।
(খ) আর কিছু হলো প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, জাগতিক জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে যার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হয়।

শরিয়তের মূলনীতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়তের সুস্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশনা ব্যতীত ইবাদতের বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয় না।"

এ কারণেই ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) ও অন্যান্য আহলুল হাদিস (হাদিস বিশারদ) আইনবিদগণ বলতেন:

"ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো– 'তাওকিফ' তথা শরিয়ত প্রণেতা যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটার সীমানাতে থেমে যাওয়া। কাজেই ইবাদতের যেকোনো পদ্ধতি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন শরিয়তের বক্তব্য থেকে তার সমর্থন মিলবে। অন্যথায় আমরা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আওতাভুক্ত হয়ে যাবো।

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ﴾

"নাকি তাদের এমন কতোগুলো শরিক রয়েছে, যারা এদের জন্য দ্বীন থেকে শরিয়ত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" [সুরা আশ-শুরা, আয়াত: ২১]

পক্ষান্তরে 'আদাত' বা রীতি-রেওয়াজের ক্ষেত্রে শরিয়তস্বীকৃত মূলনীতি ও বিধান হলো- উদারতা ও নমনীয়তা প্রদর্শন। সুতরাং সমাজে প্রচলিত কোনো রীতি বা প্রথা অবৈধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকা জরুরি। অন্যথায় আমরা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তব চিত্রে পর্যবসিত হবো। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

"বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো' বলুন, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছে, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটাচ্ছো?" [সুরা ইউনুস, আয়াত: ৫৯][১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়– ইসলামি শরিয়তের নিষিদ্ধ বিধি-বিধানের পরিধি অত্যন্ত সংকোচিত এবং হালাল বিধি-বিধানের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। কারণ, নিষিদ্ধতা সাব্যস্তকারী বিশুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন নসের (শরয়ি নির্দেশনা) সংখ্যা খুবই অপ্রতুল বিধায়, যেসব বিষয়ের বৈধতা কিংবা অবৈধতা মর্মে শরিয়তের বক্তব্য অবিদ্যমান, সেসব বিষয় আল্লাহর অনুগ্রহপূর্বক উদারতা ও শিথিলতার আওতাভুক্ত থাকবে।[২] অর্থাৎ সেগুলো বৈধ বিবেচিত হবে।

---

[১] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ১৬, পৃ. ১৭-২৯।

[২] ইউসুফ কারজাভি, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ: ২০-২৩ (সংক্ষেপিত)।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

(১) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَه، فإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسى شَيْئًا.

"আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর তিনি যে বিষয়ে চুপ থেকেছেন, তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ক্ষমা লাভে অগ্রগামী হও। কারণ, আল্লাহ কোনো কিছু বিস্মৃত হন না।"[১]

(২) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فلا تبحثوا عنها. وفي لفظ: وَسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تُكَلَّفُوْهَا، رَحْمَةً لَكُمْ فاقْبَلُوْهَا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কিছু বিধান ফরজ করেছেন তা তোমরা নষ্ট করো না, কিছু বিষয় হারাম করেছেন তা লঙ্ঘন করো না, কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করো না, কিছু বিষয়ে তিনি চুপ থেকেছেন- তিনি তা ভুলে যাননি তোমরা তার অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকো।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "...তিনি অনেক বিষয়ে নীরব থেকেছেন- তিনি তা ভুলে যাননি। অতএব সেসব বিষয়ে তোমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বস্তুত: এটি আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ, তোমরা তা লুফে নাও।"[২]

(৩) সালমান ফারসি (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঘি, পনির ও পশমী বা চামড়ার জামা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন:

الحَلَالُ مَا أَحَلَّ الله فِيْ كِتَابِه وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِيْ كِتَابِه وَمَا سَكَتَ عَنْه فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْه.

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫, হা. ৩৮০০ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বণিত; বাজ্জার, আল-মুসনাদ, খ. ১০, পৃ. ২৬, হা. ৪০৮৭; তাবরানি, মুসনাদুশ শামিয়্যিন, খ. ৩, পৃ. ২০৯, হা. ২১০২, আবু দারদা (রা.) থেকে হাসান সনদে বর্ণিত।

[২] তাব্‌রানি, আম-মুজামুল আওসাত, খ. ৮, পৃ. ৩৮১, হা. ৮৯৩৮, আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত ; দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৩২৫-৩২৬, হা. ৪৩৯৬, আবু সালাবা আল-খুশানি (রা.) থেকে হাসান সনদে বর্ণিত। এছাড়া ইমাম নববি একে তাঁর 'আল-আরবাউন' হাসান হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, পৃ. ৯৪-৯৫, হা. ৩০।

"আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থে যা বৈধ করেছেন তা-ই বৈধ এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থে যা অবৈধ করেছেন তা-ই অবৈধ। আর তিনি যেসব বিষয়ে নীরব থেকেছেন তা তাঁর ক্ষমা ও উদারতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"[১]

উক্ত হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করেননি; বরং এর পরিবর্তে তাদেরকে বাতলে দিয়েছেন এমন মূলনীতি যার আলোকে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হালাল-হারাম বিধান জানতে পারবে। আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যথেষ্ট। কারণ, বাকি বিষয়সমূহ হালাল ও পবিত্র হিসেবে বলবৎ থাকবে।

(২) অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে বড়ো অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা আগে হারাম ছিলো না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম করা হয়েছে।"[২]

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১১১৭, হা. ৩৩৬৭; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৭২, হা. ১৭২৬।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৯, পৃ. ৯৫, হা. ৭২৮৯; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৩১, হা. ২৩৫৮, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

القاعدة الرابعة: اَلْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلى أَقْرَبِ أَوْقَاتِه.

চতুর্থ মূলনীতি

(শরিয়তের) মূলনীতি হলো- নব উদ্ভূত ঘটনাকে নিকটতম সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করা[১]

'হাদেস' (حادث) শব্দটির অর্থ হলো- নতুনভাবে সংঘটিত ঘটনা–যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিলো না। যদি এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় ও কারণ নির্ণয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তাকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হবে। কেননা, এ কথা নিশ্চিত যে, নিকটতম সময়ের সাথে উক্ত ঘটনার সম্পৃক্ততা রয়েছে। পক্ষান্তরে দূরবর্তী সময়ের সাথে এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। আর সন্দেহের কারণে নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত বিষয় দূরীভূত হয় না। মোটকথা, নব উদ্ভূত যেকোনো ঘটনার সময় নির্ণয়ে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বর্তমান সময়ের অব্যবহিত আগের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, যদি তাকে দূরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করার মতো কোনো অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে। উদাহরণত নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ প্রণিধানযোগ্য:

(১) যদি কোনো মুসলিম পুরুষ কোনো জিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রে জিযিয়া-কর প্রদানকারী স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক) নারীকে বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর সে নারী দাবি করে যে, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই স্ত্রী হিসেবে সে মিরাস পাবে। অপরদিকে মৃত ব্যক্তির অন্য ওয়ারিস দাবি করে যে, সে নারী তার মৃত্যুর পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন ওয়ারিসের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, যতক্ষণ না সে নারী তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করে।

(২) যদি বিক্রীত পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটি নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ক্রেতা দাবি করে যে, পণ্যটি বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত ছিলো।[২] অপরদিকে বিক্রেতার দাবি হলো, এই ত্রুটি ক্রেতার নিকট নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা-ই প্রাধান্য পাবে। কারণ, মূলনীতি হলো- নব উদ্ভূত বিষয় বা ঘটনাকে তার নিকটতম সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। তবে ক্রেতা যদি তার দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তখন তার বক্তব্য-ই গ্রহণযোগ্য হবে।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৭, ধারা. ১১; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৭১।

[২] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৭, ধারা. ১১।

(৩) কেউ সালাত আদায়ের পর তার কাপড়ে নাপাক দেখতে পায় এবং সে জানে না যে, ঠিক কখন এ নাপাক তার কাপড়ে লেগেছে। এক্ষেত্রে সে সর্বশেষ যখন অপবিত্র হয়েছে তখন থেকে কাপড়ে নাপাক লেগেছে বলে ধর্তব্য হবে। এ জন্য সে সর্বশেষ অপবিত্র হওয়ার পর পবিত্র হয়ে যে সালাত আদায় করেছে তা পুনর্বার পড়ে নেবে। আর যদি কেউ কাপড়ে বীর্য লেগে থাকতে দেখে কিন্তু কোনোভাবেই স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে না পারে, তবে তার ওপর গোসল করা ফরজ হবে। আর সে সর্বশেষ যখন ঘুমিয়ছে তখন থেকে এ পর্যন্ত যতো সালাত আদায় করেছে তা পুনঃবার পড়ে নেবে।

(৪) অন্তঃসত্ত্বা মায়ের পেটে আঘাত করার ফলে গর্ভস্থ সন্তান জীবিত প্রসব হয়ে গেলে এবং উক্ত সন্তান কোনো ধরনের ব্যথা-বেদনা ব্যতীত কিছু কাল জীবিত থেকে মৃত্যুবরণ করলে, তখন আঘাতকারীর ওপর কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কারণ, বাহ্যদৃষ্টিতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সে অন্য কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। পক্ষান্তরে গর্ভস্থ সন্তান যদি আঘাতের অব্যবহিত পর মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করে কিংবা আহত অবস্থায় কিছু কাল যাপনের পর মৃত্যুবরণ করে, তখন আঘাতকারীর ওপর পূর্ণ 'দিয়াত' (রক্তপণ) আরোপ করা হবে।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

মূলনীতিটি 'ইস্তিসহাব' (পূর্বের বিধানের চলমানতা/Presumption of Countinuity) থেকে উৎসারিত যা উসুলবিদদের নিকট সম্পূরক দলিল হিসেবে গণ্য, কিংবা তা ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি থেকে উৎকলিত–যার ভাষ্য হলো:

اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.

"সন্দেহের দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান দূরীভূত হয় না।"[১]

সুতরাং এই মূলনীতির অধীনে যেসব হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে, মূলত সে হাদিসগুলোই আমাদের বক্ষ্যমাণ মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। তন্মধ্য হতে একটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আব্বাদ ইবনু তামিম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত। একদা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার মনে হয়েছে যেনো তার সালাতের মধ্যে কিছু হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন-

لَا يَنْفَتِلُ –أَوْ لَا يَنْصَرِفُ– حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً.

"সে যেনো (নামাজ থেকে) বেরিয়ে না যায়, যতক্ষণ না কোনো শব্দ শুনে কিংবা দুর্গন্ধ পায়।"[২]

---

[১] "ইয়া" অধ্যায়ের প্রথম মলনীতি দ্রষ্টব্য।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৩৯, হা. ১৩৭।

القاعدة الخامسة: اَلْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اِتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ.

পঞ্চম মূলনীতি

কোনো বিষয়ে সংকট বা কষ্ট সৃষ্টি হলে, সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রশস্ততা চলে আসে।[১] উক্ত বিষয়ে প্রশস্ততা এলে বিধান (পুনরায়) সংকুচিত হয়ে যায়

আলোচ্য মূলনীতিটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে গৃহীত। মূলত এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের প্রধান ও সামগ্রিক মূলনীতি- المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ। (কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে)[২]-এর অন্তর্গত একটি শাখা মূলনীতি। মূলনীতির সারবক্তব্য হলো- কোনো বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট ও জটিলতা দেখা দিলে, তখন তাতে সহজতা ও নমনীয়তা চলে আসে। কষ্ট দূরীভূত হলে উক্ত বিষয় পুনরায় পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরে আসে। তাই বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন- "কোনো বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। সে জটিলতা দূর হলে বিষয়টি পূর্ববৎ অবস্থায় সংকুচিত হয়ে ফিরে আসে।"

বস্তুত এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই শরিয়তের যাবতীয় 'রুখসাত' (শিথিলতাপূর্ণ বিধি-বিধান) গ্রহণ করা হয়।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্যমান মূলনীতিটি ফিকহের মৌলিক ব্যাপ্তিসম্পন্ন মূলনীতি- المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ। (কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে)-এর অন্তর্গত একটি শাখা মূলনীতি। তাই যেসব হাদিস উক্ত ব্যাপ্তিসম্পন্ন মূলনীতির অধীনে উল্লিখিত হয়েছে, সে হাদিসগুলোই মূলনীতির প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) ইমাম বুখারি তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে একটি অধ্যায় রেখেছেন, যার শিরোনাম হলো- "দ্বীন হচ্ছে সরল। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: আল্লাহর নিকট নিষ্ঠা ও উদারতার দ্বীনই হলো অধিক পছন্দনীয়"। এতে তিনি একটি

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৮, ধারা. ১৮।

[২] 'মিম' অধ্যায়ের দ্বিতীয় মূলনীতি দ্রষ্টব্য

হাদিস এনেছেন এভাবে- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَه، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ.

"নিশ্চয়ই দ্বীন হচ্ছে সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হয়। সুতরাং তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যমপন্থার) নিকটে থাকো। তোমরা প্রসন্ন থাকো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য প্রার্থনা করো।"[১]

(২) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- "আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবিদের যখন কোনো কাজের নির্দেশ দিতেন, তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন।"[২]

(৩) সুন্নাহয় এমনও বর্ণিত আছে যে, যখন দরিদ্র লোকেরা অভাবের তাড়নায় দলে দলে মদিনায় এসে জড়ো হয়েছিলো, তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবিদের তিন দিনের অধিক পরিমাণ কুরবানির গোশত মজুদ রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন লোকদের মাঝে সচ্ছলতা ফিরে আসে এবং অধিক সংখ্যক লোক কুরবানি করতে সক্ষম হয় তখন তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন-

كُلُوْا وَادَّخِرُوْا مَا شِئْتُمْ.

"এখন তোমরা চাইলে খেতে পারো এবং জমা রাখতে পারো।"[৩]

আলোচ্য হাদিস এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, অভাব-অনটনের কারণে মুসলিমরা যখন সঙ্কটের শিকার হয়েছিলো, তখন তাদেরকে কুরবানির গোশত সঞ্চয় করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। যখন সঙ্কট কেটে যায়, তখন গোশত সঞ্চয়ের বিধান পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরে আসে।
প্রকৃতপক্ষে কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াত থেকেও এই মূলনীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

"অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" [সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩]

---

[১] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ১৬, হা. ৩৯।

[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হা. ২০।

[৩] তাবরানি, আল-মুজামুল কাবির, খ. ১২, হা. ১৩২৩৫।

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১. নাবালক শিশুরা পরস্পরের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারবে। কারণ, এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হবে।

২. কার গর্ভে সন্তান জন্মেছে এক্ষেত্রে একজন ধাত্রী বা মহিলা চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, এক্ষেত্রে সন্তানের বংশপরিচয় সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে অন্যের সম্পদ (বিনা অনুমতিতে) ভক্ষণ করা বৈধ।

৪. জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বিধবার জন্য তার ইদ্দতপালনকালে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

৫. বিভিন্ন ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। যেমন- কুরআন শিক্ষাদান, আজান, ইত্যাদি। যাতে দ্বীনি শাআয়ির তথা ধর্মীয় নিদর্শনাবলি টিকে থাকে। পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তবে কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব কাজ আঞ্জাম দিতে উদ্যত হলে, তখন তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করা যাবে না।

القاعدة السادسة: اَلْإِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلى.

ষষ্ঠ মূলনীতি

ইসলাম সর্বদা প্রাধান্য পাবে, কখনো অপ্রধান বা গৌণ হবে না[১]

(এটি একটি কুরআনস্বীকৃত সনদ, নববি সূত্র, শরয়ি মূলনীতি, প্রাকৃতিক বাস্তবতা ও যুক্তিনির্ভর দলিল।)

ইসলামি আইনশাস্ত্রে এই মূলনীতি বিশেষ গুরুত্বের জায়গা অধিকৃত রেখেছে। মূলত এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম জুহরি (রহ.) বলেছেন: "এ কথা সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমকে দাস বানিয়ে রাখার অধিকার রাখে না।"[২]
শরহুস সিয়ারিল কাবির শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে- "কোনো অমুসলিমের অধীন মুসলিম ক্রীতদাস যদি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে, তখন (অমুসলিম) মালিক তাকে আর ক্রীতদাস হিসেবে রাখতে পারবে না; বরং মালিককে বাধ্য করা হবে তাকে বিক্রি করে দিতে।[৩]
ঠিক তেমনিভাবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে, সন্তান তার অনুগামী হবে এবং তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে।

মূলনীতির দালিলিক ভিত্তি:

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি হাদিসের খণ্ডিত অংশ, যা ইমাম বুখারি (রহ.) ও দারাকুতনি (রহ.) তাঁদের গ্রন্থে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন।[৪]

ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদিসটি এনেছেন এভাবে-

اَلْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ.

"ইসলাম বর্ধিত করে,হ্রাস করে না।"

অপরদিকে ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন-

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ. ১, পৃ. ৯৩।

[২] ইবনু আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, খ. ৪, পৃ. ৫১৩, হা. ২২৬৬২।

[৩] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ. ১, পৃ. ৯৩।

[৪] দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪১৯, হা. ৩৬৬২।

"হাসান, শুরাইহ, ইবরাহিম ও কাতাদাহ (রহ.) বলেছেন, পিতা-মাতার মধ্য হতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান তার সাথে থাকবে। ইবনু আব্বাস (রা.) তাঁর মায়ের সাথে 'মুসতাজআফীন' (দুর্বল ও নির্যাতিত দল)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতা (আব্বাস)-এর সাথে তার সম্প্রদায়ের ধর্মে গণ্য করা হতো না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

اَلْإِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى.

"ইসলাম সর্বদা প্রাধান্য পাবে, কখনো অপ্রধান বা গৌণ হবে না।"[১]

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

(১) মুসলিমের ওপর অমুসলিমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে অমুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারবে না।

(২) কোনো অমুসলিমের অধীনে মুসলিম ক্রীতদাস থাকতে পারবে না।

(৩) অমুসলিমরা যা দাবি করে সবটুকু বিনা বাক্যে গ্রহণ করে সন্ধিচুক্তি করা যাবে না। কারণ, তা মুসলিমদের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম করে।

(৪) পিতা-মাতা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে, তখন সন্তান তাদের মধ্যে মুসলিম ব্যক্তির অনুবর্তী হিসেবে গণ্য হবে।

(৫) বিচারক মুসলিম হওয়া শর্ত। সুতরাং (মুসলিমের ওপর) অমুসলিমের বিচারকার্য বাস্তবায়িত হবে না।

(৬) 'ওয়াহদাতুল আদয়ান' তথা সমস্ত ধর্ম এক ও অভিন্ন- এ শ্লোগানের আলোকে ইসলাম, ইহুদি ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মাঝে সমতা বিধান করার কোনো অবকাশ নেই।[২]

(৭) জিম্মিরা তাদের ধর্মমতে যেসব কর্মকাণ্ডকে অবৈধ জানে, সেসব ক্ষেত্রে তারা ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। যেমন- চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। তবে যেসব কাজকে তারা বৈধ হিসেবে জানে, সেসব ক্ষেত্রে তারা ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে না। যেমন- মদ্যপান।

(৮) অমুসলিমদের কবরস্থান মুসলিমদের কবরস্থান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে। সুতরাং মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত কবরস্থানে কোনো অমুসলিমকে দাফন করা যাবে না।

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.২, পৃ. ৯৩, হা. ১৩৫৩।

[২] ড. আবিদ আস-সুফয়ানি, কাইদাতু: "আল-ইসলামু ইয়ালু ওয়ালা ইয়ুলা": দিরাসা তাসিলিয়্যাহ ওয়াত তাতবিকিয়্যাহ, মাজাল্লাতু জামিয়া উম্মুল কুরা, সংখ্যা, ২২, রবিউল আওয়াল ১৪২২ হিজরি।

القاعدة السابعة: اَلْاِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.

সপ্তম মূলনীতি

জরুরি অবস্থা অন্যের অধিকার হরণের বৈধতা প্রদান করে না[১]

শরিয়তের দৃষ্টিতে উপর্যুক্ত মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। অনেক পরিস্থিতিতে এই মূলনীতির যথাযথ প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। যেমন- বাস্তব জীবনে, দা'ওয়াত ও রাজনীতির ময়দানে এবং তথ্যজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদদের মতে এই মূলনীতির মর্মার্থ হলো- যদি কোনো ব্যক্তি অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়ে শরিয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজে জড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়, এতে তাকে পাপ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ- মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ার ভয়ে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের খাবার বা পানীয় অনুমতি ছাড়া খেয়ে ফেলে, তাহলে পরবর্তীতে তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

মূলত এই মূলনীতি অন্য আরেকটি মূলনীতির ব্যাপক পরিধিকে সীমিত করে দেয়। মূলনীতিটি হলো-

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়।"[২]

কারণ, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার প্রভাবে অবৈধ কাজ বৈধতার রূপ লাভ করে, যেমন- মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ; কিংবা অন্য ক্ষেত্রে কোনো কাজের যথারীতি বিধি-নিষেধ বহাল রেখে তার পাপ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, যেমন- কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা; তথাপি এতোদুভয় পরিস্থিতিতে কেউ অন্যের হক নষ্ট করার অধিকার পায় না। অন্যথায় তখন এক ক্ষতিকে অন্য ক্ষতির মাধ্যমে দূর করার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যা শরিয়ত বিবর্জিত।[৩]

উপর্যুক্ত মূলনীতির একটি শাখাগত মাসআলা হলো- ক্ষুধার তাড়নায় কোনো ব্যক্তি একান্ত বাধ্য হয়ে অন্যের খাবার খেয়ে ফেললে, তাকে পরবর্তীতে খাবারের সমপরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৪]

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৯, ধারা. ৩৩; আহমদ আজ-জারকা, শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ২১৩।

২ 'দোয়াদ' অধ্যায়ের দ্বিতীয় মূলনীতি দ্রষ্টব্য।

৩ মুহাম্মদ সিদকি ইবনু আহমদ আল-বুরনো, আল-ওয়াজিয ফি ইজাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়া, পৃ. ২৪৪।

৪ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৯, ধারা. ৩৩।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

উপর্যুক্ত মূলনীতির উৎস হলো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী-

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম।"[১]

এই প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভি (রহ.) বলেন-
"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী (তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম)-কে সামনে রেখে সকল ইসলামি আইনবিশারদগণ একমত পোষণ করেছেন যে- ক্ষুধার তাড়নায় কোনো ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অন্যের খাবার খেতে বাধ্য হলে, তাকে এর যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার সারবক্তব্য হলো– জরুরি অবস্থা এ বিষয়ের অনুমোদন দেয় না যে- কারো সম্পদ নষ্ট করা হবে কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে না।"[২]

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.১, পৃ. ২৪, হা.৬৭।

[২] তাহাভি, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, খ. ৩, পৃ. ৪০৪, হা. ১৫৪৭।

القاعدة الثامنة: إِنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ اللهِ تَعَالى بِالْمَالِ لَا يَمْنَعُ حَقَّ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيْلِ.

অষ্টম মূলনীতি

"সম্পদের সাথে আল্লাহর অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সম্পদ স্থানান্তর কিংবা রূপান্তরের অধিকার নিষিদ্ধ হয় না"[১]

(হানাফি মাজহাবের আইনবিশারদগণ মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন)

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসঃ

উরওয়াহ বারিকি (রা.) হতে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কুরবানির জন্তু (অন্য বর্ণনায়, একটি বকরী) কিনে দেয়ার জন্য তাকে এক দিনার দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দুটি (কুরবানির জন্তু বা বকরী) ক্রয় করলেন। অতঃপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি বিক্রি করে দিলেন এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এক দিনারসহ অপরটি নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্যে দোয়া করলেন।"[২] হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় হলো- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানির জন্তুর বিক্রয়কে অনুমোদন করেছেন এবং উরওয়াহ (রা.)-এর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের দোয়া করেছেন।

---

[১] কাজি খান, শরহুজ জিয়াদাত, পৃ. ৩৫৪; সারাখসি, আল-মাবসুত, খ. ২, পৃ. ১৭৩।

[২] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩২, পৃ. ১০০, হা. ১৯৩৫৬; বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ২০৭, হা. ৩।

القاعدة التاسعة: اَلْإِذْنُ الْعُرْفِيُّ يَقُوْمُ مَقَامَ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ.

নবম মূলনীতি

রীতিসিদ্ধ অনুমতি মৌখিক অনুমতির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য

উপর্যুক্ত মূলনীতির ব্যাখ্যা হলো– কোনো মুসলিম যদি তার অপর মুসলিম ভাই বা বন্ধুর সম্পদ থেকে বিনা অনুমতিতে এতো স্বল্প পরিমাণ বস্তু হস্তগত করে, যাতে ঐ অঞ্চলের মানুষের সচরাচর উদারতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনের রেওয়াজ প্রচলিত আছে–যা সংরক্ষণের ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না কিংবা এ ধরনের স্বল্প পরিমাণের বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষকে তর্ক-বিবাদে জড়াতে দেখা যায় না; আর যে নিচ্ছে সে যদি মালিকের সম্মতির ব্যাপারে নিশ্চিত হয় কিংবা এ ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা থাকে, তবে এভাবে নেওয়াটা তার জন্য দূষণীয় নয়। কারণ, রীতিসিদ্ধ অনুমতি মৌখিক অনুমতি বলে গণ্য হয়। এমনকি অনেক সময় মালিক এ ধরনের নগণ্য মালের জন্য বন্ধুর অনুমতি প্রার্থনাকে রীতিমত অভব্য ও দূরত্বমূলক আচরণ মনে করে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ্র সাধারণ বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়।[১]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন- "দু'বন্ধুর প্রত্যেকে তার সম্পদের ব্যবহার অপরের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে অবারিত করে দেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও অনুমোদিত। তাইতো সালাফের মধ্যে অনেকে এমনটি করতেন। তাদের মধ্যে কেউ অপরের ঘরে প্রবেশ করে তার অবর্তমানে খাবার খেয়ে ফেলতেন। কারণ, যিনি খাবার গ্রহণ করছেন তিনি এ বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে- তার বন্ধুর এ বিষয়ে পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- 'অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে'।"[২]

'*আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ*'-এর মধ্যে উল্লেখ আছে: "শাফেয়িদের মতে, এক বন্ধু অপর বন্ধুর অবর্তমানে তার ঘর কিংবা বাগানে গিয়ে খেতে পারবে,

---

[১] সুরা নুরের ৬১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

[২] ইবনু তায়মিয়া, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৪৭১। তাঁর বক্তব্যে বর্ণিত আয়াতের পূর্ণ রূপ হলো- "অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই, তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই খাওয়া-দাওয়া করা তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মাতাদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচা-জেঠাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যেগুলোর চাবির মালিক তোমরা, অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। (সুরা নুর: ৬১) (অনুবাদক)

যদি ঘর কিংবা বাগানের মালিক বন্ধু নাখোশ হবে না- এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।”[১]

তবে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো- উপর্যুক্ত আলোচনার সম্পর্ক হচ্ছে এমন স্বল্প পরিমাণ সম্পদের সাথে, যে ব্যাপারে সচরাচর মালিকের সন্তোষ ও সম্মতি থাকে। পক্ষান্তরে সম্পদের পরিমাণ যদি রীতিসিদ্ধ নিয়ম অতিক্রম করে যায়, তবে তা বৈধ হবে না। আল্লামা ইবনু তায়মিয়া স্বরচিত *আল-কাইদাতুন নুরানিয়্যা* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন-

“সম্পদ ব্যবহারের অনুমোদন, সম্পদের মালিকানা প্রদান কিংবা উকিল হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মালিক পক্ষ হতে রীতিসিদ্ধ অনুমতি মৌখিক অনুমতির স্থলে বিবেচিত হয়।

মূলত এই নীতির ভিত্তিতেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘বাইআতুর রিদওয়ান’ (সন্তুষ্টির শপথ)-এর সময় ওসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ হয়ে বাইআত (শপথ) গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে তিনি ‘খানদাক’ (পরিখা)বাসীদেরকে নিয়ে বিনা অনুমতিতে আবু তালহা ও জাবির (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সম্মতি ও সন্তুষ্টি রয়েছে।”[২]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

উরওয়াহ বারিকি (রা.) হতে বর্ণিত, “রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কুরবানির জন্তু (অন্য বর্ণনায়, একটি বকরী) কিনে দেয়ার জন্য তাকে এক দিনার দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দুটি (কুরবানির জন্তু বা বকরী) ক্রয় করলেন। অতঃপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি বিক্রি করে দিলেন এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এক দিনারসহ অপরটি নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্যে দোয়া করলেন।”[৩]

---

[১] আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, খ. ২৩, পৃ. ৩২১।

[২] ইবনু তায়মিয়া, আল-কাইদাতুন নুরানিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১২৬।

[৩] হাদিসটির রেফারেন্স অষ্টম কায়িদার অধীনে অতিবাহিত হয়েছে; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৫৬, হা. ৩৩৮৪।

القاعدة العاشرة: اَلْاِحْتِجَاجُ بِمَفْهُوْمِ الْمُوَافَقَةِ.

দশম মূলনীতি
সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের প্রামাণিকতা[১]

(অবিসংবাদিত উসুলি কায়িদা/Rule of Juristic Principle)[২]

'মাফহুম' বা প্রচ্ছন্ন মর্ম দু ভাগে বিভক্ত। যথা-
(১) 'মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ' বা সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম (Harmonious Meaning)।
(২) 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' বা বিপরীত মর্ম (Opposite Meaning)।

এই প্রকারভেদের ভিত্তি হচ্ছে- যে মর্ম (শরয়ি বক্তব্যে) অনুচ্চারিত ও প্রচ্ছন্ন তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিধানসম্বলিত (শরয়ি বক্তব্যে) উচ্চারিত মর্মের সাথে হয় সাযুজ্যপূর্ণ হবে, কিংবা বিরোধপূর্ণ হবে। (শরয়ি বক্তব্যে) উচ্চারিত মর্মের সাথে অনুচ্চারিত মর্ম সাযুজ্যপূর্ণ হলে, তাকে সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম বলা হবে। আর বিরোধপূর্ণ হলে, তাকে বিপরীত মর্ম বলা হবে। আমেদি (রহ.) সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "যে বিষয়ে শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য অবিদ্যমান, তা (শরিয়তের) সুস্পষ্ট বক্তব্যসম্বলিত বিষয়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়া। এ ধরনের মর্ম 'ফাহওয়াল খিতাব' (শরয়ি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য) ও 'লাহনুল খিতাব' (বক্তব্যের সারমর্ম) হিসেবেও পরিচিত।[৩]

সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম দু প্রকার। যথা-

(১) যেখানে শরিয়ত নির্দেশিত বিধান সরাসরি উল্লিখিত মূল মর্মের তুলনায় অনুচ্চারিত মর্মের ক্ষেত্রে অধিক জোরালোর ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হয়। একে 'ফাহওয়াল খিতাব' বা শরয়ি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলে।

(২) যেখানে অনুচ্চারিত মর্ম ও সরাসরি উল্লিখিত মর্ম উভয়ের 'ইল্লাত' (কার্যকারণ) একই হয়, ফলে উভয়ের ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্দেশিত বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। একে 'লাহনুল খিতাব' বা শরয়ি বক্তব্যের সারমর্ম বলে।

'ফাহওয়াল খিতাব'-এর উদাহরণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

---

[১] আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ২৫০।

[২] উসুলি কায়িদা বলা হয়, যে মূলনীতির সাহায্যে কোনো বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করা এবং শরিয়তের দলিলাদি থেকে বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

[৩] আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৬৬।

﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

"তাঁদের (পিতামাতার) একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না; তাঁদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো।" [সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩]

এই আয়াতে একদিকে পিতামাতার প্রতি নিজের অসন্তোষ-বিরক্তিভাব প্রকাশ এবং তাদেরকে ধমক দেয়া থেকে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে। আর এই নিষিদ্ধ বিধানের 'ইল্লাত' (কারণ) হলো- তাদের কষ্ট দান।

অন্যদিকে আয়াতের সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম থেকে এ কথার প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, সন্তানের জন্য আবশ্যক পিতামাতাকে যেকোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা। কারণ প্রহার, গালমন্দ ইত্যাদি অশুভ আচরণের কথা আয়াতে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও, সেগুলো অসন্তোষ প্রকাশ ও বিরক্তিসূচক বাক্য উচ্চারণের তুলনায় অধিক মারাত্মক ও পীড়াদায়ক। সুতরাং বিরক্তিভাব প্রকাশ ও ধমকের তুলনায় প্রহার ও গালমন্দ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অধিক জোরদার ও শক্তিশালী হয়ে যায়।

'ফাহওয়াল খিতাব'-এর আরেকটি উদাহরণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُۥ﴾

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে।" [সুরা আয-যিলযাল, আয়াত: ৭-৮]

আয়াতদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হলো- সৎকাজ ও অসৎকাজ থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও হিসাব থেকে বাদ যাবে না, আর প্রচ্ছন্ন মর্ম হলো- যেখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণ আমল পর্যন্ত হিসাব থেকে বাদ পড়বে না, সেখানে বড়ো আমল হিসাব হওয়ার বিষয়টি আরো জোরালো ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়।

'লাহনুল খিতাব'-এর উদাহরণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই যারা এতিমদের মালসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা যেনো আগুন দিয়েই নিজেদের উদর ভর্তি করছে; অচিরেই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলতে থাকবে।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১০]

এ আয়াতের সরাসরি নির্দেশনা হলো- এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। কিন্তু আয়াতের সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম থেকে যে প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা পরিস্ফুট হয়, তা হলো- এতিমের মাল যেকোনো প্রকারে বিনষ্ট করা যেমন হারাম, তদ্রূপ তা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করাও সমানভাবে হারাম। কারণ, উভয় অবস্থায় এতিমের সম্পদ ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের প্রামাণিকতা' উসুলুল ফিকহের একটি স্বীকৃত মূলনীতি। যার সম্পর্ক হচ্ছে- শরয়ি বিধানের ওপর শব্দের নিদের্শনা পদ্ধতির সাথে। এ মূলনীতির গ্রহণযোগ্যতার ওপর ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম এমন এক প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা যা বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসংখ্য হাদিসে এ নীতির বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

আমেদি (রহ.) বলেন- "মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ (সাযুজ্যপূর্ণ মর্ম)-এর প্রামাণিকতা উসুলুল ফিকহের একটি স্বীকৃত মূলনীতি এবং একটি গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী দলিল। শরিয়তের বিধানবলি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবনের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

যেমন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী-

اِحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا.

"তুমি এর (পড়ে থাকা বস্তুর) থলে ও বাঁধন সংরক্ষণ রাখো।"[২]

হাদিসের প্রচ্ছন্ন মর্ম থেকে কুড়িয়ে পাওয়া দিনার সংরক্ষণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

আরেক হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনিমতের মাল আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেন-

أَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ.

"তোমরা সুতা এবং সুঁই গনিমতের মালের মধ্যে জমা দাও।"[৩]

---

[১] আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ২৫০।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ১২৪, হা. ২৪২৭; মুসলিম, আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ১৩৪৬, হা. ১৭২২, যায়দ ইবনু খালিদ আল-জুহানি (রা.) এর বরাতে বর্ণিত।

[৩] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩৭, পৃ. ৩৭১, হা. ২২৬৯৯; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ১৩১, হা. ৪১৩৮।

হাদিস থেকে যে প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা প্রতিভাত হয় তা হলো- মালপত্র, মুদ্রা, ইত্যাদি সম্পদ আদায়ের বিধান আরো দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো-

مَنْ سَرَقَ عَصَا مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ رَدُّهَا.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলিমের লাঠি চুরি করে, তবে তা ফিরিয়ে দেয়া তার কর্তব্য।"

হাদিসের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো- এর (লাঠি) চেয়ে অধিক মূল্যবান বস্তু হলে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[১]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ এ কথারই সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয় যে, 'সাযুজ্যপূর্ণ মর্মের প্রামাণিকতা' উসুলুল ফিকহের একটি স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি। শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে।

---

[১] আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৬৮।

القاعدة الحادية عشرة: اَلْاِحْتِجَاجُ بِمَفْهُوْمِ الْمُخَالَفَةِ.

একাদশ মূলনীতি
বিপরীত মর্মের প্রামাণিকতা

বিপরীত মর্মের সংজ্ঞা:

'মাফহুমুল মুখালাফাহ' বলতে বোঝায়, (শরয়ি বক্তব্যে) উচ্চারিত মর্মের নির্দিষ্ট কোনো বিশেষণ-শর্তের অনুপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট বিধানটি অনুচ্চারিত মর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা অব্যক্ত রয়েছে তার বিধান সরাসরি আলোচিত বিষয়ের বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' বা বিপরীত মর্মকে 'দলিলুল খিতাব'ও বলে।

অধিকাংশ ইমাম 'মাফহুমুল মুখালাফাহ'কে শরয়ি দলিলরূপে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে হানাফি ইমামগণের মতে, তা শরয়ি দলিলরূপে বিবেচ্য নয়।

যাঁদের মতে 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' শরয়ি দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য তাঁরা তাঁদের দাবির পক্ষে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করে থাকেন:

এক: আরবি ভাষার ব্যবহার রীতির প্রতি লক্ষ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিধানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা শর্ত বা সীমা বা সংখ্যা শর্তযুক্ত করার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করা হয় যে- উক্ত বিধানের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা সেসব বিষয়ের সাথে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ বিধানসংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিশেষণ (বৈশিষ্ট্য, শর্ত, সীমা বা সংখ্যা) পাওয়া গেলে বিধানটি পাওয়া যাবে, আর নির্ধারিত বিশেষণ পাওয়া না গেলে বিধানটিও পাওয়া যাবে না।
যেমন, কেউ যদি বলে– তোমার সন্তান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে একটি ঘড়ি দেবে; তার এ কথার বিপরীত মর্ম হবে– যদি সে উত্তীর্ণ না হয় তবে তাকে ঘড়ি দেবে না।

দুই: নস (শরয়ি বক্তব্য)-এর মধ্যে কোনো বিষয়ের জন্য যেসব বিশেষণ বা শর্ত আরোপ করা হয়, তার পেছনে কোনো মর্মবহুল রহস্য বা সুদূরপ্রসারী উপকারিতা অবশ্যই থাকবে। কারণ, প্রাজ্ঞ বিধানকর্তা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) অনর্থক কোনো বিশেষণ বা শর্ত বিধানের সাথে জুড়ে দিতে পারেন না। তবে কোনো লক্ষণ দ্বারা যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে- নির্দিষ্ট বিশেষণ বা শর্ত আরোপের পেছনে বিধানকে সুনির্দিষ্ট বা শর্তযুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বিধানকে জোরদার করা কিংবা কোনো

বিষয়ের প্রশংসা বা নিন্দা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এ ধরনের বিপরীত মর্ম দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না।

তৃতীয়: রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

فِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ.

"চারণভূমিতে বিচরণকারী বকরীর ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হবে।"

লক্ষণীয় বিষয় হলো- চারণভূমিতে অবাধ বিচরণশীল পশু থেকে জাব খাওয়ানো পশুর বিধান যদি ভিন্ন না হতো, তবে হাদিসে প্রথমোক্ত পশুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব হতো না। সুতরাং চারণভূমিতে বিচরণকারী পশুর বিধান উল্লেখের কারণে বিপরীত মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে পশু চারণভূমিতে বিচরণ করে খায় না তার ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রয়োগ হবে না।

সুতরাং 'বিপরীত মর্মের প্রামাণিকতা' উসুলুল ফিকহের একটি স্বীকৃত মূলনীতি যা শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি মতাবলম্বী ইমামদের মতে শরয়ি দলিল হিসেবে পরিগণিত। তাই তাঁরা 'মাফহুমুল লাকব' ব্যতীত 'মাফহুমুল মুখালাফাহ'-এর অন্যান্য সমস্ত প্রকারের সাহায্যে বিভিন্ন শরয়ি বিধান সাব্যস্ত করে থাকেন।

উল্লেখ্য, 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' বা বিপরীত মর্ম ছয় প্রকার। যথা-

(১) 'মাফহুমুস সিফাহ' বা নির্দিষ্ট বিশেষণসূচক মর্ম। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীন ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের মালিকানাভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে।" [আন-নিসা: ২৫]

(২) 'মাফহুমুশ শারত' বা শর্তজ্ঞাপক মর্ম। যেমন- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

"আর তারা (স্ত্রীরা) গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে।" [সুরা আত-তালাক, আয়াত: ২৫]

(৩) 'মাফহুমুল গায়াহ' বা সীমাজ্ঞাপক মর্ম। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার বাণী-

﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾

"আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

(৪) 'মাফহুমুল 'আদাদ' বা নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক মর্ম। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً ﴾

"আর যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো।" [সুরা আন-নুর, আয়াত: ৪]

(৫) 'মাফহুমুল লাকব' বা নামবাচক মর্ম। আবুল হাসান আমেদি (রহ.) এ প্রকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি হাদিস পেশ করেন- যেখানে ছয় প্রকারের বস্তুর ক্ষেত্রে সুদী লেনদেন নিষেধ করা হয়েছে। হাদিসটি হচ্ছে–

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান এবং নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পরিমাণে বেশি দিলো কিংবা বেশি গ্রহণ করলো সে সুদী কারবারে লিপ্ত হলো। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই সমান অপরাধী।"[১]

(৬) 'মাফহুমুল হাসর' বা সীমাবদ্ধকারী মর্ম। এ সীমাবদ্ধকরণ إنَّمَا কিংবা إلَّا ও ما ইত্যাদি অব্যয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ ﴾

"সদকা শুধু ফকির, মিসকিন ও সদকা আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য।" [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

আয়াতের সরাসরি নির্দেশনা হলো- উল্লিখিত আট খাতের মধ্যেই ওয়াজিব সদকা বা জাকাতের সম্পদ ব্যয় করা হবে। এর বিপরীত মর্ম (মাফহুমুল হাসর) থেকে যে কথা স্পষ্ট হয় তা হলো- উপরোল্লিখিত আটটি খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে জাকাত ব্যয় করা যাবে না।

সারবক্তব্য হচ্ছে– শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি মতাবলম্বী ইমামদের মতে 'মাফহুমুল লাকব' ব্যতীত 'মাফহুমুল মুখালাফা' তথা বিপরীত মর্মের অন্যান্য সমস্ত প্রকারের প্রমাণসিদ্ধতা একটি উসুলি মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত। তাঁদের মতে 'মাফহুমুল

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩৪, পৃ. ৩৭, হা. ২০৩৯৫; বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৭৫, হা. ২১৮২; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ২৮০, হা. ৪৫৭৮, আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত।

মুখালাফা' শরয়ি হুজ্জত (প্রমাণ)–যা বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে সহায়তা প্রদান করে। পক্ষান্তরে হানাফি মতাবলম্বী ইমামদের মতে 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' কোনো উসুলি মূলনীতি কিংবা শরয়ি হুজ্জত-প্রমাণ নয়।

মূলনীতির দালিলিক ভিত্তি:

যাঁদের মতে 'মাফহুমুল মুখালাফা' শরয়ি দলিল হিসেবে বিবেচিত তারা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন হাদিস দিয়ে এর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করে:

(১) ভাষাতত্ত্ববিদদের উপলব্ধি: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوْبَتَه وَعِرْضَه.

"সম্পদশালী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানি ও শাস্তি বৈধ করে দেয়।"[১]

প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সালাম (রহ.) উল্লিখিত হাদিসের ওপর মন্তব্য করে বলেন- "হাদিসটি এ কথার ওপর নির্দেশ করে যে, নিঃসম্বল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।" অনরূপভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরেকটি হাদিসের ভাষা হলো-

مَطَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"ধনী ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম।"[২]
এই হাদিসের ক্ষেত্রেও তিনি বলেন- "হাদিসের প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা হলো- দরিদ্র ব্যক্তির গড়িমসি জুলুম হিসেবে পরিগণিত হবে না।" এরূপ আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে এ কথা প্রতিভাত হয়ে যায় যে, ভাষাবিদগণ শরয়ি বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বিপরীত নির্দেশনাকে আমলে নিয়েছেন।

(২) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপলব্ধি: কাতাদাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী অবতীর্ণ হয়-

﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾

"আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।" [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮০]

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ২৯, পৃ. ৪৬৫, হা. ১৭৯৪৬; বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ১১৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩১৩, হা. ৩৬২৮; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ৩১৬, হা. ৪৬৮৯, শারিদ ইবনু সুওয়াইদ আস-সাকাফি (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৯৪, হা. ২২৮৭, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

قَدْ خَيَّرَنِيْ رَبِّيْ، فَوَاللّـهِ لَأَزِيْدَنَّ عَـلـى السَّبْعِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে দোয়া করা বা না করার এখতিয়ার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবো।[১]
হাদিসের মর্ম হলো- সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনার বিধান সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনার বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

(৩) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর উপলব্ধি: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়।"[২]

সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, উক্ত হাদিসের বিধান রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরেকটি হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। (রহিতকারী) হাদিসটি হলো–

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

"পুরুষের লজ্জাস্থান ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে (উভয়ের ওপর) গোসল করা ওয়াজিব-অপরিহার্য।"

কারণ "বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়"-এ হাদিসটির মর্ম হলো– বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি তা এই বিপরীত মর্ম বহন না করতো, তবে পরবর্তী হাদিস দ্বারা তা রহিত করার প্রয়োজন পড়তো না।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে- ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ﴾

"কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে–এই আশঙ্কা থাকলে নামাজ কসর করে পড়াতে তোমাদের কোনো দোষ হবে না।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১০১] কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। (সুতরাং এখন নামাজ কসর করে পড়ার আর প্রয়োজন কী?) একথা শুনে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন- তুমি যে কারণে বিস্মিত হয়েছো আমিও ঠিক একই কারণে বিস্মিত হয়েছিলাম। (অর্থাৎ আমিও

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৬, পৃ. ৬৭-৬৮, হা. ৪৬৭০, ৪৬৭২, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ.১, পৃ. ২৬৯, হা. ৩৪৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৯, হা. ৬০৭; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ, ১, পৃ. ৫৫-৫৬, হা. ২১৫, ২১৭; তিরমিজি, আস-সুনান, খ, ১, পৃ. ১৭১, হা. ১১০; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১১৫, হা. ১৯৯।

নামাজ কসর করে পড়ার কোনো যৌক্তিতা খুঁজে পাচ্ছিলাম না)। তাই উক্ত বিষয়ে আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَه.

এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সদকা বা দান। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রদত্ত সদকা গ্রহণ করো।[১]

লক্ষণীয় বিষয় হলো- ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রা.) ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) দুজনই স্পষ্ট আরববাসী ছিলেন, তথাপি তাঁরা আয়াত থেকে বিপরীত মর্ম উপলব্ধি করেছেন। অপরদিকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওমর (রা.)-এর উক্ত উপলব্ধিকে সমর্থন করেই তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধভাষী সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর মন্তব্য থেকে এ বিষয় সুপ্রমাণিত হয় যে, 'মাফহূমুল মুখালাফা'-এর প্রমাণসিদ্ধতা কোনো মনগড়া ভিত্তিহীন মূলনীতি নয়; বরং এ মূলনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সরাসরি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসসম্ভারের ওপর। তাই 'মাফহুমুল মুখালাফা' সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কিরামের নিকট একটি শরয়ি দলিল ও উসুলুল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে সমাদৃত।[২]

পক্ষান্তরে হানাফি মতাবলম্বী ইমামগণ 'মাফহুমুল মুখালাফা'-কে প্রমাণসিদ্ধ দলিল হিসেবে বিবেচনা করেন না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মূলনীতির প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে হানাফিগণের সাথে অন্যান্য ইমামের মধ্যকার এ মতভিন্নতার কারণে ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহারিক মাসআলার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এরূপ কিছু মাসআলা তুলে ধরা হলো-

(ক) স্বাধীন নারী বিয়ে করতে আর্থিকভাবে সক্ষম–এরূপ ব্যক্তির জন্য কিতাবি (ইহুদি বা খ্রিস্টান) দাসী বিয়ে করার বিধান।

(খ) যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই তার জন্য কিতাবি দাসী বিয়ে করার বিধান।

(গ) 'তাবিরে নাখাল' (স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবেশ) করার পূর্বে খেজুর গাছ বিক্রয় হলে এর ফলের বিধান।

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ.১, পৃ. ৪৭৮, হা. ৬৮৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৩৯, হা. ১০৬৫; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ, ২, পৃ. ৩, হা. ১১৯৯; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৯৩, হা. ৩০৩৪; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ১১৬, হা. ১৪৩৩।

[২] মুস্তফা সাইদ আল-খিন, আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যিাহ ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ১৭২, ১৮০।

(ঘ) চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী না হলে তার খোরপোষ যোগানোর বাধ্যবাধকতা।

(ঙ) তাকবির দিয়ে নামাজ শুরু করার বিধান।

(চ) পিতা তার প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত কন্যাকে বিবাহের জন্য বাধ্য করার বিধান।

(ছ) স্বামীহারা স্ত্রী ইদ্দতকাল পূর্ণ করার পূর্বে তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের নিষিদ্ধতা।

যেহেতু শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি স্কলারদের মতে 'মাফহুমুল মুখালাফা' তথা বিপরীত মর্ম শরিয়ত স্বীকৃত দলিল এবং একটি উসুলি মূলনীতি, তাই প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য হলো- স্বাধীন (ঈমানদার) নারী বিয়ে করতে সক্ষম- এরূপ ব্যক্তির জন্য কিতাবি (ইহুদি বা খ্রিস্টান) দাসী বিয়ে করা বৈধ নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীন ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের মালিকানাভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৫]

আয়াতে উল্লিখিত শর্তের বিপরীত নির্দেশনাকে আমলে নিলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন (ঈমানদার) নারী বিয়ে করতে সক্ষম- এরূপ ব্যক্তির জন্য কিতাবি (ইহুদি বা খ্রিস্টান) দাসী বিয়ে করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে হানাফিগণের মতে এ ধরনের বিয়ে বৈধ হবে।

অনুরূপভাবে একই আয়াতের বিপরীত নির্দেশনার ভিত্তিতে দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রেও শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি মতাবলম্বী ইমামগণের অভিমত হলো– যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই তার জন্য কিতাবি দাসী বিয়ে করা বৈধ হবে না। অপরদিকে হানাফি স্কলারদের মতে, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও কিতাবি দাসীকে বিয়ে করা বৈধ হবে।

অবশিষ্ট মাসআলাসমূহের বিধান সাব্যস্তকারী বিপরীত মর্ম সম্বলিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস নিম্নরূপ:

<u>তৃতীয় মাসআলাসংক্রান্ত হাদিস:</u> রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী-

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ.

"কোনো ব্যক্তি যদি খেজুর গাছের 'তাবির' (স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবেশ) করার পর তা বিক্রি করে, তাহলে তার ফল বিক্রেতার।"[১]

চতুর্থ মাসআলাসংক্রান্ত আয়াত: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

"আর তারা (স্ত্রীরা) গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে।" [সুরা আত-তালাক, আয়াত: ৬]

পঞ্চম মাসআলাসংক্রান্ত হাদিস: রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"পবিত্রতা হলো সালাতের চাবিকাঠি, তার তাকবির হলো হারামকারী ও তার সালাম হলো হালালকারী।"[২]

ষষ্ঠ মাসআলাসংক্রান্ত হাদিস: রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন–

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

"(সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে) বিধবা স্ত্রীলোক তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার।"[৩]

সপ্তম মাসআলাসংক্রান্ত আয়াত: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ﴾

"আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখো তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৫]

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ১১৫, হা. ২৩৭৯, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১০১, হা. ২৭৫; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৬, হা. ৬১; তিরমিজি, আস-সুনান, খ, ১, পৃ. ৫৪, হা. ৩;

[৩] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১০৩৭, হা. ১৪২১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬০১, হা. ১৮৭০; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ, ২, পৃ. ২৩২, হা. ২০৯৮-২০৯৯; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৪০৭, হা. ১১০৮; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৬, পৃ. ৮৪, হা. ৩২৬০-৩২৬১।

উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে যে বিপরীত নির্দেশনা বোধিত হয়, তা শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি মতাবলম্বী ইমামগণের মতে আমলযোগ্য ও দলিলযোগ্য। সুতরাং তাদের নিকট বিপরীত মর্মের প্রামাণিকতা উসুলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত।[১]

---

[১] মুস্তাফা সাইদ আল-খিন, আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যাহ ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ১৮২-১৮৯।

القاعدة الثانية عشرة: اِقْتِضَاءُ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ الوَحْدَةُ أَوِ التَّكْرَارُ

দ্বাদশ মূলনীতি

"সাধারণ-শর্তহীন অনুজ্ঞার দাবি হলো- কাজের একবার অনুশীলন বা পুনঃপুন অনুশীলন"

('আম্‌র বা আদেশসংক্রান্ত একটি উসুলি মূলনীতি)

শাফেয়ি মাজহাবের অন্যতম স্কলার আবু ইসহাক আল-ইসফিরায়িনি (রহ.)-এর মতে, এই মূলনীতিটি উসুলুল ফিকহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি–যা ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কাছ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে শব্দের সামান্য পরিবর্তন রয়েছে। অর্থাৎ الْاِقْتِضَاء (দাবি/চাহিদা) শব্দের পরিবর্তে الْاِحْتِمَال (সম্ভাবনা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে:

اَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ.

"'আম্‌র মুতলাক' (সাধারণ আদেশ) দ্বারা যে কাজের আদেশ করা হয় তা বারংবার সম্পাদন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"

অন্যথায় সাধারণ আদেশযুক্ত বাক্যে 'ইস্তিসনা' (বিযুক্তি/Exclusion)-এর প্রয়োগ দেখা যেতো না। যেমন: صُمْ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيْسِ (তুমি রোজা রাখবে; তবে বৃহস্পতিবার ছাড়া।)

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوْا

"হে মানবমণ্ডলী, আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। কাজেই তোমরা হজ করো।" তখন এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসুল, প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? তিনি চুপ থাকলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলো। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন:

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

"আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা (প্রতি বছরের জন্যই) ফরজ হয়ে যেতো। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না।"[১]

ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় প্রশ্নকারী লোকটির সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন– একবার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ

"হে লোকসকল, তোমাদের ওপর হজ ফরজ করা হয়েছে।" তখন আকরা ইবনু হাবিস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, তা কি প্রতি বছরের জন্য? প্রত্যুত্তরে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْمَلُوْا بِهَا، اَلْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّع

"আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা (প্রতি বছর হজ করা) ফরজ হয়ে যেতো। আর যদি তা (প্রতি বছরের জন্য) ফরজ হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তা পালন করবে না এবং তোমাদের পক্ষে তা পালন করা সম্ভবও হবে না। হজ (ফরজ) হলো জীবনে একবার, এরপরে যে অতিরিক্ত আদায় করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে।[২]
হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় হলো– প্রশ্নকর্তা যদি হজ পালনের অনুজ্ঞা থেকে তা বারংবার আদায়ের সম্ভাবনা উপলব্ধি না করতো, তাহলে তার প্রশ্ন কোনো অর্থ বহন করতো না এবং উক্ত প্রশ্নের কারণে সে তিরস্কারযোগ্য হতো।

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি যদিও অন্যতম প্রসিদ্ধ একটি মৌলিক উসুলি মূলনীতি, তবে এর প্রভাবে ব্যবহারিক মাসআলার ক্ষেত্রে তেমন মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। এর দুটি কারণ হতে পারে:

প্রথমত: সমস্ত ইসলামি আইনবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, 'আমর' (অনুজ্ঞা) কোনো কাজের পুনঃপুন অনুশীলনের দাবি করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। তাঁদের এ সর্বসম্মত মতের ফলে মতবিরোধের ক্ষেত্র অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত: এমন ঘটনা বিরল যে, শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট কাজের সাথে এরূপ কোনো লক্ষণ বা দলিল থাকবে না, যা থেকে জানা যায় যে, আদিষ্ট কাজটি কি পুনঃপুন সম্পাদন করতে হবে, নাকি একবার সম্পাদন করলেই হবে।

---

[১] আলাউদ্দিন আল-বুখারি, কাশফুল আসরার শারহু উসুলিল বাজদাভি, খ. ১, পৃ. ১২৪; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হা. ১৩৩৭।

[২] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ১৫১, হা. ২৩০৪; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১১১, হা. ২৬২০।

নিম্নে কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলোর ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে ফিকহি স্কলারদের বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়:

(ক) এক তায়াম্মুম দিয়ে একাধিক ফরজ সালাত আদায়ের বিধান: শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে, কোনো ব্যক্তি তায়াম্মুম করলে উক্ত তায়াম্মুম দিয়ে সে কেবল একটি ফরজ সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে; তবে সে যথেচ্ছা নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে হানাফিদের দৃষ্টিতে তায়াম্মুমকারী যথেচ্ছা ফরজ ও নফল সালাত আদায় করতে পারবে। উভয় পক্ষ আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে দলিল পেশ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ করো এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো... ।" [সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬]

যাঁরা মনে করেন, 'আম্‌র' (অনুজ্ঞা) কোনো কাজের পুন:পুন অনুশীলনের দাবি করে না, তাঁদের মতে– যেভাবে প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য ওজু করা জরুরি নয়, তেমনিভাবে তায়াম্মুম করাও জরুরি হবে না। পক্ষান্তরে যাঁদের মতে, 'আম্‌র' কোনো কাজের পুন:পুন অনুশীলনের দাবি করে, তাঁদের মতে- প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য ওজু ও তায়াম্মুম করা জরুরি; তবে বারংবার ওজুর বিধান রহিত করা হয়েছে (আর তায়াম্মুমের বিধান বাকি আছে)।

(খ) কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে বলে, তুমি (আমার উকিল হয়ে) আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে সে (উকিল) কি এক তালাক দেওয়ার অধিকার পাবে, নাকি তিন তালাক দেওয়ার অধিকার পাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজেকে তালাক দিয়ে দাও। যাঁদের মতে, 'আম্‌র' বারংবার কাজের অনুশীলন দাবি করে, তাঁদের মতে- (উকিল বা) স্ত্রী তিন তালাক দেওয়ার মালিক হবে।

অপরদিকে যাঁরা মনে করেন, 'আম্‌র' বারংবার কাজের অনুশীলন দাবি করে না, তাঁদের মতে- সে কেবল এক তালাকের অধিকার পাবে।[১]

(গ) চোরের বাম হাত কাটা প্রসঙ্গ: আলোচ্য মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে হানাফি ইমামগণ বলেন- চোর দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার বাম হাত কাটা হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴾

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।" [সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৮]

উপর্যুক্ত আয়াতে চোরের হাত কর্তনের নির্দেশ বারংবার পালনের কোনো দাবি বা সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই। সুতরাং চোরের ডান হাত কর্তনের ওপরই ক্ষান্ত করা হবে।[২]

---

[১] মুস্তাফা সাইদ আল-খিন, আসারুল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যাহ ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ৩১৫, ৩১৯।

[২] আলাউদ্দিন আল-বুখারি, কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাভি, খ. ১, পৃ. ১২৩।

القاعدة الثالثة عشرة: الاِحْتِجَاجُ بِالْحَدِيْثِ الْمُرْسَلِ.

ত্রয়োদশ মূলনীতি: 'মুরসাল' হাদিসের প্রামাণিকতা

'মুরসাল' হাদিসের অর্থ:

ইমাম নাবাবি (রহ.) স্বরচিত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: "ফিকহবিদ, উসুলবিদ, খতিব বাগদাদি ও মুহাদ্দিসগণের একটি দলের মতে 'মুরসাল' হলো- যে হাদিসের সনদের যেকোনো স্তরে কোনো একজন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যায়। এই অর্থে তাঁদের দৃষ্টিতে মুরসাল ও মুনকাতি'[১] সমার্থবোধক।"[২] শরহুল কাউকাবুল মুনির প্রণেতা বলেন: "সাহাবি নয় এমন যেকোনো ব্যক্তি যদি বলে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- তাঁর এ উক্তি 'মুরসাল' হিসেবে গণ্য হবে। এই মতটি আমাদের ওলামায়ে কিরাম, ইমাম কারখি, আল্লামা জুরজানি, শাফেয়ি মতাবলম্বী কতেক ওলামায়ে ও বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত। আবার অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদগণের মতে উক্ত সংজ্ঞা তাবেয়ির সাথে নির্দিষ্ট। (অর্থাৎ কোনো তাবেয়ি সাহাবিকে বাদ দিয়ে বলা– 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন)[৩]

উসুলুল ফিকহের যেসব মূলনীতি অনুযায়ী হানাফিগণ আমল করে থাকেন তন্মধ্যে উপরিউক্ত মূলনীতিটি অন্যতম।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মুরসাল হাদিসকে প্রমাণসিদ্ধ দলিল হিসেবে বিবেচনা করলেও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে মুরসাল হাদিস প্রমাণসিদ্ধ দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এই মতভেদের প্রভাব বিভিন্ন ব্যবহারিক মাসআলায় পরিদৃষ্ট হয়।

নিম্নে কিছু মাসআলা এবং তদসংশ্লিষ্ট হাদিসে মুরসাল উল্লেখ করা হলো:

---

[১] যে হাদিসের সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোনো এক স্তরে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে। (নিরীক্ষক)

[২] বাদরুদ্দিন জারকাশি, আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ, খ. ১, পৃ. ৪৪৭; তাকিউদ্দিন আস-সুবকি, আল-ইবহাজ ফি শরহিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৯।

[৩] শরহুল কাউকাবুল মুনির, খ. ২, পৃ. ৩০।

(ক) সালাতে অট্টহাসির ফলে ওজু ভঙ্গের প্রসঙ্গ: আলোচ্য মূলনীতির আলোকে হানাফি ইমামগণ সালাতে অট্টহাসিকে ওজু ভাঙ্গার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। তাঁদের মতের পক্ষে দলিল হলো– নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে সালাতে অট্টহাসির ফলে পুনরায় ওজু করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[১]

পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম উক্ত হাদিসকে আমলে নেননি। কারণ, তা মুরসাল।

অপরদিকে হানাফিগণ উপর্যুক্ত হাদিস মতে আমলের ফলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দৃষ্টিতে আলোচ্য মূলনীতিটি একটি উসুলি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত।

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে আটকে রাখে যাতে অন্যজন এসে তাকে হত্যা করতে পারে, তবে আটককারী ব্যক্তিকে উক্ত হত্যাকাণ্ডে শরিক ধরা হবে কি-না?

হানাফি ও হাম্বালি মাজহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, তাকে হত্যাকাণ্ডে শরিক বিবেচনা করা হবে না; বরং হত্যাকারীকে (হত্যার পরিবর্তে) হত্যা করা হবে এবং যে ধরে রেখেছিলো তাকে (যাবজ্জীবন) কারাদণ্ড দেয়া হবে।[২]
এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে তাঁরা একটি হাদিসে মুরসাল উপস্থাপন করেন, যা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.)-এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَه الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَل وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ.

"যখন কোনো লোক কাউকে আটকে রাখে এবং অন্য লোক তাকে হত্যা করে, তখন হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে; আটককারীকে কারাদণ্ড দেয়া হবে।"[৩]
তবে ইমাম মালিক (রহ.) হাদিসটি আমলে নেননি।

---

[১] জাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ্ লি আহাদিসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৪৭-৭৬; দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৯৮-৩০০, হা. ৬০২-৬০৫।

[২] ইবনু হাজার আল-আসকালানি (রহ.) বলেন: দারাকুতনি হাদিসটি মাওসুল ও মুরসাল উভয়ভাবেই বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাত্তান একে সহিহ বলেছেন এবং তার সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বলেছেন; তবে ইমাম বায়হাকি হাদিসটি মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, পৃ. ৪৪১, হা. ১১৭২।)

[৩] বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ৯০, হা. ১৬০২৯; দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হা. ৩২৭০।

القاعدة الرابعة عشرة: اِقْتِضَاءُ الْأَمْرِ الْوُجُوْبُ.

চতুর্দশ মূলনীতি

অনুজ্ঞার দাবি হলো কাজের বাধ্যবাধকতা সাব্যস্ত হওয়া

ইসলামি আইন-বিশারদগণ এই বিষয়ে একমত যে, 'আম্‌র' তথা অনুজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। কুরআন-হাদিসের অসংখ্য বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا.

"হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ করো।"[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"কাজেই যারা তাঁর (আল্লাহর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা তাদের গ্রাস করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সুরা আন-নুর, আয়াত: ৬৩]

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ শানকিতি (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ 'আদওয়াউল বায়ান'-এর মধ্যে বলেন: "উসুলবিদগণ এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথার প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, 'আম্‌র'-এর আসল দাবি হলো কোনো কাজকে বাধ্যতামূলক করা, যতক্ষণ না এর বিপরীতে অন্য কোনো দলিল বা লক্ষণ পাওয়া যায়। কারণ, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারীদের বিপর্যয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। এ ধরনের ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, 'আম্‌র' দ্বারা কোনো কাজকে অলঙ্ঘনীয়ভাবে আবশ্যক করা উদ্দেশ্য হয়। কারণ, যে বিধান অপরিহার্য নয়, তা পালন না করার কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় না।"

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ১৬, পৃ. ৩৫৫, হা. ১০৬০৭; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হা. ১৩৩৭; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১১০, হা. ২৬১৯।

মোদ্দাকথা, কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কিংবা কোনো শরয়ি বিধান সাব্যস্ত করার জন্য 'আম্‌র' (আদেশসূচক শব্দ) যেসব হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব হাদিস উপরিউক্ত উসুলি মূলনীতির প্রমাণসিদ্ধতা সাব্যস্ত করে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো– এরূপ কোনো লক্ষণ না থাকা যা 'আম্‌র'-কে বাধ্যবাধকতার অর্থ প্রদান থেকে নিবৃত্ত রাখে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের হাদিসের সংখ্যা প্রচুর; বরং কুরআনেরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে–যেখানে 'আম্‌র' বাধ্যবাধকতা আরোপের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

القاعدة الخامسة عشرة: اِقْتِضَاءُ الْأَمْرِ المطلق الفور أو التراخي.

পঞ্চদশ মূলনীতি

সাধারণ 'আম্‌র' (অনুজ্ঞা) অবিলম্বে কর্মসম্পাদন কামনা করে কিংবা বিলম্বে কর্মসম্পাদনের অবকাশ প্রদান করে

এই মূলনীতি দুইটি অভিমতকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হলো- 'আম্‌র'-এর সাধারণ চাহিদা হলো বিলম্বহীনতা। অপর মতটি হলো- 'আম্‌র' দ্বারা যে কার্য সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়, তাতে বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। প্রথম মতটি হাম্বালি মতাবলম্বীদের প্রকাশ্য মাজহাব।

অধিকাংশ হানাফি স্কলারের বক্তব্য হলো- 'আম্‌র' দ্বারা সাধারণত কোনো কার্যের বাস্তবায়ন কামনা করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এতে সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। সুতরাং কোনো কার্য কি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে, নাকি তা অবকাশ নিয়ে সম্পাদন করা যাবে-এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ 'আম্‌র'-এর মধ্যে থাকে না। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বিলম্বে কর্মসম্পাদনের মতটি পোষণ করেছেন।

সাধারণ 'আমর' (আদেশ) যে বিলম্বহীনতা কামনা করে-এ মর্মে কোনো হাদিসের বক্তব্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ﴾

"তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করো।"[১]

আরেকটি আয়াত হলো:

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

"আর তোমরা তীব্র গতিতে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে।" [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৩৩]

---

[১] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১৯

অপরদিকে 'আম্‌র'—এর মধ্যে বিলম্বে কর্মসম্পাদনের অবকাশ দেয়া থাকে—এ মর্মে হাদিসের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে সমর্থনকারী হাদিসটি কর্মসূচক। যেমন- হজের বিধান ষষ্ঠ হিজরিতে ফরজ করা হয়। তবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজ করেছিলেন দশম হিজরিতে। তাঁর সাথে এমন অনেক সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন, যাঁরা সামর্থ্য অর্জনের পরেও দশম হিজরির পূর্বে হজ করেননি। হজ পালন যদি তৎক্ষণাৎ ফরজ হতো, তাহলে তা বিলম্ব করে আদায় করা কোনোক্রমেই বৈধ হতো না।

উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামি আইনবিদদের মাঝে বিভিন্ন উপজাত মাসআলায় মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। যেমন-

(ক) জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা আদায়ে বিলম্ব করা যাবে কি-না।

(খ) যে ব্যক্তি রমজানে রোজা রাখেনি, পরবর্তীতে সেসব রোজা সে দেরিতে কাজা দিতে পারবে কি-না।

(গ) সামর্থ্য অর্জনের পরও ফরজ হজ আদায়ে বিলম্ব করা যাবে কি-না।

القاعدة السادسة عشرة: اِقْتِضَاءُ النَّهْيِ الْفَسَادُ أَوِ الْبُطْلَانُ.

ষষ্ঠদশ মূলনীতি

নিষেধাজ্ঞার (মূল) দাবি হলো অসিদ্ধতা কিংবা অকার্যকরতা

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি উসূলুল ফিক্‌হের (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্র) অন্তর্গত 'নাহ্‌য়ি' অধ্যায়ের অন্যতম জটিল মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত। তাই এই মূলনীতি বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। 'নাহ্‌য়ি'–এর চার অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: 'নাহ্‌য়ি' সাধারণ অর্থে প্রয়োগ হওয়া। অর্থাৎ, যে কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হয়েছে তা কি স্বয়ংগর্হিত নাকি আনুষঙ্গিক কোনো কারণে গর্হিত- এই মর্মে কোনো দলিল বা লক্ষণ অবিদ্যমান।

দ্বিতীয় অবস্থা: কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা তদীয় সত্তা কিংবা কোনো অংশের কারণে প্রয়োগ হওয়া: যেমন- নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা- সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা, গর্ভস্থ ভ্রূণের বেচাকেনা ও গর্ভস্থ ভ্রূণের গর্ভের বেচাকেনা- সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।

তৃতীয় অবস্থা: কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হওয়া তদীয় সত্তার বিচারে নয়; বরং কোনো স্থায়ী গুণের বিচারে। যেমন- সুদী লেনদেন থেকে নিষেধাজ্ঞা।

চতুর্থ অবস্থা: কোনো কাজ মৌলিকভাবে শরিয়তসম্মত; তবে এর সাথে বাহ্যিক কোনো অস্থায়ী গুণের সংশ্লেষের কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া। যেমন- জবরদখলকৃত ভূমিতে সালাত আদায় থেকে নিষেধাজ্ঞা।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মূলনীতিটি সমস্ত ইসলামি আইনবিদদের নিকট উসুলুল ফিকহের একটি আমলযোগ্য মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত। তবে উপরোল্লিখিত 'নাহ্‌য়ি'–এর চার অবস্থাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে নিম্নে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম অবস্থা: সকল ইমাম এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত পোষণ করেছেন যে–সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত 'নাহ্‌য়ি'-এর কারণে নিষিদ্ধ কাজটি নিজস্ব সত্তার কারণে সরাসরি গর্হিত বিবেচিত হবে। শর্ত হলো–নিষিদ্ধ কাজটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যেমন- ব্যভিচার ইত্যাদি। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট কাজটি 'ফাসিদ' তথা 'বাতিল' (অকার্যকর) বলে গণ্য হবে, যদি না এ মর্মে কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় যে, কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা (নিজস্ব সত্তার বিচারে নয়; বরং) কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী গুণের বিচারে প্রয়োগ হয়েছে।

আর যদি নিষিদ্ধ কাজটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়ে শরিয়তস্বীকৃত[১] কার্যাবলির আওতাভুক্ত হয়, তবে কাজটি কি 'ফাসিদ'[২] (অসিদ্ধ) নাকি 'বাতিল' (অকার্যকর) হবে–এক্ষেত্রে ইমামদের কয়েকটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: কোনো শরয়ি কাজের ওপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া এ কথা প্রমাণ করে যে- উক্ত কাজ 'বাতিল' (অকার্যকর) এবং মূলগতভাবে গর্হিত, যদি না এর বিপরীত কোনো লক্ষণ বা দলিল বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ শাফেয়ি মতাবলম্বী স্কলার এবং কিছু সংখ্যক 'মুতাকাল্লিম' (দর্শন-ধর্মতত্ত্ববিদগণ) এই মত পোষণ করেন।

এক্ষেত্রে তাঁরা যে হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন, তা হলো-

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে সমর্থিত নয়–এরূপ কোনো কাজ করলো, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৩]

উল্লিখিত হাদিস থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, শরিয়ত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে, তা কখনো শরিয়তসম্মত হতে পারে না। কারণ, কোনো কাজ একই সাথে নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত হতে পারে না। এজন্যই তো হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী তা প্রত্যাখ্যাত তথা–বাতিলরূপে বিবেচিত হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের কাজের আদৌ কোনো শরয়ি ভিত্তি নেই, তাই তার মাঝে শরিয়তস্বীকৃত কাজের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না।

---

[১] শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা দু প্রকারের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়: (ক) "আফআলে হিস্‌সিয়্যাহ" তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্মকাণ্ড: যেসব কর্মকাণ্ডের বিদ্যমানতা শরয়ি বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্য শব্দে, শরিয়ত কর্তৃক যেসব কর্মকাণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ। যেমন: ব্যভিচার, মদ্যপান, নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা ইত্যাদি। (খ) "আফ'আলে শারইয়্যাহ" তথা শরিয়তস্বীকৃত কর্মকাণ্ড: যেসব কর্মকাণ্ডের বিদ্যমানতা শরয়ি বক্তব্য বা নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল। অন্য শব্দে, যেসব কর্মকাণ্ড শরিয়ত কর্তৃক মৌলিকভাবে অনুমোদিত (ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ বা বৈধ)। যেমন: 'সালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– যেকোনো প্রকারের দোয়া। তবে শরিয়ত কর্তৃক এর সাথে বিভিন্ন 'রুকন' (কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা) ও শর্ত (পবিত্রতা অর্জন, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি) যুক্ত হওয়ার পর তা একটি শরয়ি কর্ম বা ইবাদতের রূপ গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে রোজা, ব্যবসা-বাণিজ্য। উল্লেখ্য, বিশেষ অবস্থায় শরিয়ত সালাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। যেমন: সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সালাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা। (অনুবাদক)

[২] উল্লেখ্য, হানাফি ইমামগণ 'ফাসিদ' ও 'বাতিল' পরিভাষা দুটির মাঝে পার্থক্য করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে যেসব কাজ বা চুক্তি সর্বদিক থেকে অসিদ্ধ বা অকার্যকর নয়, সেসব কাজ বা চুক্তির জন্য তাঁরা 'ফাসিদ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন এবং তাঁরা সেগুলোর সিদ্ধতা কিছুটা মেনে নেন। আর যেসব কাজ বা চুক্তি সর্বদিক থেকে অসিদ্ধ বা অকার্যকর সেগুলোকে তাঁরা 'বাতিল' বলে অভিহিত করে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে এ জাতীয় কোনো পার্থক্য ধর্তব্য নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে যে কাজ বা চুক্তি ফাসিদ সেটা বাতিলও বটে। (অনুবাদক)

[৩] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৬৯; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, হা. ১৭১৮, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা (তাবেয়িন) এমন অনেক কাজ ও চুক্তিকে বাতিল বিবেচনা করেছেন, যার ওপর শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যেমন সুদ মিশ্রিত বেচাকেনা বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না এবং একটি অপরটি হতে কম-বেশি করবে না। অনুরূপভাবে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না এবং একটি অপরটি হতে কম-বেশি করো না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকি মুদ্রা বিক্রি করো না।"[১]

দ্বিতীয় অভিমত: কোনো শরয়ি কাজের ওপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট কাজটি 'ফাসিদ' (অসিদ্ধ) হবে বটে; তবে 'বাতিল' (অকার্যকর) হবে না। হানাফিগণ ও শাফেয়ি মাজহাবের মুহাক্কিক আলেমগণ এই মত পোষণ করেছেন।

তৃতীয় অভিমত: ইবাদত হলে সাধারণ নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট ইবাদত ফাসিদ (অসিদ্ধ) হবে। পক্ষান্তরে লেনদেনের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট লেনদেন ফাসিদ হবে না। আল্লামা শাওকানি (রহ.) তাঁর *'ইরশাদল ফুহুল'* শীর্ষক গ্রন্থে এই অভিমতটি হাসান বাসারি, আবু হামিদ আল-গাজালি, ফাখরুদ্দিন আর-রাজি, ইবনুল মালাহিমি, আহমদ ইবনু রাস্‌সাস প্রমুখের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।[২]

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা তদীয় সত্তা কিংবা কোনো অংশের বিচারে প্রয়োগ হলে, সংশ্লিষ্ট কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে অসিদ্ধ হবে। তাকে 'ফাসিদ' ও 'বাতিল' উভয়টি বলা চলবে।

তৃতীয় অবস্থা: কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা তদীয় স্থায়ী গুণের বিচারে প্রয়োগ হলে, সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কিরামের মত হলো– এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট কাজটি মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই অসিদ্ধ সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কাজটি 'ফাসিদ' হওয়া মানেই 'বাতিল' হওয়া।

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৭৪, হা. ২১৭৭; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১২০৮, হা. ১৫৮৪, আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] শাওকানি, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল, খ. ১, পৃ. ২৮০।

পক্ষান্তরে হানাফি ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো—এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট কাজটি গুণগতভাবে 'ফাসিদ' (অসিদ্ধ) হবে বটে; তবে মৌলিকভাবে কাজটির শরয়ি গ্রাহ্যতা বহাল থাকবে। ফলে গুণগত সমস্যা দূরীভূত হলে কাজটি পুনরায় বৈধ হয়ে যাবে।

চতুর্থ অবস্থা: কোনো কাজ মূলগতভাবে শরিয়তসম্মত; তবে এর সাথে বহিরাগত কোনো অস্থায়ী গুণের সংশ্লেষের ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট কাজটি 'ফাসিদ' কিংবা 'বাতিল; কোনোটিই হবে না; বরং তা সিদ্ধ হিসেবে বহাল থাকবে এবং তা আদায়ের ফলে উদ্দীষ্ট ফলাফলও অর্জিত হবে। তবে আদায়কারী গুনাহগার হবে।

মোদ্দকথা, "নাহ্‌য়ি (নিষেধাজ্ঞা)-এর অন্তর্হিত দাবি হলো অসিদ্ধতা কিংবা অকার্যকরতা"—এ মূলনীতি ইসলামি আইনবিশারদদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে তখনই আমলযোগ্য, যখন 'নাহয়ি' সাধারণ অর্থে প্রয়োগ হয় এবং সংশ্লিষ্ট কাজটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট কাজটি শরিয়তস্বীকৃত হলে, তখনও অধিকাংশ শাফেয়ি মতাবলম্বী স্কলার ও কিছু সংখ্যক 'মুতাকাল্লিম'-এর মতে এর বিধান একই হবে।

القاعدة السابعة عشرة: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ.

সপ্তদশ মূলনীতি

যখন কোনো বিষয়ে হালাল ও হারাম একত্রিত হয়, তখন হারামকে হালালের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিসংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। বস্তুতপক্ষে উসুল শাস্ত্রের 'আত্-তাআরুজ ওয়াত তারজিহ' (শরয়ি দলিলগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ও একটিকে অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান) শীর্ষক অধ্যায়ে ও হালাল-হারামের আলোচনায় এই মূলনীতির সংশ্লিষ্টতা ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হয়। দ্বীনি বিষয়ে 'ইহ্তিয়াত' বা সতর্কতা অবলম্বনের যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে–এই মূলনীতির মাঝে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

শরিয়তের অসংখ্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি মতে আমল করা জরুরি। কারণ, ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত বিধান পালনের তুলনায় নিষিদ্ধ বিধান পরিহারের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

নিম্নোল্লিখিত হাদিসসমূহ আলোচ্য মূলনীতির প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত:

১- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ أَوْ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়। অনেকেই সেগুলো জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১০৫-১০৬।

নিবৃত্ত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও মান-সম্মানকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে, সে হারামের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যেমন কোনো রাখাল, তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। তা অচিরেই সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো।"[১]

২- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"যা তোমার কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয়টি গ্রহণ করো"[২]

উপরিউক্ত হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো– কোনো বস্তুর বৈধতার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলে, তা বর্জন করতে হবে। বলা বাহুল্য, যেসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে 'ইহ্‌তিয়াত' বা দ্বীনি বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণের বিধান সাব্যস্ত হয়, আলোচ্য হাদিসটি তন্মধ্যে একটি।

৩- পবিত্র সুন্নাহ্‌র ভাণ্ডারে এমন অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যাতে দ্বীনি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা স্থান পেয়েছে। যেমন– আতিয়্যা আস-সাদি থেকে বর্ণিত। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِه حَذَراً لِمَا بِه الْبَأْسُ.

কোনো বান্দা মুত্তাকিদের (আল্লাহভীরু) পর্যায়ে ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচার নিমিত্তে (সতর্কতাস্বরূপ) অনুমোদিত বিষয় পরিত্যাগ করবে।[৩]

৪- এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য, যা ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে '*বাবু তাফসিরিল মুশাব্বহাত*' (সন্দেহজনক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ) শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেন। আদি ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি বিসমিল্লাহ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার ওপর আমি বিসমিল্লাহ পড়িনি এবং আমি জানি না, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন–

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩০, পৃ. ৩২৪, হা. ১৮৩৭৪; বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৫৩, হা. ২০৫১; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১২২১, হা. ১৫৯৯, নোমান ইবনু বশির (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৮, পৃ. ৩২৭, হা. ৫৭১১।

[৩] তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬৩৪, হা. ২৪৫১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১৪০৯, হা. ৪২১৫।

لَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ.

তা তুমি খাবে না। কারণ, তুমি তো তোমার কুকুরের ওপর বিসমিল্লাহ পড়েছো, অন্যটির ওপর তো আর পড়োনি।[১]

ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ.

"তোমরা কোনো পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পাহাড় থেকে পড়ে মরে যায়, তবে তা খাওয়া যাবে না। কারণ, ওপর থেকে পড়ার কারণে তার মৃত্যু হওয়ার আশংকা আছে। অনুরূপভাবে (তীর নিক্ষেপের পর) যদি সেটি পানিতে পড়ে মরে যায়, তখনও খাওয়া যাবে না। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে তার মৃত্যু হওয়ার আশংকা আছে।"

৫- ওসমান (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলো– এমন দুই বোনের সঙ্গে একত্রে সংগত হওয়ার বিধান কী হবে, যাদের মালিকানা ক্রয়সূত্রে অর্জিত হয়েছে? তিনি বললেন-

أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

"উভয়ের সাথে সংগত হওয়া কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অনুমোদিত, আবার অন্য আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর নিষেধসূচক বিধান মতে আমলই আমাদের নিকট অধিক শ্রেয়।"[২]

৬- আলোচ্য মূলনীতির সমর্থনে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো– ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেন– ইবনু আব্বাস, জারহাদ, ও মুহাম্মদ ইবনু জাহ্শ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, "উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।" আর আনাস (রা.) বলেন- "নবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উরু হতে কাপড় সরিয়েছিলেন।" ইমাম বুখারি (রহ.) এই বর্ণনা দুটির মন্তব্যে বলেন– "সনদের দিক থেকে আনাস (রা.)-এর হাদিস অধিক সহিহ আর জারহাদ (রা.)-এর হাদিস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উম্মতের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি।"[৩]

ইমাম বুখারির উপর্যুক্ত মন্তব্য থেকে এই বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, তিনি নিষেধসূচক হাদিসকে বৈধতাজ্ঞাপক হাদিসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এটি সতর্কতার

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৩, পৃ. ৫৪, হা. ২০৫৪।

[২] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯, হা. ৩৪।

[৩] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.১, পৃ. ৮৩।

দাবি এবং (উম্মতের মধ্যে) মতবিরোধ এড়ানোর কার্যকর মাধ্যম– যা তার বক্তব্য: "জারহাদ (রা.)-এর হাদিস অধিকতর সতর্কতামূলক" থেকে স্পষ্ট হয়।

এখানে ইমাম জারকাশি (রহ.)-এর একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়, যা তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ '*আল-মানসুর ফিল কাওয়া'ইদিল ফিকহিয়্যাহ*'-তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– উসুলবিদদের (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্রবিদ) বক্তব্য হলো– "কোনো বিষয়ে হালাল-হারামের বিধান একত্রিত হলে, হালাল বিধানকে বর্জন করা বাধ্যতামূলক"–এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন 'হালাল' দ্বারা 'মুবাহ' (বৈধ) কাজ উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি 'ওয়াজিব' (বাধ্যতামূলক) এবং নিষেধসূচক বিধান একত্রিত হয়, তবে ওয়াজিবের দিকটাকেই প্রাধান্য দেয়া হবে।[১]

এ কথার দলিল হিসেবে বুখারি শরিফের একটি দীর্ঘ হাদিসের এক অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। উসামা ইবনু জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন–যেখানে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমাপূজক ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সমাগম ছিলো। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলও ছিলো। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। তখন নবিজি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সালাম করলেন।[২]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) এ বিষয়ে কিছু হাদিস উল্লেখের পর বলেন-
"কখনো কোনো মাসআলায় পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি দিক একত্রিত হয়: এক দিক থেকে বৈধতা সাব্যস্ত হয় আবার অন্য দিক থেকে নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়। এর একটি কারণ হলো– হয়তো মাসআলাসংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী দুটি শরয়ি দলিল বিদ্যমান। যেমন- পরস্পরবিরোধী দুটি হাদিস অথবা পরস্পরবিরোধী দুটি কিয়াস (ইসলামি আইনবিশারদের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত)। আরেকটি কারণ হলো– হালাল-হারাম নির্ধারণের শরিয়ত নির্দেশিত যেসব নীতিমালা রয়েছে, মাসআলায় সেগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দেয়া। সুতরাং আল্লাহর ও বান্দার মধ্যবর্তী যে সম্পর্ক তা তখনই নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ থাকবে, যখন বান্দা এ ধরনের সন্দেহপূর্ণ স্থান এড়িয়ে চলবে এবং সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করবে। এভাবে তার মাঝে যখন দ্বীনদারি ও খোদাভীতি চলে আসবে, তখন ঈমানের আলো তার অন্তরের গভীরে স্থান করে নেবে।"[৩]

পরিশেষে বিশেষভাবে যে কথা উল্লেখ করতে হয়– দ্বীনি বিষয়ে আল্লাহভীতি ও 'ইহতিয়াত' (সাবধানতা)-এর কয়েকটি স্তর রয়েছে। আর কোনো বিষয়ে 'ইহতিয়াত' তখনই ওয়াজিব হয়, যখন তা হারামে জড়ানোর পথ খুলে দেয়। কারণ, 'ইহতিয়াত'-এর পরিধি এতোটা বিস্তৃত যে, তার অধীনে ইবাদত ও লেনদেনসংক্রান্ত

---

[১] জারকাশি, আল-মানসুর ফিল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৩২।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৮, পৃ. ৫৬, হা. ৬২৪৫।

[৩] দেহলভি, হুজ্জতুল্লাহিল বালিগা, খ. ২, পৃ. ১৫৬।

অসংখ্য মাসআলা প্রবেশ করে। আর সর্বাবস্থায় ও সর্বস্তরে 'ইহতিয়াত' অবলম্বন কেবল তার পক্ষেই সম্ভব, যে তাকওয়া ও খোদাভীরুতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে।

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১- ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য প্রাণীর মিলনে জন্মানো জন্তু খাওয়া বৈধ হবে না। যেমন- খচ্চর।

২- জবাইকৃত প্রাণী এবং মৃত প্রাণীর গোশত মিশ্রিত হলে, সে মিশ্রণ থেকে খাওয়া যাবে না।

৩- যদি কোনো জন্তু শিকার অথবা জবাই করার ক্ষেত্রে মুসলিমের সাথে অগ্নি-উপাসক শরিক হয়, উক্ত জন্তু খাওয়া যাবে না।

আধুনিক মাসআলাসমূহ:

১- যেসব যৌথ (Mutual) কোম্পানির মূল কার্যক্রম শরিয়তসম্মত; তবে তারা কখনো কখনো বিভিন্ন ব্যাংকে নির্দিষ্ট মুনাফার বিনিময়ে সম্পদ ডিপজিট রাখে– এ ধরনের কোম্পানিতে শেয়ার নেয়ার বিধান কী হবে– এ মর্মে সমসাময়িক ইসলামি স্কলারদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো– এসব কোম্পানিতে ব্যবসা কিংবা শেয়ারের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ করা বৈধ হবে না। কারণ, এখানে হালাল-হারাম মিশ্রণের ফলে হারাম প্রাধান্য পাবে।

২- স্বাস্থ্য হানিকর, নোংরা ও অপবিত্র বস্তু থেকে যে ওষুধ তৈরি হয়, তা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা বিশুদ্ধ মতের ভিত্তিতে বৈধ হবে না। এখানেও হারাম প্রাধান্য পাবে।

৩- বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে শূকরের আঁতুড়ি থেকে নিঃসৃত হেপারিনের মিশ্রণে যে ওষুধ তৈরি হয়– তা ব্যবহারের বিধানও অভিন্ন।

القاعدة الثامنة عشرة: إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا، اَلضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ، يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ.

অষ্টাদশ মূলনীতি

"যদি দুটি ক্ষতি একত্রিত হয়, তখন গুরুতর ক্ষতি দূরীকরণের স্বার্থে লঘুতর ক্ষতিতে জড়ানো যায়।

কম ক্ষতিকর বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে অধিক ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করা হয়।

দুটি অনিষ্টকর বস্তুর মাঝে তুলনামূলক কম অনিষ্টকর বস্তু গ্রহণ করা হবে।"[১]

(ইমাম আজম আবু হানিফার (রহ.)-এর মাজহারেব ওপর ভিত্তি করে মূলনীতিটি দাঁড় করানো হয়েছে।)

উপর্যুক্ত মূলনীতিত্রয় শব্দের দিক থেকে ভিন্ন হলেও মর্মের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। মূলত এই মূলনীতিসমূহ শরিয়তস্বীকৃত অন্যতম মৌলিক মূলনীতি: جلب المصالح ودرء المفاسد "জনকল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি দূরীকরণ"—থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

মূলনীতির শরয়ি ভিত্তি:

১. ইয়াহয়া ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা.)—কে বলতে শুনেছেন যে, একদা এক বেদুইন এসে মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে থাকলে, লোকজন চিৎকার করে তাকে বারণ করার চেষ্টা করলো। তা দেখে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "থামো, তাকে বারণ করো না।" তার পেশাব করা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বালতি পানি আনতে আদেশ করলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।[২]

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৯, ধারা: ২৮-২৯।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১ পৃ. ২৩৬, হা. ২৮৪।

২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক বেদুইন মসজিদে এসে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

دَعُوْهُ، وَلَا تُزْرِمُوْهُ

"থামো, তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দিওনা।"[১] আনাস (রা.) বলেন, লোকটির প্রস্রাব করা শেষ হলে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বালতি পানি আনিয়ে তার প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দিলেন।[২]

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবি (রহ.) বলেন- "হাদিসের মধ্যে যে বিষয়টির প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা হলো- অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে, কঠোর ও কষ্টদায়ক আচরণ পরিহার করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। কেননা, সে তো অবজ্ঞা কিংবা হঠকারিতার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করেনি।

হাদিসে আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো– দুটি অনিষ্টের মধ্যে তুলনামূলক লঘুটা গ্রহণ করে গুরুতরটিকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। কারণ, মূলত দুটি কল্যাণকে সামনে রেখেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে প্রস্রাব থেকে বারণ করতে সাহাবায়ে কিরামকে নিষেধ করেছিলেন:

প্রথমত: যদি লোকটিকে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব থেকে বারণ করা হতো, তাতে তার (শারীরিক) কষ্ট হতো। যেহেতু ইতোপূর্বেই মসজিদ অপবিত্র হয়ে গিয়েছে, তাই লোকটিকে কষ্টে ফেলার তুলনায় অপবিত্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে হালকা বা কম ক্ষতিকর বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: প্রস্রাবের ফলে মসজিদের একটি ক্ষুদ্র অংশ তো অপবিত্র হয়েই গিয়েছে। এখন যদি লোকটিকে প্রস্রাবের মাঝখানে বাধা দেয়া হয়, তাহলে তার শরীর ও কাপড়-চোপড় প্রস্রাবে একাকার হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে মসজিদের আরো বিভিন্ন স্থান অপবিত্র হওয়ার সমূহ আশংকা সৃষ্টি হয়ে যাবে।"[৩]

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ.৮, পৃ. ১২, হা. ৬০২৫।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১ পৃ. ২৩৬, হা. ২৮৪।

[৩] নাবাবি, আল-মিনহাজ শরহু সাহিহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, খ. ৩, পৃ. ১৯১।

القاعدة التاسعة عشرة: اَلإِقْرَارُ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ بِنَفْسِه لَا يُحْتَاجُ فِيْه إلى الْقَضَاءِ.

ঊনবিংশ মূলনীতি

স্বীকারোক্তি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল, যা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আলাদা কোনো রায়ের প্রয়োজন পড়ে না।

বিশিষ্ট ইসলামি আইনবিদদের দৃষ্টিতে 'ইকরার' কিংবা স্বীকারোক্তির সংজ্ঞা হলো– কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর অপর ব্যক্তির কোনো অধিকারপ্রাপ্তির বর্ণনা প্রদান করা।

শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তি এমন একটি দলিল যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কোনো ফায়সালার প্রয়োজন পড়ে না। কখনো 'ইকরার'-এর সাথে 'কাজা' বা ফায়সালার বিষয়টি জুড়ে দেয়া হলে তা রূপক অর্থে ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালার অর্থ এই দাঁড়াবে যে– স্বীকারোক্তির ফলে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা আদায়ে বিচারকের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হওয়া। কারণ, কেবল স্বীকারোক্তির ফলেই অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়, এতে বিচার প্রক্রিয়ার কোনো দখল থাকে না।[১]

অধিকন্তু, ইসলামি সকল আইনবিদ এক্ষেত্রে একমত যে, বিচারিক স্বীকারোক্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।[২] অর্থাৎ, এ পর্যায়ের স্বীকারোক্তি এতোই শক্তিশালী হয় যে– এর মাঝে প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলে, তা মতে আমল করা স্বীকারোক্তি দাতার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং বিচারকের জন্য তদানুযায়ী রায় প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায়। ফলে এ ধরনের স্বীকারোক্তির বিপরীতে বিচারক নিজস্ব বিবেচনাপ্রসূত কোনো রায় প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। কারণ, বিচারিক স্বীকারোক্তি এমন একটি দলিল, যা অনুযায়ী আমল করা স্বীকারোক্তিদাতার জন্য যেমন বাধ্যতামূলক, তদ্রূপ বিচারকের দায়িত্ব তা আমলে নিয়ে মামলা নিষ্পত্তি করা। এভাবেই অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রতিপক্ষের আইনি অবস্থা কিংবা আইনি বাস্তবতা সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে।[৩]

---

[১] মাবাদিউল কাজায়িশ শারয়ি ফি খামসিনা আমা; খ. ১, পৃ. ৩৪, ধারা: ৫৭।
[২] ড. আদম উহাইব, শরহু কানুনিল ইসবাত, পৃ. ১৪৫।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ' গ্রন্থে এসেছে: "ব্যক্তিকে তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক বাধ্য করা যাবে।" সুতরাং স্বীকারোক্তিদাতা কোনো বিষয় স্বীকার করে নিলেই তা আদায়ে তাকে বাধ্য করা হবে। এক্ষেত্রে বিচারকের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ চলবে না; বরং তার কর্তব্য হলো সেই স্বীকারোক্তি মোতাবেক তা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।[১]

সুতরাং 'ইকরার' বা স্বীকারোক্তি অর্থ হলো– কোনো হক (অধিকার) সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করা। আর স্বীকারোক্তি (স্বীকারোক্তিদাতার ওপর স্বীকারকৃত বিষয়) বাধ্যতামূলক করে দেয়। কেননা, স্বীকারোক্তি স্বীকারকৃত বিষয়ের বিদ্যমানতার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে মাইজ আসলামি (রা.) ও গামিদিয়া গোত্রের নারীর ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যভিচার সম্পর্কে তাদেরই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের ওপর রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যার শাস্তি) সাব্যস্ত করেছিলেন।

---

[১] আব্বাসি, আরিফ আস-সুওয়াইদি; শরহু মাজাল্লাতিল আহকামিল আদালিয়্যাহ।

القاعدة العشرون: إِذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلى الْبَدْلِ.

বিংশ মূলনীতি

যখন আসল-মূল বস্তু বাতিল হয়ে যায়, তখন তা বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত হয়[১]

আসল-মূল বস্তু (দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে কিংবা অন্য কোনো কারণে) যদি রহিত হয়ে যায় তখন এর বিকল্প গ্রহণ করা হয়।[২] এ কথা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে ফুটে ওঠে:

"শরিয়তের মূলনীতি হলো- শাখা এবং বিকল্পের আশ্রয় তখনই গ্রহণ করা হয়, যখন আসলের ব্যবহার দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যেমন- পবিত্রতা অর্জনে (পানির পরিবর্তে) মাটির ব্যবহার।"[৩] কারণ, সামর্থ্য থাকলে আসল-মূল বস্তু আদায় করা অপরিহার্য, বিকল্প পরিত্যাজ্য। তাইতো অপহরণকারীর হাতে অপহৃত বস্তু বিদ্যমান থাকলে, তা হুবহু ফিরিয়ে দেয়া অপরিহার্য। এতে আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থেই প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে (অপহৃত বস্তুর) বিনিময় বা বিকল্প আদায় করা হলে, তা রূপক অর্থেই প্রত্যর্পণ হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এ পদ্ধতি দায়মুক্তির মাধ্যম মাত্র এবং আবশ্যকীয় পদ্ধতির বিকল্প। আর বিকল্প তখনই গৃহিত হয়, যখন আসল-মূলবস্তু অবর্তমান বা দুঃষ্প্রাপ্য ঠেকে।

আলোচ্য মূলনীতি থেকে এই কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আসল (মূলবস্তু) শোধ করা আবশ্যক। কাজেই কোনো সম্পদ হুবহু বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হলে, মালিকের সম্মতি ছাড়া এর বিকল্প আদায় করা বৈধ হবে না। কারণ, আসলের বর্তমানে বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়।[৪]

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, ধারা: ৫৩।

[২] আহমদ আজ-জারকা, শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ২২৭।

[৩] ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিইন, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯।

[৪] আলি হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ৪৯।

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

- অপহরণকারীর হাতে অপহৃত বস্তু বিদ্যমান থাকলে, বিচারক তা হুবহু ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেবেন। এর বিকল্প হিসেবে অন্য বস্তু আদায়ের ফায়সালা দেয়া বৈধ হবে না। তবে অপহৃত বস্তু অপহরণকারীর হাতে হুবহু বিদ্যমান না থাকলে, বিষয়টি বিচারকের বিবেচনাধীন থাকবে। অনুরূপ পণ্য বাজারে সহজলভ্য থাকলে, অপহৃত বস্তুর সমপরিমাণ মাল আদায়ের নির্দেশ দেবেন। আর অনুরূপ পণ্য বাজারে সহজলভ্য না থাকলে, সমপরিমাণ মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেবেন।
- জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে জবাই হলো মূল বিধান। তবে জন্তু যদি পোষ না মানে কিংবা কূপে পতিত হয়, তখন বিকল্প বিধান গ্রহণ করা হবে। আর বিকল্প বিধান হলো- যেভাবে সম্ভব জন্তুর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত করা।
- মহর নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে, 'মহরে মিস্‌ল' বা সমজাতীয় মহর[১] দিয়ে ফায়সালা প্রদান করা হবে।[২]

---

[১] বিয়ের চুক্তিতে দেনমোহর ধার্য না হয়ে থাকলে উপযুক্ত পরিমাণ মহর নির্ধারণের জন্য স্ত্রীর পিতৃকুলের অন্যান্য মহিলার মোহরের পরিমাণ কতো ছিলো তা বিবেচনায় নিতে হয়। ঐ সময় স্ত্রীর সহদোরা ও বৈমাত্রেয় বোনদের এবং তাদের অবর্তমানে তার ফুফুদেও মোহরের সমপরিমাণ মোহর নির্ধারিত হবে। (অনুবাদক)

[২] আতাসি, শরহুল মাজাল্লা, খ. ১, পৃ. ১২৯।

القاعدة الحادية والعشرون: اَلْإِنْفَاقُ بِأَمْرِ الْقَاضِيْ كَالْإِنْفَاقِ بِأَمْرِ الْأَبِ أَوْ: اَلْإِنْفَاقُ بِأَمْرِ الْقَاضِيْ كَالْإِنْفَاقِ بِأَمْرِ الْمَالِكِ.

একবিংশ মূলনীতি

বিচারকের নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণ করা পিতার নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণের সমতুল্য অথবা বিচারকের নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণ করা মালিকের নির্দেশে ব্যয়ভার গ্রহণের মতো

বিচারক শিশুদের ব্যয়ভারের দায়িত্ব পিতার কাঁধে অর্পণের পর পিতা যদি তাদের জন্য ব্যয় না করে, ফলে বিচারকের নির্দেশে মাতা ঋণ নিয়ে তাদের খোরপোষের জন্য ব্যয় করলে; যা কিছু ব্যয় হয়েছে সবই মাতা পিতার কাছ থেকে ফেরত পাবে। কারণ, বিচারকের নির্দেশে সন্তানদের জন্য কোনো কিছু ব্যয় করা পিতার নির্দেশে ব্যয় করার মতো।[১]

এসব মূলনীতিতে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, এর অনির্বচনীয় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কারণ, এর মাঝে রয়েছে এমন মূলনীতি, বিচারকার্যে কোনো কিছু সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যার অসামান্য ভূমিকা পরিদৃষ্ট হয়।

যেমন– কোনো ব্যক্তি একটি (হারানো) বকরী পেলো, অতঃপর বিচারকের আদেশক্রমে স্বীয় সম্পদ হতে এর আহারের ব্যয়ভার বহন করলো। তারপর সেই বকরী মরে গেলো। এমতাবস্থায় বকরীর মালিক উপস্থিত হলে, উক্ত ব্যক্তি যা কিছু ব্যয় করেছে সব-ই বকরীর মালিকের নিকট থেকে ফেরত পাবে। কারণ, বিচারকের নির্দেশে ব্যয় করা মালিকের নির্দেশে ব্যয় করার সমতুল্য।[২]

---

[১] আস-সদরুশ শহিদ, শরহু আদাবিল কাজি, খ. ৪, পৃ. ২৯৮।

[২] হামজাভি, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, পৃ. ২৮২।

القاعدة الثانية والعشرون: اَلْإِحْسَانُ إلى الْأَبْرَارِ أَوْلى مِنَ الْإِحْسَانِ إلى الْفُجَّارِ

দ্বাবিংশ মূলনীতি
পাপিষ্ঠদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের তুলনায় পুণ্যবানদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা অধিক শ্রেয়

মূলনীতির শরয়ি দলিল:

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.

"তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু লোক ছাড়া যেনো অন্য কেউ না খায়।"[১]

পুণ্যবান-পাপাচারী নির্বিশেষে উভয়কে দান-সদকা করে অনুগ্রহ করা বৈধ হলেও এক্ষেত্রে মুসলিম কাফিরের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, পুণ্যবান মুসলিম পাপিষ্ঠের তুলনায় অধিক শ্রেয়।

যারা বিদআত করে তাদেরকে জাকাত প্রদানের ব্যাপারে ইবনু তায়মিয়াকে প্রশ্ন করা হলে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন–

"জাকাতদাতার উচিত হলো- স্বীয় জাকাত প্রদানের জন্য এমন কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে খোঁজা, যে শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি যত্নশীল। এমন কোনো পাপিষ্ঠ লোককে জাকাত দেয়া যাবে না, যাকে জাকাত দেয়া হলে তার পাপাচারের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।[২]

---

[১] তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬০০, হা. ২৩৯৫; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ২৫৯, হা. ৪৮৩২।

[২] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৫, পৃ. ৮৭।

القاعدة الثالثة والعشرون: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَاسْتَوَتَا، تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَاكْتُفِيَ فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ.

ত্রয়োবিংশ মূলনীতি

যখন একই ধরনের দুটি ইবাদত একত্রিত হয় এবং উভয়টি সমপর্যায়ের হয়, তখন একটির কর্ম অপরটির মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং একটির কর্ম অপরটির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়

এটি দু'ভাবে হতে পারে:

প্রথমত: এক কর্ম দিয়ে দুটি ইবাদত আদায় হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী শর্ত হলো- কর্মসম্পাদনের সময় উভয় ইবাদতের নিয়ত করা। যেমন–

(ক) কোনো ব্যক্তির ওজু ভেঙ্গে যাওয়ার পর আবার গোসল ফরজ হলে, তখন তার জন্য "বড়ো পবিত্রতা" তথা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট হবে।[২]

(খ) কোনো ব্যক্তি একসাথে হজ-ওমরা পালনের নিয়ত করলে, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তার জন্য একবার 'তাওয়াফ' ও 'সায়ি'[৩] করা যথেষ্ট হবে।[৪]

দ্বিতীয়ত: দুই ইবাদতের একটি আদায়ের নিয়ত করা এবং অপরটির বিধান রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন–

(ক) যদি কোনো ব্যক্তি ফরজের জামাত দাঁড়ানোর পর মসজিদে আসে, ফলে সে জামাতে শরিক হলে তার ওপর থেকে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ"[৫] রহিত হয়ে যাবে।

(খ) ওমরা পালনকারী মক্কায় প্রবেশ করলে, সে ওমরার তাওয়াফ দিয়ে কাজ শুরু করবে; তার "তাওয়াফে কুদুম"[৬] করা লাগবে না।

---

[১] ইবনু রজব, আল-কাওয়াইদ ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ২৩-২৪।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৩] পরিভাষায় 'সায়ি' বলতে হজের সেই ওয়াজিব আমলকে বুঝায় যাতে হেরেম জিয়ারতকারী 'সাফা' ও 'মারওয়া' নামক নামক দুটি পাহাড়ের মাঝে দৌড়ায়। (অনুবাদক)

[৪] ইবনু রজব, আল-কাওয়াইদ ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ২৩।

[৫] মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বেই মসজিদের সম্মানস্বরূপ আদায়কৃত দু' রাকাত সালাত। (অনুবাদক)

[৬] মক্কা প্রবেশের পর সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলে। এ তাওয়াফ শুধু মিকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্য ওয়াজিব। (অনুবাদক)

القاعدة الرابعة والعشرون: أَحْكَامُ الْوَسَائِلِ كَأَحْكَامِ الْمَقَاصِدِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِه فَهُوَ وَاجِبٌ.

চতুর্বিংশ মূলনীতি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে বিধান, উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রয়োগ হবে। যে বিষয়ের অবর্তমানে কোনো অপরিহার্য বিধান পূর্ণ হয়না, সেই বিষয়ের উপস্থিতিও অপরিহার্য পরিগণিত হবে[1]

উপর্যুক্ত মূলনীতিটি পূর্বালোচিত মূলনীতি "উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কার্যের বিচার হয়"–এর সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলনীতির সারমর্ম হলো- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ের যে বিধান তা সংশ্লিষ্ট মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতএব, শরিয়তের দৃষ্টিতে যে উদ্দেশ্য (কাজ) ওয়াজিব, এর উপায়-উপকরণও ওয়াজিবের পর্যায়ে হবে। আর যে উদ্দেশ্য (কাজ) হারাম, এর মাধ্যম ও উপায়-উপকরণও হারামের পর্যায়ে হবে। অন্য শব্দে বললে- প্রত্যেক মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে সেই বিধান-ই প্রযোজ্য, যে বিধান সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য শরয়িভাবে নির্ধারিত। উদাহরণত: ফরজ নামাজ, রোজা, হজ, ওমরা, অপরিহার্য হকসমূহ আদায় করা (যেমন– আল্লাহর হক, পিতামাতার হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, স্ত্রীর হক) ইত্যাদি। আর যেসব বিষয় ব্যতিরেকে উপর্যুক্ত বিধানসমূহ পূর্ণ হবে না, সেসব বিষয়ও ওয়াজিব বলে বিবেচিত হবে। যেমন- নামাজের স্থানে হেঁটে যাওয়া, নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে নফল নামাজ, সদকা ইত্যাদি ইবাদত যেহেতু সুন্নত, তাই এগুলোর উপায়-উপকরণও সুন্নত পর্যায়ের হবে। যেমন- এগুলো আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ পাড়ি দেয়া।

অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহও প্রণিধানযোগ্য। যেমন- শিরক, মানবহত্যা, ব্যভিচার, শরাব পান, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি। এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে- এমন প্রত্যেকটি মাধ্যম ও পথ হারাম হবে। এক্ষেত্রে ঐসব কর্মকৌশলও অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলো সুদ কিংবা অন্য যেকোনো হারাম বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে।

---

[1] আলায়ি, আল-মাজমুউল মুজহাব, পৃ. ৫৭০।

একইভাবে যে কাজ মাকরুহ (অশোভনীয়), এর মাধ্যম ও উপায়-উপকরণও মাকরুহ সাব্যস্ত হবে।

শরিয়তের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য হলো অশ্লীলতা-পঙ্কিলতা থেকে মানুষের মান-সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমান চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন ধারাবাহিক অনুষ্ঠানসমূহে বিনোদন ও অভিনয়ের নামে নারীর অবাধ বিচরণ ও উদাম সৌন্দর্য প্রদর্শনের ফলে যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

باء/বা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৪টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

প্রথম মূলনীতি

অতীতে যা যে অবস্থায় ছিলো, পরবর্তীকালেও তা সে অবস্থায় বলবৎ থাকা-ই শরিয়তের মূলনীতি[১]

(ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব মতে এর উৎসমূল)

এ মূলনীতিটি শরিয়তের পরিভাষায় 'আল ইসতিসহাব' (Presumption of Continuity) নামে সুবিদিত। এর অর্থ : ''অতীতে যে কাজটি সাব্যস্ত হয়েছিলো, তা বর্তমানেও বহাল রাখা এবং পূর্বে যা স্বীকৃত ছিলো না তা বর্তমানেও অস্বীকৃত অবস্থায় বহাল রাখা। যে যাবত তা পরিবর্তন করার মতো যথার্থ কোনো দলিল খুঁজে পওয়া না যায় ততক্ষণ পূর্বের বিধানটিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হবে না।'' আর 'ইসতিসহাব' শীর্ষক এ মূলনীতিটি মূলত শরিয়তের বিরোধপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত। অনেক উসুলবিদ (ইসলামি আইনজ্ঞ) এবং ফিকহবিদ কিয়াসের (Analogical Reasoning) দুঃসাধ্যতার সময় এ মূলনীতি গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। মুজতাহিদের গবেষণায় যদি দুটি সুন্নাহ্র মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, অতঃপর বিরোধ নিরসনে কিয়াস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের কোনোটিই তিনি না পান; সেক্ষেত্রে বিধান নির্ণয়ের জন্য তিনি এ মূলনীতি প্রয়োগ করতে পারবেন। উদাহরণত, গাধার উচ্ছিষ্ট পানির মাসআলাতে শরিয়তের দলিলসমূহ পরস্পরবিরোধী। ইসলামি আইনবিদগণ এ ধরনের পানি দ্বারা কোনো নাপাকি পাক হবে না এবং কোনো পবিত্র জিনিস (পূর্বাবস্থার ওপর ভিত্তি করে) অপবিত্র হবে না মর্মে মতামত দিয়েছেন।

তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন, "গাধা ও খচ্চরের ঝুটা পানি সন্দেহযুক্ত। যদি এ পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি পাওয়া না যায়, তাহলে তা দ্বারা ওজু করবে এবং তায়াম্মুমও করবে।"[২]

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৬, ধারা. ৫।

[২] আল-কুদুরি, আল-মুখতাসার, পৃ.১৪।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ জানায় যে, নামাজের মধ্যে তার কিছু হয়ে যায় বলে মনে হয়ে থাকে। তাই তার (অন্তরে নামাজ শুদ্ধ হয়েছে কিনা) সন্দেহের উদ্রেক হয়। নবিজি (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন,

لاَ يَنْفَتِلْ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"সে যেনো (নামাজ থেকে) ফিরে না যায়, যে যাবত না কোনো শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায়।"[১]

এটি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ একটি সুনিশ্চিত বিষয়কে তার সমপর্যায়ের আরেকটি সুনিশ্চিত বিষয় ছাড়া পরিত্যাগ করতে পারবে না। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا.

"নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার ওপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, (মধ্যপন্থার) কাছাকাছি থাকো এবং আশান্বিত থাকো।"[২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।" [সুরা আল-হজ, আয়াত: ৭৮]

---

[১] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, হা.১৩৭; মুসলিম, আস-সহিহ, হা.৩৬১
[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, হা.৩৯; মুসলিম, আস-সহিহ, হা.২৮১৬

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

(১) যদি কারো ওজু করার ব্যাপারে নিশ্চিত মনে থাকে, কিন্তু ওজু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তাহলে সে পবিত্র-ই থাকবে।

(২) যদি কেউ রাতের শেষাংশে আহার করে এবং ফজর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলে, তার রোজা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, আসল বা মৌলিক অবস্থা হলো রাত অবশিষ্ট থাকা। তবে এক্ষেত্রে উত্তম হলো, সন্দেহাবস্থায় আহার না করা।

(৩) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত শেষ হয়নি দাবি করলে, তাকে সত্যায়ন করা হবে। সে নাফকা তথা খরচপাতি পাবে। কারণ, এক্ষেত্রে আসল-মূল অবস্থা হলো, ইদ্দত বাকি থাকা।

القاعدة الثانية: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীপক্ষের দায়িত্ব, আর কসম করবে বিবাদী[১] অথবা অস্বীকারকারী

এ মূলনীতিটি শরিয়তের সেসব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির অন্যতম, যার ওপর বিচারকার্য নির্ভরশীল। এ মূলনীতি না থাকলে বিচারকদের সীমাহীন অসুবিধের মধ্যে পড়তে হতো। বিবাদ মীমাংসা করা তাদের জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে যেতো। মানুষে মানুষে নিপীড়ন চরমে পৌঁছতো। এটিতো জানা কথা যে, বিচারকার্যে বিচারকের জন্য বিবাদমান দু'পক্ষের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের আসল রহস্যটা জানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণত, বাদী দাবি করলো যে, বিবাদী তার সম্পদ হরণ করেছে। (আর সম্পদের প্রকৃতি পরিবর্তনযোগ্য)। অপরদিকে বিবাদী বাদীর দাবি অস্বীকার করলো। এমতবাস্থায় সবার আগে সত্য ঘটনা কী তা উদঘাটন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আসলেই সেখানে ছিনতাইয়ের কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি ঘটেনি? এটি জানার জন্য বিচারক (বাদী থেকে) সাক্ষ্য গ্রহণ এবং (বিবাদীর কাছে) শপথ তলবের সামগ্রিক নিয়মের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন।[২] কারণ, এখানে ঘটনার সময় উপস্থিত ব্যক্তির তথ্য প্রদান অথবা সম্পদের মালিকের নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্য ছাড়া প্রকৃত ঘটনা জানা অসম্ভব। এ মূলনীতিটি সরাসরি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর হাদিস, এবং এ হাদিসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতর হাদিস হিসেবে বিবেচিত। এটি অধিকতর শক্তিশালী প্রামাণ্য দলিল এবং ব্যাপক কল্যাণকর হাদিসও বটে। এ মূলনীতির ব্যাপারে কথিত আছে, এটিই হলো সেই সর্বোত্তম বিচারশক্তি (ফাসলুল খিতাব), যা হজরত দাউদ (আ.)-কে দেয়া হয়েছিলো।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, ধারা. ২৮, ২৯

[২] শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ.২, পৃ.২৫৮

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

উপরিউক্ত মূলনীতিটি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন–

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"যদি লোকের দাবি অনুসারে তাদের দিয়ে দেয়া হতো, তবে কোনো কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জান-মাল দাবি করে বসতো। তাই বিবাদীর জন্য শপথ নেয়ার বিধান রয়েছে।"[১]

বাদী মূলত বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কিছু দাবি করে এবং অতিরিক্ত কিছুকে নিজের সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে বিবাদীর হাতে আসল জিনিসটি থাকে এবং বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনায় সে জিনিসটির ধারক হয়।

এ মূলনীতি শরিয়তবদ্ধকরণের হেতু বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ" যদি লোকের দাবি মেনে তাদেরকে দেয়া হতো...তাহলে..." অর্থাৎ: পাস্পরিক অত্যাচারের দুয়ার অবারিত হয়ে যেতো। তাই বাদীকে অবশ্যই যথার্থ প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর প্রমাণ হিসেবে যে সাক্ষী উপস্থিত করবে, তাকে অবশ্যই সৎ ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[২]

হাদিসে আরো একটি কারণ বলা হয়েছে, বাদীর দাবির দিকটি দুর্বল। কারণ, সে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত জিনিস দাবি করছে। তাই তার দুর্বল দিকটিকে সবল করার জন্য তাকে অবশ্যই শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আর শক্তিশালী প্রমাণ হলো সাক্ষ্য। বিবাদীর দিকটি সবল। কারণ, ব্যক্তির দায়মুক্ত থাকাই হলো মৌলিক অবস্থা। তাই সে দুর্বল প্রমাণ তথা কসম করলে-ই হয়ে যাবে। উপরোল্লিখিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসও আলোচ্য মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, ইসলামি শরিয়ত মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে খুবই একাগ্র এবং আন্তরিক। মুসলিম ব্যক্তি যাবতীয় অভিযোগ ও দোষ থেকে মুক্ত থাকবে এটাই মূলনীতি। তবে হ্যাঁ, যথার্থ প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে।

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, মুসনাদ, খ.৫, পৃ.২৬৬, হা.৩১৮৮; বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.৬, পৃ.৩৫ হা.৪৫৫২; মুসলিম, আস-সহিহ, খ.৩, পৃ.১৩৩৬, হা.১৭১১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ.৩, পৃ.৭৭৮, হা.২৩২১; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.৩, পৃ.৩১১, হা.৩৬১৯; তিরমিজি, আস-সুনান, খ.৩, পৃ.১৯, হা.১৩৪২; নাসায়ি, আস-সুনান, খ.৮, পৃ.২৪৮, হা.৫৪২৫

[২] শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ.২, পৃ.২৫৮।

القاعدة الثالثة: الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّة.

তৃতীয় মূলনীতি
দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা-ই মৌলিক বিধান[১]

মূলনীতির ফিকহি অর্থ: ''ফিকহের (ইসলামি আইন) একটি সাধারণ নিয়ম হলো, যেকোনো ধরনের কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব আবশ্যক কিংবা অপরিহার্য হওয়া থেকে মানুষ মুক্ত থাকা। আর তার ওপর দায়-দায়িত্ব আরোপিত হওয়া হলো নিয়মের বিপরীত বিধান।''[২] এ কারণে কারো ওপর দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে কেবল একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না; যতক্ষণ না সাথে আরেকজন সাক্ষী অথবা বাদীর শপথ থাকে। এজন্য শুধুমাত্র শপথ সহকারে বিবাদীর বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। কারণ, (নিয়ম অনুসারে) তার কাছে বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে বা সে মৌলিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৩]

আবুল হাসান আল-কারখি (রহ.) এর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন, "মূলনীতি হলো, যার কাছে বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে তার কথা-ই গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত দাবি করবে তার জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক।"[৪]

মূলনীতিটি সকল ইসলামি আইনবিদের কাছে গ্রহণযোগ্য। এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আইনবিদগণ কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির সাহায্যে জোরালো প্রমাণ পেশ করেছেন।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

উপর্যুক্ত মূলনীতিটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর হাদিস থেকে নিঃসৃত। নবিজি বলেছেন–

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীপক্ষের দায়িত্ব, আর শপথ বিবাদীর ওপরই বর্তাবে।"[৫] পূর্বোক্ত মূলনীতির (দ্বিতীয় মূলনীতি) অধীনে বর্ণিত হাদিসগুলো-ই এ মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র।

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৭, ধারা. ৮।

২ মুহাম্মদ সিদকি আলে বারনু, আল-ওয়াজিয ফি ইদাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়া, পৃ.১৭৯।

৩ সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.৫৩; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.৫৯।

৪ কারখি, আল-উসুল, পৃ.৩০৮, মূলনীতি-৩।

৫ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, ধারা. ২৮, ২৯।

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

(১) ক্রেতা কোনো জিনিস ক্রয় করলে ক্রয়কৃত জিনিসের উপকার ভোগ করার অধিকার যেমন লাভ করে, তেমনি ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য আদায়ে বাধ্য হয়ে ক্ষতিও বহন করতে হয়।

(২) কেউ যদি অপরজনের কাছে ঋণের দাবি করে আর বিবাদী সে দাবি অস্বীকার করে, তাহলে শপথ সহকারে বিবাদীর কথা-ই ধর্তব্য হবে। কারণ, মূলনীতি হলো দায়মুক্ত থাকা। হ্যাঁ, বাদী যদি প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করতে পারে যে আসলেই সে ঋণ পায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

(৩) ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুর মূল্য নিয়ে যদি দু'পক্ষের মাঝে বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে ক্ষয়কারীর বক্তব্য-ই গৃহীত হবে। (ক্ষয়কারী সে ধারকারী হতে পারে কিংবা অন্যায়ভাবে হরণকারীও হতে পারে)। কারণ, সে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অংশ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত দাবি করছে। আর মূলনীতি হলো, মানুষ দায়মুক্ত থাকা। সুতরাং, শপথ সহকারে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে।

القاعدة الرابعة: الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ.

চতুর্থ মূলনীতি

(বিচারালয়ে উপস্থাপিত) প্রমাণ সংক্রমণশীল দলিল এবং স্বীকারোক্তি সীমাবদ্ধ দলিল[১]

স্বীকারোক্তি এমন দলিল যা কেবল স্বীকারোক্তিকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় না।

পক্ষান্তরে প্রমাণ (Evidence/Proof) হলো সংক্রমণশীল দলিল। অর্থাৎ: যার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয় তার উপরেও এর প্রভাব পড়ে এবং তাকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। কারণ, প্রমাণ বিচারকের সিদ্ধান্ত ব্যতীত দলিল হিসেবে গৃহীত হয় না। আর বিচারকের ক্ষমতা সামগ্রিক। তাই তিনি তার সিদ্ধান্ত সকলের জন্য বাস্তবায়ন করার অধিকার রাখেন।

এক্ষেত্রে প্রমাণ হলো একটি প্রকাশ্য দলিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾

"তিনি বললেন, হে আমার জাতি, তোমরা কী মনে করো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থাকি?" [সুরা হুদ, আয়াত: ৬৩, ৮৮]

পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি স্বীকারকারীর ধারণার ওপর ভিত্তিশীল দলিল। আর স্বীকারকারীর ধারণা আরেকজনের জন্য দলিল হতে পারে না।[২]

ইমাম কারখি ঠিক এ কথাটিই তুলে ধরেছেন তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, "মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আমল করা হবে। কিন্তু অন্যের হক বাতিল করা এবং অন্যের ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তিকে সত্যায়ন করা হবে না।"[৩] আবার শরিয়তের পরিভাষায়, দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় চোখে দেখা প্রমাণিত বিষয়ের মতো-ই। আর চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। অপরদিকে স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর কর্তৃত্ব নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরের ওপর সে কর্তৃত্ব ফলাতে পারে

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ.৬৮, ধারা. ৭৮; আল-ওয়াজিয, পৃ.২০৪।

[২] আহমদ আজ-জারকা, শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ.৩২৭।

[৩] কারখি, আল-উসুল, পৃ. ১১২০।

না। তাই এ দলিল (স্বীকারোক্তি) শক্তিশালী হলেও কেবল স্বীকারোক্তিদাতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[১]

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১) যদি কোনো ব্যক্তি এ মর্মে স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে এবং অন্য একজন ব্যক্তির যৌথভাবে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট ঋণ আছে, তাহলে তার এ স্বীকরোক্তি শুধুমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য হবে। তার অংশীদারের জন্য প্রযোজ্য হবে না। হ্যাঁ, তার অংশীদার যদি নিজে স্বীকার করে নেয় অথবা প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন অংশীদারের ওপর তার স্বীকারোক্তি আমলে নেয়া হবে।

২) জমিদার যদি স্বীকারোক্তি দেয় যে, ভাড়ায় প্রদত্ত জায়গার মালিক সে নয়; আরেকজন। তবে তার এ স্বীকারোক্তি তার নিজের বেলায় ধর্তব্য হবে। ভাড়াটিয়ার জন্য ধর্তব্য হবে না। তাই ইজারা রহিত হবে না। ইজারার নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে জায়গার মালিকানা মূল মালিকের জন্য ফায়সালা করা হবে।

[১] দেখুন : আতাসি, শরহুল মাজাল্লা, খ.১, পৃ.২২২; আল-মাহাসিনী, শরহুল মাজাল্লা, খ.১, পৃ.৯৯।

তৃতীয় অধ্যায়

تاء/তা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ১০টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلتَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

প্রথম মূলনীতি

প্রজাদের ওপর হস্তক্ষেপ তাদের কল্যাণের মধ্যেই সীমিত থাকবে[১]

এ মূলনীতিটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাবের ওপর ভিত্তি করে উদ্ধৃত। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) থেকেও এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, "প্রজাদের কাছে ইমামের অবস্থান হলো ইয়াতিমের জন্য 'অলি' বা অভিভাবকের অবস্থানের মতো।"

এটি ইসলামের শরয়ি নীতি এবং ইসলমি রাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পৃক্ত একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ মূলনীতি বিচারকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একটি নির্ধারিত সীমা ও মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর যেকোনো দায়িত্বশীলের দায়িত্বের একটি পরিসীমা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকি (রহ.) মূলনীতিটিকে তাঁর ভাষ্যে এভাবে চিত্রায়ন করেছেন, "অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপকারীকে অবশ্যই কল্যাণের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে হস্তক্ষেপ করতে হবে।"[২] কারণ, বিচরাকদের (প্রশাসক) নিয়োগ দিয়ে থাকেন খলিফা। আর খলিফা ব্যতীত (রাজ্যের) অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কাজ করার বিষয়ে স্বাধীন নন। বরং ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা, জুলুম-নিপীড়ন দমন, মানবাধিকার ও চরিত্র সংরক্ষণ, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, সমাজকে অরাজকতামুক্ত রাখাসহ উম্মাহর কল্যাণময় যাবতীয় কাজ শ্রেষ্ঠতর উপায়ে পরিচালনার প্রতিনিধি হলেন প্রশাসকগণ।

তাঁদের দায়িত্ব হলো উত্তম উপায়ে উম্মাহর জন্য ব্যাপক মঙ্গলজনক কাজ আঞ্জাম দেয়া। এটাকেই 'জনস্বার্থ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ.২২, ধারা. ৫৮।

[২] সুবকি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, খ.১, পৃ.৩১০; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.১৪৫।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

(১) আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনেতা) একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীগৃহের কর্ত্রী, তাকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".

(২) মাকিল ইবনু ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ তাআলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[২]

প্রথম হাদিসে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতন ও তৎপর হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এ কথা সুবিদিত যে, দায়িত্ব পালন করতে হয় কল্যাণের প্রতি খেয়াল রেখে এবং আমানতদারিতার সাথে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। এটিই দ্বিতীয় হাদিসের মর্মার্থ। কারণ, শাসক 'শারে' বা বিধানদাতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে প্রজাদের কল্যাণের দেখভালে আদিষ্ট। এর ব্যত্যয় ঘটলে তাকে ভয়ানক শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

---

[১] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.২, পৃ.৫ হা.৮৯৩।

[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.৯, পৃ.৬৪ হা.৭১৫০।

(৩) সাঈদ ইবনু মানসুর (রহ.) কর্তৃক তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বর্ণনাটিও এ মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ، رضي الله عنه: إني أنزلتُ نفسي من مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أيسرت رَدَدْتُه، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ.

আবুল আহওয়াস আবু ইসহাক থেকে, তিনি বারা ইবনু আজিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইরশাদ করেছেন–

"আল্লাহর সম্পদে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আমি ইয়াতিমের অভিভাবকের স্থানে নিজেকে রাখি। প্রয়োজন দেখা দিলে আমি সেখান থেকে সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করি। পরবর্তীতে সচ্ছল হলে তা আবার ফিরিয়ে দিই। আর অভাব না থাকলে আমি সে সম্পদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখি।"[১]

(৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বাণীটিও উক্ত মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র। তিনি বলেছেন,

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ وَيَنْصَحْ لَهُمْ كَنُصْحِه و جهْدِه لِنَفْسِه إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

"কোনো আমির (রাষ্ট্রনায়ক) যার ওপর মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়, সে যদি তাদের কল্যাণ সাধনে নিজের কল্যাণ সাধনের মতো চেষ্টা না করে বা নিজের মঙ্গল কামনার ন্যায় তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।"[২]

---

[১] সাঈদ ইবনু মানসুর, সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, খ.১, পৃ.৯৩, হা.৭৪৪।

[২] মুসলিম, আস সহিহ, ঈমান অধ্যায়, অধীনস্থদের সঙ্গে ধোঁকাবাজ অভিভাবক জাহান্নামের উপযোগী পরিচ্ছেদ।

মূলনীতির প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১- হকদারদের মাঝে জাকাত বন্টন করার সময় একই ধরনের অভাবগ্রস্তদের সাথে তারতম্য করা হারাম হবে।

২- মাওয়ারদি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, ''দায়িত্বশীলদের জন্য কোনো ফাসিক (পাপিষ্ঠ) ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ দেয়া জায়েজ হবে না। কারণ, ফাসিকের ইমামতিতে নামাজ শুদ্ধ হলেও মাকরূহ থেকে যায়। আর দায়িত্বশীল ব্যক্তি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জিম্মাদার। মাকরূহ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মাঝে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই।''[১]

৩- প্রশাসক কিংবা বিচারক বা তত্ত্বাবধায়ক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি অথবা নাবালকের সম্পদ দান করে দেয়া বৈধ হবে না। কেননা, ওয়াকফ সম্পত্তি বা নাবালকের সম্পদে হস্তক্ষেপ কল্যাণের স্বার্থে হতে হবে।[২]

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.১২১।

[২] মুহাম্মদ সিদকি আলে বারনু, আল-ওয়াজিয ফি ইদাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়া, পৃ.৩৫০।

القاعدة الثانية: تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَايَجُوْزُ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

প্রয়োজনের সময়ে বিবরণ প্রকাশ না করে বিলম্ব করা বৈধ নয়[১]

এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি। ফিক্‌হ (আইনশাস্ত্র) ও উসুল (নীতিমালাশাস্ত্র)-এর বিশেষজ্ঞগণ এ মূলনীতিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'শরহুশ সিয়ারিল কাবির' গ্রন্থে এ মূলনীতির আলোচনা এসেছে। এ মূলনীতির সত্যতার বিষয়ে সকল ইসলামি স্কলার একমত পোষণ করেছেন। মূলনীতিটির ধরন হলো, কেউ বললো, "তোমরা আগামীকাল নামাজ পড়বে।" কিন্তু আগামীকাল নামাজ কীভাবে পড়বে সে বিষয়ে তাদেরকে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেয়নি। এ ধরনের আদেশ অসাধ্য কাজের ভার কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার নামান্তর।

যদি 'মুজমাল' (সংক্ষিপ্ত অর্থবোধক) অথবা 'আম' (ব্যাপক অর্থবোধক) কিংবা মাজায (রূপকার্থক) বা মুশতারাক (দ্ব্যর্থক) বা দুই বিষয়ের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ততা বোঝায় এমন 'ফেল' (ক্রিয়া) অথবা মুতলাক (সাধারণ অর্থবোধক) কোনো শব্দ যদি কোথাও উল্লেখ হয়, এর প্রত্যেকটি শব্দই বিবরণের মুখাপেক্ষী। তাই এগুলোর বিবরণ প্রকাশে বিলম্ব করা যাবে না। কারণ, বিবরণ প্রকাশকে কার্য সম্পাদনের সময় থেকে বিলম্ব করা মানে কষ্ট চাপিয়ে দেয়া। এরূপ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না। অথচ (আদেশ প্রাপ্তির পরপরই) তাৎক্ষণিক তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা উদ্দেশ্য হয়। তাই ওলামায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবশ্যিক প্রয়োজনের সময় থেকে বিবরণ প্রকাশকে বিলম্ব করা বৈধ হবে না। কারণ, দায়িত্বের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না পেলে দায়িত্ব আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এটি 'তাকলিফ বিমা লা ইউত্বাক' বা অসাধ্য বস্তুর দায়িত্বভার ঘাড়ে তুলে দেয়ার মতো হয়। যা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ।

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ.৪, পৃ.৫৯।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (গণিমতের সম্পদ) আত্মসাৎকারী প্রত্যেককে (মালপত্র পুড়িয়ে দেয়ার) হুমকি দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে কারো সফরের আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেননি। তাই (আত্মসাৎকারীর) সফরের মালপত্র পুড়ানো বৈধ হবে না। কারণ, প্রয়োজনের সময় পার হয়ে গেলে বিবরণ প্রকাশ করা বৈধ নয়।[১]

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ.৪, পৃ.৫৯।

القاعدة الثالثة: اَلتَّرْجِيْحُ لَا يَكُوْنُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ.

তৃতীয় মূলনীতি

অগ্রাধিকার প্রদান সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না[১]

এ মূলনীতিকে কোনো কোনো ইমাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এ কারণে যে, এ ধরনের মতানৈক্য সচরাচর যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কৃত কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত 'আসার' বা বর্ণনাগুলোর মাঝে বিদ্যমান অস্পষ্টতা থেকে তৈরি হয়। অথচ সেটি (রাসুল সা.-এর কাজ) একটি প্রকাশ্য বিষয়। দুটি দল মিলে অশুদ্ধ করেছে মর্মে অভিযোগ করার তুলনায় একজন ব্যক্তির ব্যাপারে গলদের অভিযোগ করা অধিক স্পষ্ট। যেমনটি এ মাসআলায় পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন শব্দে মূলনীতিটি, الترجيح لايقع بكثرة الأدلة والعلل। ''দলিল-প্রমাণ এবং ইল্লত-কার্যকারণের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয় না।''[২] অন্যভাবে, الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة "দলিলের পারস্পরিক বিরোধিতাকালে কার্যকারণের কার্যকরতার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে, সংখ্যাধিক্যের বিচারে নয়।"[৩] অন্য শব্দে, الترجيح لايقع بكثرة العلل بل بقوة فيها। "কার্যকারণের আধিক্যের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয় না; বরং, কার্যকারণের কার্যকরতার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয়।"[৪]

ভিন্ন পরিভাষায়, الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة "কার্যকারণের কার্যকরতার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয়, আধিক্যের বিচার করে নয়।"[৫] এগুলো সব-ই ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক মূলনীতি)।

হানাফি উসুলবিদ (ইসলামি নীতিশাস্ত্রবিদ) ও ফিকহবিদগণ (ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদ) অন্যান্য মাজহাবের অনুসারী সকল উসুলবিদ (আইনশাস্ত্রবিদ) ও ফিকহবিদের সাথে যে একটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন; এ মূলনীতিসমূহ স্পষ্টভাবে সেদিকে ইঙ্গিত করছে। দ্বিমতপূর্ণ বিষয়টি হলো, যদি দুটি 'খবর' বা বর্ণনা পরস্পরবিরোধী সাব্যস্ত

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ.১, পৃ.১৫৯।

[২] শরহুল খাতিমা, পৃ.২৯।

[৩] সারাখসি, আল-মাবসুত, খ.২০, পৃ.১৩৮।

[৪] ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কদির শরহুল হিদায়া, খ.৮, পৃ.২৭৫।

[৫] আল-কাওয়াইদ ওয়াজ জাওয়াবিত, পৃ. ৪৮৪।

হয় এবং এতোদুভয়ের মধ্যে একটির 'রাবি' বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হয় (ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে), অপরটির 'রাবি' সংখ্যা কম হয়; তাহলে সমস্ত উসুলবিদ ও ফিকহবিদ সংখ্যাধিক্যের বর্ণনাটিকে এক সূত্রে বর্ণিত অথবা কম সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে হানাফিরা বলেন, সূত্র বেশি হওয়া বা বর্ণনাকারী অধিক হওয়ার ভিত্তিতে কোনো বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বরং, প্রাধান্য দিতে হবে বর্ণনার কার্যকরতার প্রাবল্যের ভিত্তিতে। তথা বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা অথবা জ্ঞান বা এরকম প্রাধান্যমূলক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই যেকোনো বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। 'শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যদান-এর বিষয়টিও এরকমই।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসঃ

হজরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلٰى شُهَدَاءِ أُحُدٍ.

"রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবীদের জানাজার নামাজ পড়েননি।"

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবি বর্ণনা করেছেন– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের জানাজার নামাজ পড়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁরা বর্ণনা করেছেন-

أَنَّه صَلّٰى عَلٰى حَمْزَةَ سَبْعِيْنَ صَلَاةً، كَانَ مَوْضُوْعًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلَّمَا أُتِيَ بِرَجُلٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَعَلٰى حَمْزَةَ مَعَه.

"রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজরত হামজা (রা.)-এর জানাজার নামাজ সত্তরবার পড়েছেন। তাঁর মৃতদেহ রাসুলের সামনে রাখা ছিলো। যখনই জানাজার জন্য একজনের লাশ আনা হতো, পাশে হামজা (রা.)-এর লাশ থাকতো। এভাবে করে সত্তরবার তাঁর জানাজা পড়া হয়েছে।" সেদিন (উহুদের দিন) হজরত জাবির (রা)-এর পিতা এবং মামা শহিদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রাসুলের সাথে শহিদদের জানাজায় শরিক হতে পারেননি। বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত জাবির (রা.) তাঁর পিতা ও মামার লাশ নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে রাসুল (সা.)-এর ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, "তোমরা মৃতদেরকে তাঁদের শহিদ হওয়ার স্থানেই দাফন করে দাও।" ঘোষণা শুনে জাবির তাঁদেরকে নিয়ে ফিরে এসছিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, তার বর্ণনায় ভুলের অভিযোগ থাকাটা অমূলক নয়।[১]

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ.১, পৃ.১৬০।

মূলনীতির প্রায়োগিক উদাহরণ ও মাসআলাসমূহ:

রুকু এবং রুকু হতে ওঠার সময় 'রফা ইয়াদাইন' (হাত তোলা)-এর হাদিসগুলো এ মূলনীতির উদাহরণ। এ মাসআলায় হানাফি ইমামগণ ইবরাহিম থেকে বর্ণিত হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। যা ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন আলক্বামা থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে, তিনি বলেন, "নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত উঠাতেন। এরপর আর হাত উত্তোলন করতেন না।"[১] অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীগণ বলেন, "হাত উঠানোর হাদিসটি তেতাল্লিশজন 'রাবি' বর্ণনা করেছেন। এবং এর অধিকাংশ রেওয়ায়াত 'সহিহাইন' তথা বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] সারাখসি, আল-মাবসুত, খ.১, পৃ.২৪।

القاعدة الرابعة: اَلْأَصْلُ أَنَّ التَّوْفِيْقَيْنِ إِذَا تَلَاقَيَا وَتَعَارَضَا وَفِيْ أَحَدِهِمَا تَرْكُ اللَّفْظَيْنِ عَلٰى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ أَوْلٰى.

চতুর্থ মূলনীতি

মূলনীতি হলো- একই বিষয়ের দু'টি মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বিরোধপূর্ণ হলে, যে মতের ওপর আমল করলে উভয় মতের শব্দের ওপর আমল হয়ে যায়, সেটি গ্রহণ করা উত্তম[১] (ফিকহি মূলনীতি)

এ মূলনীতিটি মূলত দুটি দলিলের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে, সে বিরোধ নিরসনের একটি স্পষ্ট পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছে। সুতরাং, যদি কোনো সময় একই বিষয়ে দুটি দলিলের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় এবং এতোদুভয়ের মধ্যে একটি দলিলের অর্থ অনুযায়ী আমল করলে উভয় দলিলের শব্দ মতে আমল হয়ে যায়; পক্ষান্তরে আরেকটি দলিলের অর্থানুসারে আমল করলে একটি দলিলের শব্দ মতে আমল হলেও, অপর দলিলের শব্দ মতে আমলের সুযোগ থাকে না- এমন পরিস্থিতিতে প্রথম পদ্ধতি (যে দলিলের অর্থ অনুযায়ী আমল করলে উভয় দলিলের শব্দ মতে আমল হয়ে যায়) গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়। বিরোধপূর্ণ দলিলের মাঝে সুসমন্বয়ের এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি। এ পদ্ধতি একটি দলিলকে প্রাধান্য দিয়ে অপরটিকে বাতিল করার চেয়ে উত্তম।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসঃ

এ মূলনীতির উদাহরণ হলো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী, اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ "মুস্তাহাজা (রক্তপ্রদর/লিকুরিয়ায় আক্রান্ত) মহিলা প্রত্যেক নামাজের সময়ে নতুন ওজু করবে।"[২] অপর হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

---

[১] কারখি, আল-উসুল, পৃ.৩১৭, মূলনীতি-৩৭।

[২] শাওকানি, নায়লুল আউতার, খ.১, পৃ.৪২২।

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

"মুস্তাহাজা মহিলা প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের জন্য নতুন ওজু করবে।"[১]

উল্লিখিত মূলনীতিটি এ ধরনের বিরোধপূর্ণ দুটি হাদিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের (হানাফি মাজহাবের) অনুসারীগণ উভয় হাদিস অনুযায়ী আমল করে থাকেন। তারা বলে থাকেন, মুস্তাহাজা মহিলা প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন ওজু করবে। কেননা, প্রথম হাদিসে সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে আর দ্বিতীয়টিও (যেখানে সময়ের পরিবর্তে নামাজের কথা উল্লেখ রয়েছে) একই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে।

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.১, পৃ.৭১; তিরমিজি ও ইবনু মাজাহ।

القاعدة الخامسة: تَبَدُّلُ سَبَبِ المِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ.

পঞ্চম মূলনীতি

মালিকানার কারণ-মাধ্যম পরিবর্তন হওয়া বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হওয়ার নামান্তর। ভিন্ন শব্দে:

اِخْتِلَافُ الأَسْبَابِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ

কারণের ভিন্নতা সত্তার ভিন্নতার মতোই[১]

আলোচ্য মূলনীতির মর্মার্থ:

কোনো জিনিসের মালিকানার 'কারণ বা মাধ্যম' পরিবর্তন হয়ে গেলে, আইনত সে জিনিসটিও পরিবর্তন হয়ে গেছে বলে ধরা হবে; যদিও বাস্তবিকপক্ষে জিনিসটি পরিবর্তন না হয়। এর অর্থ হলো: মালিকানার কারণ পরিবর্তন হওয়া বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হওয়ার নামান্তর। আর মালিকানা বদল মূল জিনিস বদলের মতোই। কারণের ভিন্নতা সত্তার ভিন্নতার মতোই।

মোদ্দাকথা, মালিকানার কারণ পরিবর্তন হওয়াটা (জিনিসের) সত্তা পরিবর্তনের স্থলাভিষিক্ত এবং সে হিসেবেই আইন প্রয়োগ করা হবে।

মূলনীতির ভিত্তিমূল ও প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

হাদিস শরিফে এসেছে, একদিন নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজরত বারিরা (রা.) (হজরত আয়েশা (রা.) ও তাঁর বাবার আজাদকৃত বাদী)-এর ঘরে তাশরিফ নেন। বারিরা নাস্তা হিসেবে নবিজিকে খেজুর পেশ করেন। ওদিকে চুলায় হাড়ি চড়ানো ছিলো। তাতে গোশত সিদ্ধ হয়ে টগবগ করছিলো। তখন নবিজি বললেন,

أَلَا تَجْعَلِيْنَ لِيْ نَصِيْبًا مِنَ اللَّحْمِ؟

এই গোশতে আমার কোনো অংশ হবে না?

فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّه لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِه عَلَيَّ.

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ.২৮, ধারা. ৯৮।

হজরত বারিরা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ গোশততো আমাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। [কিন্তু আপনার জন্য তো সদকা খাওয়া হারাম]

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

নবিজি বললেন, তোমার জন্য সদকা ছিলো। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দিলে হবে হাদিয়া।"[১] অর্থাৎ, তুমি যখন গ্রহণ করেছিলে তখন তা সদকার মাল ছিলো। কিন্তু তোমার মালিকানায় আসার পর তা আর সদকার মাল থাকেনি। তাই তুমি যখন আমাকে তা দেবে তখন তা তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য হাদিয়াস্বরূপ হবে। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মালিকানার হাতবদল মূল জিনিসের সত্তা বদলকে আবশ্যক করে নেয়।

আর এ বিষয়টিই একটি ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মূলনীতি অস্তিত্বে আসার উপলক্ষ হয়েছে। সে মূলনীতিটি হলো, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات "মালিকানার কারণ পরিবর্তন হওয়া বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হওয়ার নামান্তর।"

মূলনীতির প্রায়োগিক মাসআলাসমূহ:

- কোনো দরিদ্র ব্যক্তি জাকাত অথবা সদকার মাল গ্রহণ করে সেটি যদি কোনো ধনী ব্যক্তি বা হাশিমি বংশীয় ব্যক্তিকে দান করে কিংবা উপঢৌকন হিসেবে দেয় বা তাদের কাছে বিক্রি করে; তাহলে সে মাল তাদের জন্য বৈধ হবে। কারণ, মালিকানা বদলের মাধ্যমে সত্তা বদল হয়ে গেছে।
- কোনো বিত্তবান ব্যক্তি তার কোনো নিকটাত্মীয়কে সদকা অথবা জাকাতের মাল দান করার পর যদি গ্রহীতা মারা যায় এবং দানকৃত সে সদকা সদকাদাতার কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে পুনরায় ফিরে আসে, তাহলে সে (দাতা) সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। তার কৃত সদকার সওয়াব বিফল যাবে না। সওয়াব সে ঠিক-ই পেয়ে যাবে।
- কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে অথবা বিচারকের রায়ের মাধ্যমে দাতা যদিও দানকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে; তথাপি গ্রহীতা যদি দানকৃত বস্তু বিক্রি করে দেয় অথবা অপর কাউকে দান করে দেয়, তখন প্রথম দাতার জন্য সে দান ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, গ্রহীতার মালিকানা থেকে জিনিসটি হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেটি আইনত নতুন একটি জিনিসে পরিণত হয়েছে। এমনকি দানকৃত সে বস্তু

---

[১] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.২, পৃ.১২৮ হা.১৪৯৩; মুসলিম, আস-সহিহ, খ.২, পৃ.৭৫৫ হা.১০৭৫ "তা তার জন্য সদকা আমার জন্য হাদিয়া"-শব্দে আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত।

ক্রয়সূত্রে অথবা অন্য কোনো নতুন মালিকানার মাধ্যমে গ্রহীতার হাতে আসলেও প্রথম দাতার জন্য তা আর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না। অনুরূপভাবে দান গ্রহণকারী মারা গেলেও দাতা আর দান ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সে সম্পদ গ্রহীতার ওয়ারিশদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

- কোনো বিক্রেতা আরেকজনের কাছে কোনো একটি জিনিস বিক্রি করলো। অতঃপর ক্রেতা সে জিনিসটি নেয়ার পর আবার অন্যজনের কাছে বিক্রি করে দিলো। এরপর তার কাছ থেকে জিনিসটি আবার কিনে নিলো। কেনার পর পণ্যের গায়ে এমন একটি ত্রুটি দেখতে পেলো, যা প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করার সময়ও ছিলো। তাহলে এ ত্রুটির কারণে ক্রেতা পণ্যটি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কারণ, ক্রেতার বর্তমান মালিকানাটি প্রথম বিক্রেতার পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হচ্ছে না।

القاعدة السادسة: اَلتَّحَايُلُ عَلى الْحَرَامِ حَرَامٌ.

ষষ্ঠ মূলনীতি

হারাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বনও হারাম[১]

মূলনীতির ভাবার্থ হলো- ইসলামে হারামের দিকে ধাবিত করে–এমন বাহ্যিক মাধ্যম গ্রহণ করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে হারামে জড়ানোর উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রচ্ছন্ন মাধ্যম ও শয়তানি অপকৌশল গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। আর এ বিষয়টি "হারাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বনও হারাম" হিসেবে প্রসিদ্ধ। মূলত শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি "সাদ্দুজ জারাই" (মন্দ কাজের পথ রচনাকারী উপায়-উপকরণসমূহ বন্ধকরণ)-এর সাথে উপর্যুক্ত মূলনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই পরনারীকে দেখা, ছোঁয়া, তার সাথে একান্তে মিলিত হওয়া এবং তার বেপর্দা উদোম চলাফেরা করা ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণের পেছনে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো- ব্যভিচারের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া। কারণ, হারাম 'হীলা' (কৌশল) অবলম্বন করা আল্লাহর সাথে প্রতারণার শামিল। আর আল্লাহর সাথে প্রতারণার অপচেষ্টা চালানো হারাম।

উল্লেখ্য, দ্বীনের মধ্যে কোনো কিছু হারাম করার উদ্দেশ্য মানুষকে কোণঠাসা করে রাখা নয়; বরং সামাজিক জীবনকে সার্বিকভাবে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করে তোলা, যাতে করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়, শান্তি-নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং সমাজ জীবনে মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

<u>মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:</u>

(ক) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لَا تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ، وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ.

"ইহুদিরা যে পাপ করেছে তোমরা তা করতে যেয়ো না । তোমরা ন্যূনতম কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করো না।"[২]

(খ) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

---

[১] ইউসুফ কারজাভি, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ৩২, কায়িদা নং. ৭।

[২] ইবনুল কাইয়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শায়তান, খ. ১, পৃ. ৩৪৮, তিনি বলেছেন- হাদিসটি আবু আব্দিল্লাহ ইবনু বাত্তাহ 'জায়্যিদ' বা ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন।

لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

"নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে হতে একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা হালাল করে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে।"[১]

(গ) অন্যত্র বর্ণিত আছে:

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِاسْمِ الْبَيْعِ.

"এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সুদকে ব্যবসার নাম দিয়ে হালাল মনে করতে চলবে।"[২]

প্রথম হাদিসে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে বারণ করে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো- আল্লাহ ইহুদিদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে তারা বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে এই নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়েছিলো। তারা শুক্রবারে বিভিন্ন পরিখা খনন করে রাখতো যাতে শনিবারে তাতে মৎস এসে জমা হয়। এভাবে রবিবারে তারা সেই মৎস্য ধরে নিতো। মূলত এই পদ্ধতি হারাম ছিলো। কারণ, এটি হারাম অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত অপকৌশল ছিলো। তাই যেকোনো হারাম বস্তুকে (হালাল করার নিমিত্তে) তার আসল নামের পরিবর্তে অন্য নামে অভিহিত করা জঘন্য অপরাধমূলক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।

বর্তমান সময়ে মানুষের যেসব বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড পরিদৃষ্ট হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো– নৃত্য ও উলঙ্গপনাকে 'শিল্প' ও 'চারুকলা' নামে, মদকে 'আধ্যাত্মিক পানীয়' হিসেবে এবং সুদকে 'মুনাফা' (interest) নামে অভিহিত করা।

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩৭, পৃ. ৫৩৪, হা. ২২৯০০; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩২৯, হা. ৩৬৮৮,৩৬৮৯।

[২] ইবনুল কাইয়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শায়তান, খ. ১, পৃ. ৩৫২।

القاعدة السابعة: اَلتَّحْرِيْمُ يَتْبَعُ الْخَبَثَ وَالضَّرَرَ.

সপ্তম মূলনীতি

কোনো বস্তুর নিষিদ্ধতা এর অন্তর্নিহিত নিকৃষ্টতা ও ক্ষতিকে কেন্দ্র করেই সাব্যস্ত হয়[১]

মূলনীতির মর্মার্থ হলো- আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে যেসব অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, তা গণনা করে শেষ করা অসম্ভব। কাজেই তাঁর অধিকার রয়েছে মানুষের জন্য যেকোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার। যেভাবে তাঁর অধিকার রয়েছে তাদের জন্য যেকোনো নির্দেশ বা বিধানকে ইবাদতরূপে ঘোষণা করার। এক্ষেত্রে বান্দার কোনো অধিকারই থাকবে না- আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য করার কিংবা তাঁর কোনো বিধানের ওপর আপত্তি তোলার। বস্তুতঃ এটিই আল্লাহর দাসত্বের মূল দাবি। তবে যেহেতু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময়, তাই তিনি যেকোনো বস্তুসংশ্লিষ্ট 'হালাল' বা 'হারাম' বিধান প্রণয়ন করেছেন যুক্তির আলোকে। এক্ষেত্রে পুরো মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রতিই বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাইতো তিনি মানুষের জন্য কেবল পবিত্র-উৎকৃষ্ট-কল্যাণকর বস্তু হালাল করেছেন এবং যা কিছু হারাম করেছেন সব-ই নাপাক-নিকৃষ্ট-অনিষ্টকর বস্তু।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের জন্য বিভিন্ন পবিত্র-প্রকৃষ্ট বস্তু হারাম ঘোষণা করেছিলেন। তবে এটা ছিলো ইহুদিদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। কারণ, তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করেছিলো এবং তাঁর হালাল-হারামের সীমা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিলো। এ কারণে ফিকহে ইসলামির (Islamic Jurisprudence) দৃষ্টিতে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে-"কোনো বস্তুর নিষিদ্ধতা এর অন্তর্নিহিত নিকৃষ্টতা ও ক্ষতিকে কেন্দ্র করেই সাব্যস্ত হয়।" সুতরাং যা নিরেট ক্ষতিকর তা হারামরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং যা নিরেট কল্যাণকর তা হালাল সাব্যস্ত হয়েছে। আর যার কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণের দিক বেশি তাও হারাম হয়েছে। পক্ষান্তরে, যার কল্যাণের দিক বেশি তা হালালরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু হারাম করেন সব-ই নিকৃষ্ট বা ক্ষতিকর। তবে এ বিষয়ে সমস্ত মুসলমানের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়। কারণ, অনেক সময় কোনো বিষয়ের বিধান একজনের নিকট স্পষ্ট হয়ে অপরের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে। আবার এমনও হতে পারে একটি জিনিসের দোষ ও ক্ষতির দিক

---

[১] ইউসুফ কারজাভি, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ২৮, মূলনীতি নং. ৪।

হয়তো এখন প্রকাশ পায়নি, তবে পরবর্তীকালে তা প্রকাশিত হবে। এ অবস্থায় মুমিনের কর্তব্য হলো- আল্লাহ্প্রদত্ত বিধান সমর্পিতচিত্তে বিশ্বাস করে সর্বদা এ বাক্য উচ্চারণ করা–

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

"আমরা শ্রবণ করলাম আর মেনে নিলাম।" [সুরা আন-নুর, আয়াত: ৫১]

উদাহরণস্বরূপ– যখন আল্লাহ তাআলা শূকরের গোশ্ত হারাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন মুসলিমদের এটুকুই অনুধাবন ছিলো যে– যেহেতু শূকর নোংরা ও নিকৃষ্ট, তাই তা হারাম। তবে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যখন উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হলো, তখন জানা গেলো যে, শূকরের গোশ্তে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণনাশক কীট ও ধ্বংসাত্মক বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে। সুতরাং এখানে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তে যে বস্তু হারাম তা অবশ্যই নোংরা-নিকৃষ্ট-ক্ষতিকর হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে যে অবিসংবাদিত বাস্তবতা সামনে চলে আসে তা হলো- জ্ঞান-বিজ্ঞান যতোই উৎকর্ষ সাধন করবে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতো বেশি উন্মোচিত হবে, ইসলামি শরিয়তের হালাল-হারাম বিধান রচনার মূলে যে প্রকৃত সৌন্দর্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে, তা ততো বেশি প্রদীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।

আর তা হবেই না বা কেনো? দ্বীন ইসলাম তো সেই সত্তা প্রদত্ত জীবন-বিধান যিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আল্লাহ জানেন কোনটি অনিষ্টকারী আর কোনটি কল্যাণকর। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে (এ বিষয়ে) তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাশীল।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২০]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ.

"তোমরা তিনটি অভিসম্পাতযোগ্য কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকো। তা হলো– পানি পানের স্থানে, যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা।"[১]

প্রাথমিক যুগে এই হাদিসের মর্মোপলব্ধি কেবল এতোটুকুতেই সীমিত ছিলো যে– উল্লিখিত তিন স্থানে মলত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ। এ ধরনের কাজ ভদ্রতা-সভ্যতা, সুকুমার বৃত্তি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে বিজ্ঞানের বিকাশ ও অগ্রগতির বদৌলতে আমরা জানতে পারলাম যে, এ কাজ জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ.১, পৃ. ১১৯, হা. ৩২৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৭, হা. ২৬; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৯, হা. ১৩৪২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, খ. ১, পৃ. ২৭৩, হা. ৫৯৪; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হা. ৪৬৯।

القاعدة الثامنة: التَّحَرِّيْ يَقُوْمُ مَقَامَ الدَّلِيْل الشَّرْعِيِّ عِنْدَ انْعِدَامِ الْأَدِلَّةِ.

অষ্টম মূলনীতি

প্রবল ধারণা শরয়ি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি অন্য কোনো দলিল বিদ্যমান না থাকে[১]

'তাহাররি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- অনুসন্ধান চালানো, কামনা করা, পেতে চাওয়া ইত্যাদি। আরবিতে বলা হয়- فلان يتحرى "সে সুচিন্তিতভাবে মনস্থ করছে, ইচ্ছা পোষণ করছে।" আরেকটি ব্যবহার হলো- تحرى فلان بالمكان- যার অর্থ হলো- সে স্থানটিতে থামলো বা অবস্থান করলো। এই অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا﴾

"তারা সুচিন্তিতভাবে সৎ পথ বেচে নিয়েছে।"[২] প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারি (রহ.) আয়াতে বর্ণিত "تَحَرَّوْا" শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন- "تَوَخَّوْا وَعَمَدُوْا" অর্থাৎ, তারা (সঠিক পথের) আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পোষণ করেছে।[৩]

ইসলামি আইনবিশারদগণ 'তাহাররি-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের শব্দ ভিন্ন হলেও সবগুলো সংজ্ঞা একই অর্থ বহন করে। আল্লামা নাসাফি (রহ.) বলেন- "কোনো বিষয়ের সন্দেহপূর্ণ বিভিন্ন দিকসমূহের মধ্য হতে যেকোনো এক দিক আকড়ে ধরাকে 'তাহাররি' বলা হয়।"[৪] ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর মতে: "শরিয়তের পরিভাষায় 'তাহাররি' হলো- কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লে, তখন প্রবল ধারণার ভিত্তিতে এর প্রকৃত অবস্থা জানার প্রচেষ্টা চালানো।...

---

[১] কাসানি, বাদায়িউস সানায়ি, খ. ১, পৃ. ৩৩২।

[২] সুরা জিন্: ১৪।

[৩] জাওহারি, আস-সিহাহ, খ. ৬, পৃ. ২৩১১

[৪] নাজমুদ্দিন নাসাফি, তিলবাতুত তলাবা, পৃ. ৯০।

সুতরাং 'তাহাররি' এমন দলিল, যার সাহায্যে কোনো বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত না হলেও মোটামুটি ধারণা অর্জিত হয়।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেনো নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেনো সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা আদায় করে।"[২]

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

কোনো মুসল্লির যদি ভিন্ন ভিন্ন দুটি দিনের জোহর ও আছরের নামাজ ছুটে যায় এবং কোনটি আগে তা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে সাধ্যানুযায়ী চিন্তা-গবেষণা (তাহাররি) চালাবে। কারণ, তার জন্য ছুটে যাওয়া নামাজ দুটির তরতিব (ক্রমাধারা) নির্ণয় এতোই সন্দেহপূর্ণ যে, এই বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। এক্ষেত্রে 'তাহাররি' ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুতরাং অন্য কোনো দলিলের অবর্তমানে 'তাহাররি' এক্ষেত্রে শরয়ি দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

অনুরূপভাবে কারো নিকট কিবলা নির্ণয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে, তখন তার অন্তরের ঝোঁক যে দিকে প্রবল হয় সেই দিকেই অভিমুখ করে নামাজ পড়ে নেবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তার অন্তর কোনো বিষয়ে সুনিশ্চিত না হলেও তার এহেন কর্মকে শরয়ি দলিলনির্ভর কর্ম হিসেবে গণ্য করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল আসল'-এ বলেন– "প্রয়োজনের সময় যেসব বিষয়ে বৈধতা চলে আসে, সেসব বিষয়ে 'তাহাররি' করাও বৈধ হবে।"[৩]

আলোচ্য মূলনীতি থেকে ইসলামি আইনবিশারদগণ নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ বের করেছেন:

---

[১] সারাখসি, আল-মাবসুত, খ. ১০, পৃ. ১৮৫।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৮৯, হা. ৪০১।

[৩] কাসানি, বাদায়িউস সানায়ি, খ. ১, পৃ. ৩৭৩।

(ক) যদি কোনো মুসাফিরের নিকট এমন দুটি পাত্র থাকে– যার মধ্যে একটি পবিত্র আর অন্যটি অপবিত্র, তখন পানি পানের প্রয়োজন দেখা দিলে সে 'তাহাররি' বা চিন্তা-গবেষণা করে যেকোনো একটি পাত্র থেকে পানি পান করবে। পক্ষান্তরে ওজুর প্রয়োজনে সে 'তাহাররি' করবে না। কেননা, ওজুর ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার অসম্ভব হলে বিকল্প হিসেবে মাটি ব্যবহার করা যায়। পক্ষান্তরে পান করার জন্য পানির কোনো বিকল্প নেই।[১]

(খ) যদি কোনো ব্যক্তির আশঙ্কা হয় যে, সে ওজু করতে গেলে তার (ফরজ) নামাজের সময় চলে যাবে কিংবা জুমার নামাজ ছুটে যাবে, তারপরও তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না। কারণ, নামাজের উল্লিখিত শ্রেণি দুটির বিকল্প রয়েছে। পক্ষান্তরে ঈদের নামাজ বা জানাজার নামাজ হলে, উপর্যুক্ত অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে। কারণ, এগুলোর পুনরাবৃত্তির কোনো সুযোগ নেই।[২]

---

[১] ওমর ইবনু মুহাম্মদ আল-খাব্বাজি, আল-মুগনি ফি উসুলিল ফিকহ, পৃ. ২২৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

القاعدة التاسعة: اَلتُّهْمَةُ تَقْدَحُ فِيْ التَّصَرُّفَاتِ إِجْمَاعًا.

নবম মূলনীতি

অপবাদ (বিচারসংশ্লিষ্ট) কার্যাবলিকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ করে[১]

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার-ফায়সালা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিবহুল একটি পদ। সুষ্ঠু বিচারকার্য প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে বিরাজমান পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসা করা হয়, একে অপরের ক্ষতিসাধনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করা হয়, পাওনাদারের হাতে তার হক যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

সঙ্গত কারণেই যে বিষয়টি অনিবার্য হয়ে পড়ে তা হলো- বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালিত হওয়া এবং তা পরিচালনার ভিত্তি সুদৃঢ়-সুসংহত হওয়া। যে প্রক্রিয়ায় কলুষতা ও সংশয়ের লেশমাত্র থাকবে না। মূলত এই দিকটি-ই আলোচ্য মূলনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

যেসব বিষয়ে জনগণের ওপর প্রশাসক ও বিচারকের হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব চলে আর যেসব বিষয়ে চলে না এতোদুভয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে আল্লামা কারাফি (রহ.) বলেন– "...চতুর্থ প্রকার: যা প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন ও হস্তক্ষেপযোগ্য এবং যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের সমর্থনে শরয়ি দলিল, 'হুজ্জত' (বিচারকার্যসংশ্লিষ্ট দলিল) এবং বাহ্যিক হেতু বিদ্যমান, তবে যেহেতু ফায়সালার কারণে বিচারক (বা প্রশাসক) প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যেমন- নিজের পক্ষে ফায়সালা দেয়া; বিধায় উক্ত ফায়সালা রহিত হয়ে যাবে। কারণ, মূলনীতি হলো– অপবাদ বিচারসংশ্লিষ্ট কার্যাবলিকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ করে।"[২]

বিচারিক কার্যাবলিতে অপবাদের কয়েকটি স্তর: সর্বোচ্চ স্তরটি সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচ্য হবে। যেমন- (বিচারক) নিজের পক্ষে রায় ঘোষণা করা। সর্বনিম্ন স্তরটি বিবেচনাতীত থাকবে। এক্ষেত্রেও কারো কোনো দ্বিমত নেই। যেমন- (বিচারক) নিজের প্রতিবেশির পক্ষে রায় প্রদান করা। তবে মধ্যবর্তী স্তরটি মতানৈক্যপূর্ণ।[৩]

---

[১] কারাফি, আল-ফুরূক, খ. ৪, পৃ. ৪৩।

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] প্রাগুক্ত।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

আলোচ্য মূলনীতিটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে উৎসারিত। তিনি বলেন–

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِيْنٍ.

"প্রতিপক্ষ ও অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"[১]

---

[১] ইবনু আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, খ. ১০ পৃ. ৬৭৮-৬৭৯।

القاعدة العاشرة: اَلتَّابِعُ تَابِعٌ.

দশম মূলনীতি

(বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে অন্যের) অনুগামী বিষয় (বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অন্যের) অনুগামী[১]

যে বস্তুর বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যের অনুগামী হয়, সেই বস্তু বিধানের ক্ষেত্রেও তার অনুগামী হবে। কারণ, অনুগামী বস্তুর নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা হামাভি (রহ.) বলেন– "(বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে অন্যের) অনুগামী বিষয় (বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অন্যের) অনুগামী। অর্থাৎ অনুগত বিষয় অনুসরণীয় বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না।[২]

প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

(ক) যেহেতু বাচ্চা মায়ের অনুগামী হয়, তাই গর্ভবতী গাভী বিক্রয়ের সময় পেটের বাচ্চাসহ অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে বাচ্চার আলাদা মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রয় করা হবে না।[৩]

(খ) জমি বিক্রির সময় রাস্তা চলাচল ও পানি সেচের অধিকার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে বিক্রির আওতাভুক্ত থাকবে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ দু'টি অধিকার স্বতন্ত্রভাবে বিক্রির প্রয়োজন নেই।[৪]

(গ) পণ্য বিক্রয় হওয়ার পর তাতে যা কিছু বর্ধিত হবে, সবই ক্রেতার মালিকানা বিবেচিত হবে। যদিও পণ্য ক্রেতার করায়ত্ত না হয়।[৫]

---

[১] আলি হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ৪৭।

[২] হামাভি, গামজু উয়ুনিল বাসায়ির শরহু কিতাবিল আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

[৩] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১১৭; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১৩৩।

[৪] ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

[৫] আলি হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ৪৭।

(ঘ) নিয়তের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো অনুসরণীয় ব্যক্তির নিয়ত; অনুগামীর নয়। সুতরাং সফরের ক্ষেত্রে মালিকের নিয়ত ক্রীতদাসের জন্য এবং স্বামীর নিয়ত স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যার অনুসরণ অন্যের জন্য বাধ্যতামূলক– এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন– রাজা, সেনাপ্রধান ইত্যাদি। কারণ, যে অনুসৃত তার বিধান অনুগতের ওপর প্রযোজ্য হবে।[১]

---

[১] কাসানি, বাদায়িউস সানায়ি, খ. ১, পৃ. ২১০।

চতুর্থ অধ্যায়

ثاء/সা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

(এ অধ্যায়ের অধীনে ১টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة: اَلثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ.

মূলনীতি: অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের মতো[১]

মূলনীতির মর্মার্থ হলো- শরয়ি দলিলের মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রমাণিত হলে, তা সরাসরি চোখে দেখা প্রমাণিত বিষয়ের মতো বিবেচিত হবে। উল্লিখিত মূলনীতিতে ব্যবহৃত 'বুরহান' শব্দের অর্থ হলো- বিচারকার্যসংশ্লিষ্ট দলিল, যা 'বায়্যিনাহ' (প্রমাণ/দলিল) মর্মে অভিহিত। অর্থাৎ, কোনো ঘটনা বিচারকের মজলিসে শরয়ি দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলে, তা স্বচক্ষে দেখা বাস্তব ঘটনার মতো বিবেচিত হবে। ফলে বিচারক উক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করে দেবেন। কারণ, বিচারকের দায়িত্ব হলো, বাহ্যিক দলিল-প্রমাণ-সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা।

<u>মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:</u>

(ক) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

"বাদীপক্ষের দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা, আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথবাক্য পাঠ করা।"[২]

(খ) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যত্র বলেন–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَعَسَى أَنْ يَّكُوْنَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ الْآخَرِ، فَأَقْضِيْ لَه عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ.

"আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নই। তোমরা আমার নিকট বিবাদমান বিষয়াদি নিয়ে ফায়সালার জন্য এসে থাকো। অনেক সময় দেখা যায়, তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অন্যের (প্রতিপক্ষের) চাইতে অধিক পারদর্শী ও

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৫, ধারা. ৭৫; মুস্তাফা আজ-জারকা, আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খ. ২, পৃ. ১০৫৪; তিরমিজি, আস সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৮-১৯, হা. ১৩৪০-১৩৪২।

২ باء (বা) অধ্যায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় মূলনীতিতে হাদিসের রেফারেন্স ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাকপটু হয়ে থাকো। ফলে আমি বাহ্যিকভাবে যা শুনি সে মতেই তার পক্ষে ফায়সালা দিয়ে থাকি।"[১]

উভয় হাদিসে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো– 'বায়্যিনাহ' বা বিচারকের মজলিসে উপস্থাপিত প্রমাণ যদি শরয়ি দলিল হিসেবে গণ্য না হতো এবং চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের স্থানে না হতো, তবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'বায়্যিনাহ' উপস্থাপন ও শপথের নির্দেশ দিতেন না এবং তদানুযায়ী রায় প্রদান করতেন না। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, শরয়ি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের মতো। মূলত মানুষের ওপর সহজ করার লক্ষ্যেই এই পদ্ধতিতে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ, চাক্ষুষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনো প্রমাণের যদি গ্রহণযোগ্যতা না থাকতো, তবে মানুষের অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব হতো না।

মূলনীতিসংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক উদাহরণ:

(ক) জনৈক ব্যক্তি বললো: "অমুকের নিকট তোমার যা পাওনা আমি তার জামিন হলাম" এবং এক্ষেত্রে সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করলো না। অতঃপর উভয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে বাদী এক হাজার টাকা প্রাপ্য–এ মর্মে দলিল পেশ করে, তখন কাফিল (জামিন)কে ঐ এক হাজার টাকাই পরিশোধ করতে হবে। কারণ, দলিলের মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয়, তা স্বচক্ষে দেখা প্রমাণিত বিষয়ের মতো।

এই মূলনীতি থেকে তিনটি ফলাফল বের হয়:

- বাদী যদি নিজ দাবি দলিল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তখন বিবাদীর অস্বীকৃতির কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।
- বিচারক কর্তৃক রায় ঘোষণার পর উক্ত রায়ের বিপক্ষে বিবাদীর কোনো দাবি-দাওয়া গ্রহণ করা হবে না, যদি না দাবির পক্ষে নতুন কোনো সূত্র বা হেতু থাকে।
- বিবাদী ছাড়া ঘটনাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উক্ত দলিলনির্ভর রায় কার্যকর হবে, যদি তারা রায় সাব্যস্তকারী একই হেতুর আওতাভুক্ত হয়। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও ঘটনাটি প্রমাণিত বলে ধর্তব্য হবে।

(খ) যদি কারো বিপক্ষে দুজন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে– সে অন্যের সম্পদ নষ্ট করেছে অথবা অন্যের কাছ থেকে সম্পদ চুরি করেছে কিংবা জোরপূর্বক

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৯, পৃ. ২৫, হা. ৬৯৬৭; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৩৭, হা. ১৭১৩, উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত।

অপহরণ করেছে এবং যথার্থ প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়, ফলে বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিয়ে দিলে, তখন (বিবাদী হিসেবে) না তার অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, আর না উপর্যুক্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তার কোনো দাবির প্রতি কর্ণপাত করা হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিবেচ্য তা হলো– সে যদি অপহৃত কিংবা চুরিকৃত বস্তু কোনো তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করে অথবা দান করে দেয়, তখন তা ঐ পক্ষ থেকে ফেরৎ চাওয়া হবে এই মর্মে যে– বস্তুটি চুরি বা অপহৃত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

পঞ্চম অধ্যায়

جيم/জিম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ২টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلْجَيِّدُ وَالرَّدِيْءُ فِيْ الرِّبْوِيَّةِ سَوَاءٌ، وَالزُّيُوْفُ كَالْجِيَادِ فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَالنَّائِمُ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ.

প্রথম মূলনীতি

সুদ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভালো এবং মন্দ উভয়টি সমান। কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ বস্তু ভালো বস্তুর মতো গণ্য হয়। কিছু বিষয় এমন আছে, যেখানে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির হুকুমে ধর্তব্য হয়[১]

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিস:

ইসলামি আইনবিদগণ উপর্যুক্ত মূলনীতিটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে উদ্ভাবন করেন–

جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ.

"এগুলোর (হাদিসে বর্ণিত ছয়টি বস্তু) ভালো ও মন্দ সমান।" সুপ্রথিত গ্রন্থ 'হিদায়া'-এর 'রিবা' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে– "এই বস্তুসমূহে ভালো-মন্দের পার্থক্য বিবেচনায় নেয়া হবে না। কারণ, সমাজের প্রচলন অনুযায়ী এগুলোর ভাল-মন্দে বিদ্যমান পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া এই নগণ্য পার্থক্য বিবেচনায় নেয়া হলে, ব্যবসায়িক লেনদেনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।"[২]

---

১ ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৪৯৯।

২ মারগিনানি, আল-হিদায়া, খ. ৩ পৃ. ৬১-৬২; ইবনু হাজার, আদ-দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া, খ. ২, পৃ. ১৫৬, হা. ৭৯১। ইবনু হাজার বলেন- এই শব্দে হাদিসটির উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এই অর্থে সহিহ মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২২১ হা. ১৫৮৪)-এর মধ্যে আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন– "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান এবং নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পরিমাণে বেশি দিলো কিংবা বেশি গ্রহণ করলো সে সুদী কারবারে লিপ্ত হলো। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই সমান অপরাধী।"

القاعدة الثانية: جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

দ্বিতীয় মূলনীতি

গৃহপালিত পশুর অনিষ্টাচরণে ক্ষতিপূরণ নেই[১]

আলোচ্য মূলনীতির অর্থ– গৃহপালিত পশু নিজ থেকে যদি কারো জান-মালের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে এর দায়ভার কারো ওপর বর্তাবে না। কারণ, পশুর এহেন কর্মকাণ্ড মানবীয় কোনো কর্ম বা ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়নি। মূলত সমস্ত জন্তুর ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য হয়।

যেসব মূলনীতি ইসলামি আইনশাস্ত্রের ক্ষতিপূরণ নীতির প্রতিনিধিত্ব করে, তন্মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অন্যতম। 'জিনায়া' (Criminal Matters) শব্দের অর্থ হলো- যে কর্মের কারণে জান-মালের বিনাশ বা ক্ষতি সাধিত হয়। 'আজমা' অর্থ- চতুষ্পদপ্রাণী। আর 'জুবার' অর্থ- বৃথা। অর্থাৎ, যে কর্মের জন্য কাউকে দায়ী বা অভিযুক্ত করা যায় না।

উপরিউক্ত মূলনীতির ব্যাখ্যায় ইমান ইবনু দাকিক আল-ইদ বলেন– "আল-জুবার (الجُبَار)শব্দটির অর্থ হলো- বৃথা, যে কর্ম ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়। আর 'আজমা' (عَجْمَاء) হলো- নির্বাক জীব-জন্তু।"[২]

ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল-জুবার শব্দের ব্যাখ্যা হলো- যে কর্মে কোনো 'দিয়াত' (রক্তপণ/Blood Money) আসে না।"[৩]

মূলনীতির সারবক্তব্য হলো– গৃহপালিত পশু নিজেই কারো সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি করলে, এর জন্য কেউ দায়ী হবে না। সুতরাং কোনো জন্তু কারো ক্ষেত-ফসল নষ্ট করলে, এর জন্য মালিককে দায়ী করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে একদল ফিকহবিদ (ইসলামি আইনবিদ) এই শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, যদি জন্তু মালিকের নিয়ন্ত্রণে না থাকে। আর যদি নিয়ন্ত্রণে থাকাবস্থায় কারো সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে। কারণ, এর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মালিকের

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৭, ধারা. ৯৪।

২ ইবনু দাকিক আল-ইদ, ইহকামুল আহকাম শরহু উমদাতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ৩৮০।

৩ মালিক ইবনু আনাস, আল-মুওয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৮৬৯, হা. ১২।

হাতে ছিলো। তবে জন্তু মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গেলে, তখন চাই তা দিনে হোক বা রাতে, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণের দায়ভার মালিকের ওপর বর্তাবে না। তবে কারো কারো মতে, এখানে রাত-দিনের বিষয়টি বিবেচ্য। কারণ, দিনের বেলায় ক্ষেত-খামার ইত্যাদি দেখাশুনা ও সুরক্ষার দায়িত্ব মালিকের ওপর বর্তায়। পক্ষান্তরে রাতের বেলায় এমন বিধান নেই।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

উপর্যুক্ত মূলনীতিটি মূলত একটি হাদিসেরই প্রতিবিম্বিত রূপ। হাদিসটি হলো-

جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

"গৃহপালিত পশুর অনিষ্টাচরণে ক্ষতিপূরণ নেই।"

এই হাদিস থেকেই উপর্যুক্ত মূলনীতিটি উৎসারিত। এই মূলনীতির কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ হলো–

১- যদি কোনো গৃহপালিত পশু মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকাবস্থায় কোনো জনবসতির ফসল খেয়ে ফেলে, তখন যেহেতু মালিক সঙ্গে ছিলো, তাই এর ক্ষতিপূরণ তাকে বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে মালিক পশুর সাথে না থাকলে, তখন উক্ত কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। তবে ঘটনাটি রাতে হলে, বিধান ভিন্ন হবে। (অর্থাৎ, কোনো অবস্থায়ই মালিকের ওপর ক্ষতিপূরণ আসবে না।)

২- দু'জন ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ ঘোড়াকে পশু বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রাখলো। অতঃপর একটি অপরটির প্রাণনাশ করলে, তখন প্রাণনাশী ঘোড়ার মালিকের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

حاء/হা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৩টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلْحُدُوْدُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ.

প্রথম মূলনীতি

সন্দেহের কারণে 'হুদুদ' (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) রহিত হয়ে যায়[১]

মূলনীতির ভাবার্থ হলো- যদি কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জন্য 'হদ' (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি/Penal Laws of Islam) রহিত হয়ে যাবে। ধরে নেয়া হবে– অপরাধ যেনো সংঘটিত-ই হয়নি। মূলনীতিটি অন্য শব্দেও বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.

"সন্দেহের দ্বারা 'হুদুদ' অকার্যকর হয়ে যায়।" কারণ, ইসলাম যথাসম্ভব 'হদ' রহিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইসলামি আইনশাস্ত্রে যেসব মূলনীতি অতিশয় গুরুত্বের দাবি রাখে, তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি অন্যতম। কারণ, এই মূলনীতির মাঝে পরিস্ফুট হয় ইসলামি শরিয়তের অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য–যে শরিয়ত বান্দার সার্বিক কল্যাণ সাধন ও যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূতকরণের প্রতি যুগপৎ গুরুত্বারোপ করে। সঙ্গত কারণেই যেকোনো হদ যেমন- বেত্রাঘাত, 'কিসাস' (কোনো ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারীকে বা আহতকারীকে পর্যায়ক্রমে হত্যা বা আহত করা/Just Retaliation in Kind) ইত্যাদি সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ দেখা দিলে, অপরাধীর ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না।

সুতরাং কোনো মানুষের রক্তপাত, পিঠে বেত্রাঘাত কিংবা অঙ্গকর্তনের মতো শাস্তি প্রয়োগের জন্য অপরাধ এমন অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে, যেখানে সংশয়ের লেশমাত্র বিদ্যমান থাকবে না। প্রসঙ্গত মাইজ আসলামির প্রসিদ্ধ হাদিসটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে (ব্যভিচারের) স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার জন্য বারংবার বাতলে দিয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার কারণে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যদ্দরুন হদ অনিবার্যরূপে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ হাদিস থেকে ইসলামি

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১২২।

আইনবিদগণ যে বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন তা হলো– বিচারকের জন্য উত্তম হলো (ব্যভিচারের) স্বীকারোক্তিদাতাকে এ কথা বলা যে– প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি প্রদানের চেয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করা অধিক শ্রেয়। তাইতো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাইজকে বলেছিলেন: "হয়তো তুমি চুমু দিয়েছো বা চেপে ধরেছো অথবা তাকিয়েছো?" যাতে তিনি তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন। কারণ, মাইজ (রা.) যদি তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে বলতেন– হ্যাঁ, আমি চেপে ধরেছি বা আমি চুমু দিয়েছি; আমি ব্যভিচার করিনি, তবে তাঁর এ প্রত্যাহার থেকে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হতো, যদ্দরুন 'রজম' (প্রস্তারাঘাতে হত্যার শাস্তি) রহিত হয়ে যেতো।

প্রতীয়মান হয় যে– রাসুলের বাণীসূচক ও কর্মসূচক সুন্নাহ্র মধ্যে আমরা আলোচ্য মূলনীতির-ই নিয়মবদ্ধ দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকি।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

(ক) ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اِدْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"তোমরা সন্দেহের কারণে হদ রহিত করো।"[১]

(খ) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اِدْفَعُوْا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"তোমরা যথাসাধ্য হদ প্রতিরোধ করো।"[২]

(গ) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اِدْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجاً فَخَلُّوْا سَبِيْلَه.

"তোমরা যথাসাধ্য মুসলিমদের থেকে হদ মওকুফ করে দাও। যদি কোনো মুসলিমের জন্য মুক্তির পথ খুঁজে পেলে, তাহলে তার পথ ছেড়ে দাও।"[৩]

---

[১] হারিসি, মুসনাদুল ইমামিল আজম আবি হানিফা আন-নুমান, খ. ১, পৃ. ১৮৪-১৮৫, হা. ১২৭।

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৮৫০, হা. ২৫৪৫।

[৩] তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৮৫, হা. ১৪২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, খ. ৪, পৃ. ৪২৬, হা. ৮১৬৩; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ৪১৩, হা. ১৭০৫৭।

(ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে 'হাসান' সনদে (বর্ণনাসূত্রে) বর্ণিত:

اِدْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَةِ.

"সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় হদ রহিত করে দাও।"[১]

(ঙ) ওমর (রা.) বলেন-

لَأَنْ أُعَطِّلَ الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيْمَهَا بِالشُّبُهَاتِ.

"সন্দেহ বিদ্যমান রেখে হদ কার্যকর করার চাইতে তা সন্দেহের কারণে রহিত করে দেয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"[২]

---

[১] মুসাদ্দাদ, আল-মুসনাদ, পৃ. ১২৩।

[২] ইবনু আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, খ. ৫, পৃ. ৫১১, হা. ২৮৪৯৩।

القاعدة الثانية: اَلْحُقُوْقُ لَا تَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে বলে কারো অধিকার রহিত হয় না, যদিও অতিবাহিত সময়ের পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয়

সমগ্র আসমানি শরিয়ত, বিশেষ করে ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো- দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে কারো অধিকার বাতিল হয় না। কারণ, মানুষের অধিকার একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং এ অধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত মালিকানা একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহপ্রদত্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। ইসলামি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে সময় দীর্ঘায়িত হওয়া-সংক্রান্ত মূলনীতিটি এজন্যই বিশেষভাবে বিবেচিত যে, যাতে তা নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত অধিকারের ওপর নতুন দাবি উত্থাপনের পথ রুদ্ধ করে দেয়; এজন্য নয় যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা কোনো প্রতিষ্ঠিত অধিকারকে রহিত করে দেয়। কারণ, কালের আবর্তন-বিবর্তনের ফলে কোনো হারাম বস্তু হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং মালিকের জিম্মায় মূল স্বত্বাধিকার বাকি থাকবে। তবে হানাফি মাজহাবের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন- দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে 'হদ' রহিত হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে অধিকার যে রহিত হয় না– এর প্রমাণ মেলে হজরত ওমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন–

الْحَقُّ قَدِيْمٌ لَا يُبْطِلُه شَيْءٌ.

"সত্য (অধিকার) চিরন্তন, কোনো বস্তু তাকে বাতিল করতে পারে না।"[১]

এরই ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়তের সর্বজনস্বীকৃত একটি মূলনীতি হলো– কিসাস ও 'দিয়াত' (রক্তপণ) বান্দার একচ্ছত্র অধিকার। আর এ অধিকার রহিত হবে হয় ক্ষমা আর না হয় অর্থের বিনিময়ে সমঝোতার মাধ্যমে।

---

[১] ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, খ. ৬, পৃ. ১৭১; জাহাবি, আল-মুহাজ্জাব, খ. ৮, পৃ. ৪১৫৪; ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিইন, খ. ১, পৃ. ৮৯; ইবনু কাসির, মুসনাদুল ফারুক, খ. ২, পৃ. ৫৪৭।

القاعدة الثالثة: اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِه وُجُوْداً وَعَدَماً.

তৃতীয় মূলনীতি

কার্যকারণের সাথে বিধানের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা আবর্তিত হয়

মূলনীতির ব্যাখ্যা:

শরয়ি বিধানসমূহ মূলত দুই প্রকার:

প্রথমত: যে বিধান প্রণয়নের পেছনে নির্ধারিত কার্যকারণ বিদ্যমান, যে কার্যকারণ সম্পর্কে 'নস' (কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য) কিংবা বিবেচনাপ্রসূত গবেষণা থেকে জানা যায়। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন– "যদি বিধানপ্রণেতা কোনো বিধানকে 'সবব' (হেতু) কিংবা 'ইল্লাত' (কার্যকারণ)-এর সাথে সংযুক্ত করে দেন, তাহলে উক্ত 'সবব'[১] বা 'ইল্লাত'-এর অবিদ্যমানে সংশ্লিষ্ট বিধানটি রহিত হয়ে যাবে। যেমন– মদ যেহেতু নেশাযুক্ত দ্রব্য, তাই এর সাথে অপবিত্রতা ও হদ সাব্যস্ত হওয়ার বিধান জুড়ে দেয়া হয়েছে। যদি নেশা দূরীভূত হয়ে মদ সিরকাতে রূপান্তরিত হয়, তবে উপর্যুক্ত বিধান দুটি রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে 'ফিস্‌ক' (পাপকর্ম); এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য ও হাদিস বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে সে ঐ দোষ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিধান দুটিও রহিত হয়ে যাবে।[২]

দ্বিতীয়ত: যে বিধানের সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ অজ্ঞাত। যা 'তাআব্বুদি' (মানবযুক্তি-ঊর্ধ্ব করণীয় বিধান বা নিরেট ইবাদতসূচক বিধান) মর্মে অভিহিত। যেহেতু এ ধরনের বিধানের কার্যকারণ অজ্ঞাত, সেহেতু এগুলোর বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা

---

[১] 'Sabab' is a sign whose presence necessitates the existence of an Hukm (Ruling) and that which, if absent, necessitates an absence of that Hukm. It is not the motive behind the legislation of the Hukm. Hence, 'Sabab' indicates the presence of the obligation, not the motive nor the reason for the obligation. The sighting of the month of Ramadhan is the 'Sabab' for the obligation of fasting upon those who sight it. (Islamic Revival) On the contrary, 'Illah' refers to the effective or operative cause behind a law. (Oxford Dictionary of Islam, Ed. John Exposito, 2003). In other words, it is the motive behind the legislation of the Hukm. For example, intoxication is the 'illah of the prohibition in wine-drinking. (Translator)

[২] ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিইন, খ. ৫, পৃ. ৫৩৮।

কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। যেমন - পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ, জাকাতযোগ্য সম্পদের নেসাবের পরিমাণ নির্ধারণ।[১]
জ্ঞাতব্য যে, অধিকাংশ বিধান প্রথম প্রকারের-ই আওতাভুক্ত হয়।

মূলনীতির প্রামাণ্য দলিল:

কোনো বিধানের কার্যকারণ শরয়ি দলিলাদি থেকে গ্রহণ করা হয়। যেমন– রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী–

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"(বিড়াল অপবিত্র নয়।) কারণ, যেসব প্রাণী প্রতিনিয়ত তোমাদের আশেপাশে থাকে, তাদের মধ্যে রিড়ালও একটি।"[২]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ﴾

"(আল্লাহ নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য 'ফায়' নির্ধারণ করেছেন) যাতে তোমদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে।" [সুরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

মূলনীতিসংশ্লিষ্ট উদাহরণ:

(১) নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'জাল্লালা' (নাপাক দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত গৃহপালিত প্রাণী) খেতে নিষেধ করেছেন। যদি এ ধরনের প্রাণীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ রেখে শুচি খাদ্য খেতে অভ্যস্ত করা হয়, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল হয়ে যাবে। কারণ, হাদিসের নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণ ছিলো নাপাকিকে কেন্দ্র করে, যা দূরীভূত হওয়ায় নিষেধাজ্ঞার বিধানও রহিত হয়ে যাবে।

(২) এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মদ নিজস্ব ক্রিয়ায় সিরকাতে রূপান্তরিত হলে, তা পবিত্র বলে গণ্য হবে। কারণ, অপবিত্রতা যেভাবেই হোক দূরীভূত হলে, সংশ্লিষ্ট বিধানও রহিত হয়ে যাবে।

---

[১] আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসুলিল ফিকহ, পৃ. ৬২।
[২] নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫, হা. ৬৮; দারিমি, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৭১, হা. ৭৬৩।

সপ্তম অধ্যায়

خاء/খা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৩টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: خَبْرُ الْوَاحِدِ إِذَا وَرَدَ مُخَالِفاً لِنَفْسِ الْأُصُوْلِ لَمْ يُقْبَلْ.

প্রথম মূলনীতি

খবরে ওয়াহিদ (শরিয়তস্বীকৃত) মূলনীতির পরিপন্থী হলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে[১]

'খবরে ওয়াহিদ' ঐ হাদিসকে বলে, যা 'খবরে মুতাওয়াতির' ও 'খবরে মাশহুর'-এর পর্যয়ে পৌছেনি।[২]

মূলনীতির ভাবার্থ হলো- হানাফিদের দৃষ্টিতে খবরে ওয়াহিদ শরিয়তস্বীকৃত কোনো সামগ্রিক মূলনীতির বিপরীত হলে, তা গ্রহণ করা হবে না। শরিয়ত স্বীকৃত সামগ্রিক মূলনীতিকেই 'নাফসুল উসুল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞাতব্য যে, যেসব বিষয়ে হানাফি এবং অন্যান্য মতাবলম্বী ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, তন্মধ্যে আলোচ্য বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। সুতরাং যে খবরে ওয়াহিদ শরিয়তস্বীকৃত কোনো সামগ্রিক মূলনীতির বিপরীত হবে, তা বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে 'সহিহ' হলেও হানাফিদের দৃষ্টিতে আমলযোগ্য হবে না। মূলত খবরে ওয়াহিদ সামগ্রিক মূলনীতিবিরোধী হওয়ার দাবিটি দলিলশূন্য নিছক দাবি মাত্র। কারণ, যে হাদিস রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে 'সহিহ'[৩] সূত্রে বর্ণিত হবে, তা স্বপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতিরূপে বিবেচিত হবে। সঙ্গত কারণে এর অনুসরণ অপরিহার্যরূপে বিবেচিত হবে।

এই মূলনীতিকে সামনে রেখেই হানাফি স্কলারগণ 'মুসার্‌রাত' (দুধ জমিয়ে স্তন ফুলানো পশু)সংক্রান্ত হাদিসটি গ্রহণ করেননি, যেখানে দোহনকৃত দুধের ক্ষতিপূরণ

---

[১] দাবুসি, তাসিসুন নাজার, পৃ. ১৫৬।

[২] খবরে মুতাওয়াতির: এমন হাদিসকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়, যা সনদের প্রত্যেক স্তরে এমন একদল লোক দ্বারা বর্ণিত, যাদের পক্ষে সাধারণত যোগসাজশ করে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা অসম্ভব ঠেকে।
খবরে মাশহুর: যা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এক বা দুজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁদের থেকে মুতাওয়াতির খবরের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার মতো একদল তাবেয়িন এবং তাদের থেকে অনুরূপ সংখ্যক তাবে তায়িন বর্ণনা করেছেন। (অনুবাদক)

[৩] সহিহ: যে হাদিস সনদের প্রত্যেক স্তরে ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বর্ণনাকারীদের দ্বারা 'মুত্তাসিল সনদ' (নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্র)-এ বর্ণিত এবং যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত কোনো হাদিসের পরিপন্থী নয়, সাথে সাথে তা যেকোনো প্রকারের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি থেকে মুক্ত। (অনুবাদক)

হিসেবে এক সা' (৩ কেজি পরিমাণ) খেজুর দিতে বলা হয়েছে। কারণ, হাদিসটি শরিয়তের সামগ্রিক মূলনীতি পরিপন্থী। আল্লামা দাবুসি থেকে এমন বক্তব্য বর্ণিত।[১] মূলত এই হাদিসটি কুরআনের আয়াত ও প্রসিদ্ধ হাদিসের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত। আয়াত হলো:

﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

"সুতরাং যারা তোমাদের ওপর আগ্রাসন চালাবে তোমরাও তাদের অনুরূপ জবাব দেবে।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৪]

আর প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলো:

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

"(লাভ-লোকসানের) ঝুঁকি বহনের শর্তেই মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়।" স্মর্তব্য যে, খবরে ওয়াহিদ বৈষয়িক বিষয় ও আইনগত বিষয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের মূলনীতি পরিপন্থী হলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। পক্ষান্তরে দ্বীনের বিচারে (নিরেট ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তা আমলযোগ্য হবে। যেমন মূলনীতি রয়েছে:

خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ لِلْعَمَلِ بِه فِيْ بَابِ الدِّيْنِ.

"দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ আমলের জন্য দলিল হবে।"

বলা বাহুল্য, এটি নির্দিষ্ট মাজহাবকেন্দ্রিক মূলনীতি, যার ভিত্তিতে হানাফিগণ 'মুসার্‌রাত'-সংক্রান্ত হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে হাদিসটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আমলযোগ্য হবে। হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مَنِ اشْتَـرٰى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنَ التَّمَرِ.

"যদি কেউ (দুধ জমিয়ে) স্তন ফুলানো পশু ক্রয় করে, তবে তার জন্য (ক্রয় বাতিল করার) স্বাধীনতা আছে। সে চাইলে দুধ দোহনের পর তা ফেরত দিতে পারবে। তবে তাকে এর সাথে এক সা খেজুরও দিতে হবে।"[২]

---

[১] ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৪৯৯; দাবুসি, তাসিসুন নাজার, পৃ. ১৫৬।

[২] তিরমিজি, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৫৫৩।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

"(লাভ-লোকসানের) ঝুঁকি বহনের শর্তেই মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়।"[১] হাদিসের অন্য সূত্রে আছে– "জনৈক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে, যা তার নিকট কিছুদিন অবস্থানের পর তার মধ্যে কিছু ত্রুটি দেখা দেয়। তখন সে ব্যক্তি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট মামলাটি নিয়ে উপস্থিত হয়। এ সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রীতদাসকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেন। তখন বিক্রেতা বলে ওঠে– ইয়া রাসুলুল্লাহ, এ ব্যক্তি তো আমার ক্রীতদাস দ্বারা লাভবান হয়েছে। প্রত্যুত্তরে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– "(বস্তুর) মুনাফা সে পাবে, যে তার রক্ষণাবেক্ষণের ঝুঁকি বহন করেছিলো।" উল্লেখ্য, হানাফিদের এই বক্তব্য (খবরে ওয়াহিদ শরিয়তের সামগ্রিক মূলনীতি পরিপন্থী হলে, তা গ্রহণ করা হবে না) আইনগত বিচারে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে 'দিয়ানাত' বা ধর্মীয় বিচারে (নিরেট ইবাদতের উদ্দেশ্যে) শরিয়তের সামগ্রিক মূলনীতিবিরোধী খবরে ওয়াহিদ মতে আমল করা যাবে। (অর্থাৎ, বিচারক এই ধরনের খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে ফায়সালা দিতে পারবে না, তবে কেউ ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে তা অনুযায়ী আমল করতে পারবে।)

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৪০, পৃ. ২৭২, হা. ২৪২২৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৫৪, হা. ২২৪৩; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৮৪, হা. ৩৫০৮-৩৫১০; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৫৭২-৫৭৩, হা. ১২৮৫-১২৮৬; নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, হা. ৪৪৯০; ইবনু হিব্বান, আল-মুসনাদ আস-সহিহ, খ. ১১, পৃ. ২৯৮, হা. ৪৯২৭।

القاعدة الثانية: خَطَأُ الْقَاضِيْ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ، أَيْ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ عَلَيْهِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

বিচারকের (রায় প্রদানে) ভুল হলে, এর ক্ষতিপূরণ 'বায়তুল মাল' (ইসলামি রাষ্ট্রীয় কোষাগার) বহন করবে। অর্থাৎ, বিচারকের ওপর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বর্তাবে না[১]

বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি বিচারকার্যসংশ্লিষ্ট অতীব গুরুত্ববহ মূলনীতি। কারণ, শাসক ও বিচারককে বিভিন্ন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তকরণে এর অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। ইমাম জামাল উদ্দিন আল-হুসাইরি (রা.) বলেন– "বিচারকের রায় প্রদানে কোনো ভুল হলে, তাকে এর ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। কারণ, অন্যের স্বার্থে কাজ সম্পাদনের জন্য তাকে শরিয়তের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিকে বিচারকার্যে ত্রুটিমুক্ত থাকা অসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার আবার অন্যদিকে কোনো ত্রুটি হলেই যদি ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়, তবে বিচারকের পদ মানুষের চক্ষুশূলে পর্যবসিত হবে। ফলে এ পদ গ্রহণ থেকে মানুষ নিবৃত্ত থাকবে। তখন বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও জনস্বার্থ রক্ষাকরণ বাধাগ্রস্ত হবে এবং সর্বোপরি শরিয়তের হক প্রতিষ্ঠার মতো গুরুদায়িত্ব অকার্যকর হয়ে পড়বে। অতএব বিচারকের কাঁধে ক্ষতিপূরণের দায়ভার না বর্তালে, সঙ্গত কারণে যার স্বার্থে ফায়সালা দিয়েছিলো তার কাঁধে আসতে হবে। কারণ, তার পক্ষে হয়ে-ই তো বিচারক উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদন করেছিলো। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে (অর্থসংশ্লিষ্ট) যেসব দায়িত্ব উকিলের জিম্মায় বর্তায়, তা সে মক্কেল বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ফেরত পায়। তবে বিচারকার্য যেহেতু (নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে) সাধারণ জনগণের স্বার্থেই পরিচালিত হয়, তাই এক্ষেত্রে যা কিছু ক্ষতি ঘটবে সব-ই বায়তুল মাল বহন করবে। কারণ, বায়তুল মালের সম্পদ জনগণের সম্পদ।[২]

---

[১] মাহমুদ আফেন্দি হামজা, আল-ফারায়িদুল বাহিয়্যাহ ফিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৩১৯।

[২] জামাল উদ্দিন আল-হুসাইরি, আত-তাহরির শরহুল জামি আল-কাবির; আলি আহমদ নদভি, আল-কাওয়াইদ ওয়াজ-জাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ আল-ওয়ারিদা ফিত তাহরির শরহিল জামি আল-কাবির, পৃ. ২০৫।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

যে হাদিসের মাধ্যমে উপর্যুক্ত মূলনীতিটি সাব্যস্ত করা যায়, তা হলো– রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন–

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"যদি বিচারক বিচার করতে গিয়ে (সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে) ইজতিহাদ (চিন্তা-গবেষণা) করেন, অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হলে, তাহলে তিনি দুটি পুণ্যের অধিকারী হবেন। আর যদি বিচারক বিচার করতে গিয়ে (সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে) ইজতিহাদ করেন, অতঃপর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহলে তিনি একটি পুণ্যের অধিকারী হবেন।"[১]

হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয় যে, শাসক বা বিচারকের রায় প্রদানে ভুল হলে, তাদেরকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে না। ইমাম ইজ্জুদ্দিন বিরচিত '*কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম*' শীর্ষক গ্রন্থে এই মূলনীতি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে।

সেই গ্রন্থ থেকে নিম্নে দুটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যেখানে বক্ষ্যমাণ মূলনীতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

(১) জনগণের কাজ করতে গিয়ে ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) বা বিচারক কর্তৃক (ভুল সিদ্ধান্তের কারণে) কারো জান-মালের ক্ষতি হলে, এর দায়ভার বায়তুল মালের ওপর বর্তাবে; ইমাম বা বিচারক উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না। কারণ, তারা মুসলিম জনসাধারণের কাজে নিয়োজিত বিধায় তাদের ভুল-ত্রুটিকে জনগণের ভুল-ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তদুপরি, বিচারকার্যে ভুল সিদ্ধান্তের দায়ভার বিচারকের ওপর বর্তালে, সে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারণ, বিচারকার্যে ভুল সিদ্ধান্তের ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে।

(২) কোনো সম্পদে মালিকের অনুমতি ব্যতীত প্রভাব খাটানো ক্ষতিপূরণযোগ্য অপরাধ। তবে কোনো বিচারক বা তার প্রতিনিধির ক্ষেত্রে এমন বিধান অপ্রযোজ্য। এমনকি বিচারক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক কারো সম্পদে হস্তক্ষেপ করাটা বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল প্রমাণিত হলেও, তথাপি তাদের ওপর কোনো দায়ভার বর্তাবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা তাদের জন্য এতোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে যে, তারা মানুষের সম্পদ দেখাশুনার দায়ভার গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।[২]

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪২, হা. ১৭১৬, আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] ইবনু আব্দুস সালাম, কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম, খ. ২, পৃ. ১৯৪-১৯৬।

القاعدة الثالثة: اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

তৃতীয় মূলনীতি

(লাভ-লোকসানের) ঝুঁকি বহনের শর্তেই মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়[১]

মূলনীতির ভাবার্থ:

মানুষের মালিকানা থেকে যে আয় বা ফসল উৎপন্ন হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। যেমন– জমির ফসল, প্রাণির দুধ বা বাচ্চা, জমির ভাড়া ইত্যাদি। ইবনু নুজাইম (রহ.) তার *'আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর'* নামক গ্রন্থে বলেন– "কোনো বস্তু থেকে যা কিছু বের হয়, তাকে ঐ বস্তুর 'খারাজ' বলে। সুতরাং গাছ থেকে উৎপন্ন ফলমূল হলো এর খারাজ, প্রাণী থেকে সৃষ্ট দুধ ও জন্মানো সন্তান হলো এর খারাজ। মোটকথা, বস্তু থেকে যে মুনাফা ও লাভ অর্জিত হয় তা-ই তার খারাজ। আর 'জামান' শব্দের অর্থ হলো– ব্যয়ভার বা ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। যেমন– পশুর দেখাশোনা ও জমি আবাদের ব্যয়ভার গ্রহণ।"

ড. আলি আহমদ নদভি তাঁর *'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ'* শীর্ষক গ্রন্থে আল্লামা জারকাশির সূত্রে বলেন– "বিক্রীত পণ্য থেকে যে সম্পদ, মুনাফা, ফসল উৎপন্ন হবে, সব-ই ক্রেতার মালিকানাধীন ধর্তব্য হবে, যেহেতু সে উক্ত পণ্যের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেছে। তদুপরি, বিক্রীত পণ্য নষ্ট হলে তো এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হতো। সুতরাং এর লাভও সে ভোগ করবে।" কারণ, মূলনীতি হলো– "লোকসানের ঝুঁকি বহনের ভিত্তিতেই মুনাফা নির্ধারিত হবে।"[২]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

মূলত বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসেরই ভাষ্য। তিনি ইরশাদ করেন–

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৬, ধারা. ৮৫, ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১৭৫, সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১৩৫।

[২] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৬, ধারা. ৮৭।

"(লাভ-লোকসানের) ঝুঁকি বহনের শর্তেই মুনাফা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়।" হাদিসের অন্য সূত্রে আছে– "জনৈক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে, যা তার নিকট কিছুদিন অবস্থানের পর তার মধ্যে কিছু ত্রুটি দেখা দেয়। তখন সে ব্যক্তি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট মামলাটি নিয়ে উপস্থিত হয়। এসময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রীতদাসকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেন। তখন বিক্রেতা বলে ওঠে– ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ ব্যক্তি তো আমার ক্রীতদাস দ্বারা লাভবান হয়েছে। প্রত্যুত্তরে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– "মুনাফা সে পাবে, যে তার রক্ষণাবেক্ষণের ঝুঁকি বহন করেছিলো।"[১]

মুহাম্মদ তাহির আল-আতাসির ভাষায় হাদিসের মূলভাব হলো–
"যে বস্তুর ব্যয়ভার মানুষের দায়িত্বে থাকে, সে বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে এর দায়ভারও তার ওপর বর্তাবে। বলা হয়: "إِنَّه فِيْ ضَمَانِه"- অর্থাৎ, এর দায়ভার তার জিম্মায় অন্তর্ভুক্ত হবে। অপরদিকে সেই বস্তুর যাবতীয় মুনাফাও তার জন্য নির্ধারিত থাকবে, চাই সে সরাসরি এর থেকে লাভ ভোগ করুক কিংবা এর থেকে ফসল লাভ করে মুনাফা ভোগ করুক।"

মূলনীতিসংশ্লিষ্ট উদাহরণ:

(১) ক্রেতা 'খিয়ারুল আইব' (ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেয়ার এখতিয়ার)-এর ভিত্তিতে কোনো গাড়ি প্রত্যর্পণ করলে, তখন ইতোপূর্বে কিছু কালের জন্য তা ব্যবহার করে থাকলেও এর ভাড়া তাকে আদায় করতে হবে না। কেননা, প্রত্যর্পণের পূর্বে গাড়িটি নষ্ট হলে, তা তার সম্পদ থেকে নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হতো। মোটকথা, কেউ কোনো জিনিসের দায়ভার ও ঝুঁকি গ্রহণ করলে, এর যাবতীয় মুনাফা যে দায়ভার ও ঝুঁকি বহন করেছে তারই মালিকানাভুক্ত থাকবে। জ্ঞাতব্য যে, ক্রেতা ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যদি বিক্রীত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন আর পণ্য প্রত্যর্পণের এখতিয়ার বাকি থাকবে না।

(২) জনৈক ব্যক্তি কোনো পশু ক্রয় করে তা নিজ কাজে ব্যবহার করে। কিছুদিন পর উক্ত পশুর মাঝে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে, ক্রেতা তা ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফিরিয়ে নিতে পারবে। অপরদিকে বিক্রেতা পশু বৈ অন্য কিছু ফেরত পাবে না।

---

[১] خاء (খা) অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রথম মূলনীতিতে হাদিসের রেফারেন্স অতিবাহিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

دال/দাল দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ২টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: دَلَالَةُ الْعَامِّ عَلٰى أَفْرَادِه قَطْعِيَّةٌ عِنْدَ الْأَحْنَافِ.

প্রথম মূলনীতি

হানাফি স্কলারদের মতে 'আম' (ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ)-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য হয়

উপর্যুক্ত মূলনীতিটি মতবিরোধপূর্ণ একটি উসুলি (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্রীয়) মূলনীতি। মূলত মূলনীতিটির ব্যাপারে উসুলবিদদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গের কারণে এই মতবিরোধ জন্ম নিয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মতো করে মূলনীতির সাথে বিভিন্ন বিশেষণ ও শর্ত যুক্ত করেছেন। এতে করে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আলোচ্য মূলনীতিটি নিঃশর্ত বা বিশেষণমুক্ত উসুলি মূলনীতি নয়।

জ্ঞাতব্য যে, এটি নিছক নামমাত্র উসুলি মূলনীতি নয়; বরং ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্র) বিভিন্ন উপজাত বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই মূলনীতির আলোকেই ইসলামি আইনবিদগণ এই বিধি-বিধানসমূহ শরিয়তের বিস্তারিত দলিলাদি থেকে আহরণ করেছেন।

হানাফি ওলামায়ে কিরামের মতে, 'আম'-এর নির্দেশনা তার অধীন সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য হবে। সুতরাং শুধুমাত্র ধারণানির্ভর দলিল, যেমন 'খবরে ওয়াহিদ' (এককসূত্রে বর্ণিত হাদিস) ও 'কিয়াস' (ইসলামি আইনবিদের ব্যক্তিগত গবেষণবপ্রসূত সিদ্ধান্ত) দিয়ে 'আম'-কে تخصيص বা নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়।

কারণ, কুরআন ও 'সুন্নাহ মুতাওয়াতিরা' (নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় বর্ণিত সুন্নাহ)-এর মধ্যে বর্ণিত 'আম' (ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ) قطعي الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ/Proven Authentically) ও قطعي الدلالة (অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যসমৃদ্ধ/Definitive in Meaning) হয়। আর এ পর্যায়ের শব্দকে খাস বা নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, সাধারণ 'আম' অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হলো- ভাষার মৌলিক ব্যবহার রীতি, যেখানে শব্দ গঠনগত দিক থেকে অকট্যভাবে তার অর্থ নির্দেশ করে। আর 'আম' যেহেতু ব্যাপকতা নির্দেশের জন্য গঠিত, তাই তা তার অধীন সকল বিষয়কে ব্যাপকভাবে নির্দেশের ক্ষেত্রে অকাট্য হবে।[১] তাই প্রমাণ-লক্ষণ

---

[১] আলাউদ্দিন আল-বুখারি, কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাভি, খ. ১, পৃ. ৩০৫; মুহাম্মদ আল-খুজারি, উসুলুল ফিকহ, পৃ. ১৫৫।

ছাড়া 'আম'-এর অন্তর্গত কিছু বিষয়কে যদি নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে ভাষা তার আস্থা ও নিরাপত্তা হারাতে বসবে। কারণ, আরবি ভাষায় যতোগুলো ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ রয়েছে, সব-ই নির্দিষ্টতার সম্ভাবনা রাখে। এমতাবস্থায় 'আম' শব্দাসমূহ শোনার পর শ্রোতার পক্ষে শরিয়ত কর্তৃক তা ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য জানাটা সম্ভব হবে না। তাছাড়া শরিয়তের অধিকাংশ বক্তব্য ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এখন কোনো প্রমাণ-লক্ষণ ছাড়া 'আম'কে তার কতিপয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলে, তখন 'আম'-এর মাধ্যমে আসা শরিয়তের বক্তব্য বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

হানাফিগণ তাদের বক্তব্যের সমর্থনে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) সম্পর্কে ওমর (রা.)-এর বক্তব্যটি উল্লেখ করে থাকেন। বর্ণিত আছে, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেন যে, (স্বামী কর্তৃক তিন তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বাসস্থান ও খোরপোষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেননি। এ কথা শুনে ওমর (রা.) বলেন– "আমরা একজন মহিলার কথায় আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে হয়তো হাদিসটি মুখস্ত রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে। কেননা, সে বাসস্থান ও খোরপোষ দুটিই পাবে।"[২] ইসলামি নীতিশাস্ত্রবিদরা বলেন– ওমর (রা.) তার (ফাতিমা বিনতে কায়েস) বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করেননি:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস করো তাদেরকেও অনুরূপ ঘরে বাস করতে দেবে।" [সুরা আত-তালাক, আয়াত: ৬]

---

[১] মাহবুবি, শরহুত তালভিহ আলাত-তাওজিহ, খ. ১, পৃ. ৪০।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ১১১৮, হা. ১৪৮০।

القاعدة الثانية: دَلَالَةُ الْعَامِّ عَلٰى أَفْرَادِه ظَنِّيَّةٌ عِنْدَ الشَّوَافِعِ وَالْحَنَابِلَةِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

শাফেয়ি ও হাম্বালি স্কলারদের মতে 'আম' (ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ)-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য ধারণানির্ভর হয়

অধিকাংশ ইমামগণের অভিমত হলো– 'আম'-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য ধারণাগত হয়।[১] তাঁদের মতে 'খবরে ওয়াহিদ' (একক সূত্রে বর্ণিত হাদিস) ও 'কিয়াস' (ইসলামি আইনবিদের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত)-এর মতো دليل ظني (ধারণানির্ভর দলিল/Speculative Source-Proof) দিয়ে 'আম'-এর ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করা যাবে। সুতরাং সাধারণ 'আম' দ্বারা সাব্যস্ত বিধানটি তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে ধারণার ভিত্তিতে; অকাট্যভাবে নয়। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো– যেখানে সম্ভাবনা বিদ্যমান সেখানে সুনিশ্চিতরূপে কোনো বিধান সাব্যস্ত করা যায় না। বিশেষ করে কুরআন-সুন্নাহ্য় বর্ণিত অধিকাংশ ব্যাপকতজ্ঞাপক বক্তব্যকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমনকি তাঁরা এ কথাও বলেন যে, এমন কোনো 'আম'-এর সন্ধান পাওয়া যাবে না যার অন্তর্গত কিছু বিষয়কে তার ব্যাপকতা থেকে নির্দিষ্ট করে বের করা হয়নি।

মূলনীতির দালিলিক ভিত্তি:

শাফেয়ি ও হাম্বালি ওলামায়ে কিরাম তাঁদের উপর্যুক্ত মতের সমর্থনে বলেন, কুরআনে বর্ণিত 'আম' বক্তব্যকে 'খবরে ওয়াহিদ'-এর সাহায্যে সুনির্দিষ্টকরণের বৈধতার ওপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, 'আম'-এর ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করার রীতি তাঁদের মাঝে প্রচলিত ছিলো। এক্ষেত্রে কারো কোনো আপত্তি পরিলক্ষিত না হওয়া তাঁদের ঐকমত্যের প্রমাণ বহন করে।

---

[১] আবু জুহরা, উসুলুল ফিকহ, পৃ. ১৫৮।

যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾

"উল্লিখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে (বিয়ে করা) তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৪]

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাপকতাকে সাহাবায়ে কিরাম আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا.

"কোনো স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে বা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।"[১]

একইভাবে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হস্ত কেটে দাও।" [সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৮]

সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের ব্যাপক বিধান থেকে নিম্নোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে নেসাব পরিমাণে না পৌছা সম্পদ চুরির বিধান নির্দিষ্ট করে বের করে দিয়েছেন।

لَا قَطْعَ إِلَّا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

স্বর্ণমুদ্রার (দীনার) এক চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক পরিমাণ মূল্যের সম্পদ (চুরি করা) ব্যতীত (চোরের হাত) কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হবে না।[২]

বক্ষ্যমাণ মূলনীতি থেকে উদ্ভূত কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ হলো। মূলনীতির আমলযোগ্যতার ব্যাপারে ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতার প্রভাব আগত মাসআলাসমূহে স্পষ্টাকারে পরিলক্ষিত হয়।

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ১০২৯, হা. ১৪০৮।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৮, পৃ. ১৬০, হা. ৬৭৮৯-৬৭৯০; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩১২-১৩১৩, হা. ১৬৮৪, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহর নাম উচ্চারণ ব্যতীত জবাইকৃত জন্তুর বিধান:

হানাফিগণ তাঁদের মূলনীতি ('আম'-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য হয়) অনুসারে এ মত পোষণ করেন যে- ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে কোনো প্রাণী জবাই করা হলে, তা খাওয়া বৈধ হবে না। কারণ, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ﴾

"আর যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেয়ো না; এবং নিশ্চয়ই তা গর্হিত।" [সুরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১]

আয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো- আল্লাহর নাম উচ্চারণ ব্যতীত যে জন্তু জবাই করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম- চাই জবাইকারী মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, চাই আল্লাহর নাম বাদ দেয়া ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। তাঁদের এ মতের ভিত্তি হলো তাঁদেরই পূর্বোল্লিখিত উসুলি মূলনীতি: 'আম'-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ি ও এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের অভিমত হলো- জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেয়া হলো সুন্নত। কাজেই ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে কোনো প্রাণী জবাই করা হলে, তা খাওয়া বৈধ হবে। তাঁদের বক্তব্য হলো- এই আয়াতের ব্যাপকতাকে বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বিশেষিত করার সুযোগ রয়েছে।

কারণ, তাঁদের নিকট স্বীকৃত উসুলি মূলনীতি হলো- 'আম'-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য ধারণানির্ভর হয়। কাজেই উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাপক বক্তব্যকে ধারণানির্ভর দলিল দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাবে।

হারাম শরিফে আশ্রয়গ্রহণ (শরিয়তের দৃষ্টিতে) হত্যাযোগ্য ব্যক্তির জানের নিরাপত্তা প্রদান করে কি-না:

হানাফি ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে (প্রাণহানির মতো গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ায়) হত্যাযোগ্য ব্যক্তি হারাম এলাকায় প্রবেশ করলে তার কাছ থেকে তথায় কিসাস (Just Retribution) গ্রহণ করা হবে না; বরং প্রয়োজনের তাগিদে তার বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। যখনই সে হারাম এলাকা অতিক্রম করবে, তার ওপর কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা হবে। অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তার এহেন সাময়িক নিরাপত্তা প্রাপ্তির কারণ হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকতা–

﴿ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾

"যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।" [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

অপরদিকে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কুরআনের এই বক্তব্যের ব্যাপকতাকে কিয়াসের সাহায্যে নির্দিষ্ট করেন। কারণ, 'আম'-এর নির্দেশনা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য ধারণাগত হয়।

নবম অধ্যায়

ر/রা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ২টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: رَدُّ الْحَدِيْثِ لِإِنْكَارِ الرَّاوِيْ لَه أَوْ لِعَمَلِه بِخِلَافِه.

প্রথম মূলনীতি

বর্ণনাকারী নিজের বর্ণনা অস্বীকার করলে কিংবা বর্ণিত হাদিসের বিপরীত কার্যকলাপে জড়িত হলে, তাঁর বর্ণিত হাদিসটির ওপর আমল করা হবে না[১]

শায়খ আবুল হাসান আল-কারখি (রহ.), একদল হানাফি আইনশাস্ত্রবিদগণ ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ মূলনীতি সমর্থন করেছেন। যদি বর্ণনাকারী কর্তৃক নিজ বর্ণিত হাদিসের অস্বীকার দ্বিধাগ্রস্ততার সাথে হয়ে থাকে- যেমন তিনি বলেন যে, এ হাদিস আমি বর্ণনা করেছি কি-না আমার মনে পড়ছে না; তাহলে হাদিসটির ওপর আমল করা হবে না; বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। ইমাম শাফেয়ি ও মালিক (রহ.) বলেন, রাবি (বর্ণনাকারী) সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হলে মূল হাদিস বর্ণনাকারী অস্বীকার করা সত্ত্বেও শাখা রাবির বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। মূল বর্ণনাকারী হাদিস অস্বীকার করার পরও শাখা রাবির বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) তার প্রমাণ জুল-ইয়াদাইনের হাদিস। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে তাঁর কথা গ্রহণ করেননি। জুল-ইয়াদাইন বলেছিলেন– "হে আল্লাহর রাসুল! নামাজ কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে নাকি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন?" তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কথা অস্বীকার করে বলেছিলেন– كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ "কোনোটিই হয়নি।" তিনি (জুল-ইয়াদাইন) আবার বললেন– "কোনো একটি তো অবশ্যই হয়েছে।" এবার ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ؟ "জুল-ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্য?" তাঁরা উভয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"[২] তাঁদের উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে রাসুল (সা.) নিজের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।

মুহাদ্দিসগণের মাঝেও এমন হাদিস অস্বীকার না করে গ্রহণ করার রীতি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন সুহাইল ইবনু আবু সালিহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

---

[১] সারাখসি, আল-উসুল, খ. ২, পৃ. ৩।

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪, হা. ১২১৪-১২১৫।

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلـَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضـَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ.

"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন সাক্ষী এবং শপথের ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন।"[১]

এ হাদিসটি সুহাইল থেকে রবিআ বর্ণনা করেছেন। পরে সুহাইল রবিআকে বললেন, আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছি কি-না স্মরণ করতে পারছি না। কারণ, তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই সুহাইল পরবর্তীতে যখনই এ হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন, "এ হাদিস রবিআ আমার কাছ থেকে বর্ণনা করেছে। আমি আমার পিতার সূত্রে তাকে বর্ণনা করেছি।"[২]

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে নিম্নোল্লিখিত মাসআলাসমূহে ফিকহ স্কলারদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে:

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সম্পত্তি বিষয়ক মামলার ফায়সালা দেয়া, কুকুরের মুখ লাগানো পাত্র ধোয়ার পদ্ধতি, বড়ো হয়ে দুধ পানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হবে কি-না এবং স্বামীর সহবাসের কারণে স্ত্রীর স্তনে সৃষ্ট দুধের বিধান প্রভৃতি।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

উপর্যুক্ত মূলনীতি তথা 'মূল রাবি (বর্ণনাকারী)-এর অস্বীকারের কারণে শাখা রাবির বর্ণনাকেও নাকচ করা হবে' তার প্রামাণ্যসূত্র হাদিস হলো হজরত ওমর (রা.) কর্তৃক আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-এর বর্ণনাকে অস্বীকার করার হাদিস। হাদিসটি এমন, একবার হজরত আম্মার (রা.) হজরত ওমর (রা)-কে বললেন–

أَمَا تَذْكُرُ؟ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِيْ التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلـَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ." فَقَالَ عُمَرُ: اِتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ! قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.

আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোনো এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমরা দুজনই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। আর কোথাও পানি পেলাম না। তখন আপনি নামাজ আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামাজ আদায় করলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ঘটনা অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ.৭৯৩, হা. ২৩৬৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩০৯, হা. ৩৬১০; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২০, হা. ১৩৪৩।

[২] আবুস সানা আল-আসবাহানি, বায়ানুল মুখতাসার শরহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব, খ.১, পৃ.৭৩৯।

যে, তুমি দু'হাত জমিনে মারতে। তারপর ফুঁ দিয়ে আলগা ধূলি ফেলে দিতে। এরপর উভয় হাতের কবজি দ্বারা তোমার চেহারা ও দু'হাত মাসেহ করতে।"

তখন ওমর (রা.) বললেন,"আম্মার, আল্লাহকে ভয় করো।" আম্মার (রা.) বললেন, "আপনি চাইলে আমি এ হাদিস আর বর্ণনা করবো না।"[১]

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হজরত আম্মার (রা.) একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবি হওয়ার পরেও হজরত ওমর (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদিসটি গ্রহণ করেননি। তিনি (ওমর) স্বীয় মতের ওপর অটল থেকে গেলেন। তাঁর মত ছিল, জুনুবি (এমন অপবিত্র ব্যক্তি যার ওপর গোসল ফরজ) পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে না; বরং পানির জন্য অপেক্ষা করবে। এখান থেকে প্রতিপন্ন হয়, হাদিসের মূল বর্ণনাকারী নিজ বর্ণিত হাদিস অস্বীকার করলে সে হাদিসের শাখা রাবির বর্ণনাও গ্রহণ করা হবে না।[২]

রাবি (বর্ণনাকারী) নিজের বর্ণিত রেওয়ায়েত (বর্ণনা) অস্বীকার করলে রেওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য থাকবে কি-না সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে যে মতানৈক্য রয়েছে, ঠিক একইরকম মতানৈক্য রাবি হাদিস রেওয়ায়েত করার পর তার বিপরীত আমল করলে তা গ্রহণ করার ব্যাপারেও রয়েছে। মতানৈক্য হচ্ছে, রাবি হাদিস বর্ণনা করার পর সে হাদিসের বিপরীত আমল করলে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য হবে কি-না সে বিষয়ে। কিন্তু রাবি যদি হাদিস বর্ণনার আগে হাদিসটির বিপরীত আমল করে থাকেন, তাহলে সে হাদিস সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, হতে পারে রাবি হাদিসটি জানার পর তার পূবের্র অবস্থান থেকে ফিরে এসেছেন।

ওপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত মূলনীতির[৩] ওপর ভিত্তি করে ইসলামি আইনবিদদের মাঝে কতিপয় মাসআলার ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের একটি হলো, 'অলি' বা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

ইসলামি আইনবিদদের এক বিরাট দলের (জুমহুর) মতামত হলো, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হবে না। তাঁরা হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেন।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২৮০ হা. ৩৬৮।

[২] দেখুন : আলা উদ্দিন আল-বুখারি, কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাভি, খ. ৩, পৃ. ৬১

[৩] রাবি তার বর্ণিত হাদিস অস্বীকার করলে অথবা সেই হাদিসের বিরুদ্ধে আমল করলে, হাদীসটি মতে আমল করা হবে না।

"কোনো মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে, বাতিল বলে গণ্য হবে, বাতিল বলে গণ্য হবে।"[১]

আর অধিকাংশ হানাফি স্কলারদের মতামত হলো- অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। তারা নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেখানে নবিজি বলেছেন–

اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

"প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক হতে বেশি কর্তৃত্বশীল।"[২]

তাঁরা উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিসকে আমলে নেননি। কারণ, হজরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং নিজের বর্ণিত হাদিসের বিপরীত আমল করেছেন।

তিনি তাঁর ভাতিজি হাফসা বিনতে আব্দুর রহমানকে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুনজির ইবনু জুবাইরের সাথে শাদি দিয়েছিলেন। তখন হাফসার বাবা আব্দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন না।

উল্লিখিত মূলনীতির দুটি দিক রয়েছে। প্রথম: রাবি (বর্ণনাকারী) নিজের বর্ণিত হাদিস অস্বীকার করা। দ্বিতীয়: রাবি নিজের বর্ণনার বিপরীত আমল করা। হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি মূলনীতির দুটো দিক বিবেচনায়-ই অগ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ রাবি নিজের বর্ণনার বিপরীত আমল করার ব্যাপারে তো একটু আগে আলোচনা হয়েছে। হজরত আয়েশা নিজ বর্ণনার বিপরীত আমল করেছেন। প্রথম দিক অর্থাৎ রাবি নিজের বর্ণনাকে অস্বীকার করার বিষয়টিও হজরত আয়েশার হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন ইবনু জুরাইজ বলেন, "এরপর আমি জুহরিকে (তিনি উরওয়া থেকে, উরওয়া আয়েশা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হাদিসটি অস্বীকার করলেন।"[৩]

উক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আরেকটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা হলো– 'কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়ার পদ্ধতি কী হবে?'

ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)– এদের তিনজনের মতামত হলো, কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র পবিত্র করতে হলে সাতবার ধৌত করতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদিস দিয়ে তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন। যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ.৪২, পৃ. ১৯৯, হা. ২৫৩২৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬০৫, হা. ১৮৭৯; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ২২৯, হা. ২০৮৩; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩৯৮, হা. ১১০২।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ১০৩৭ হা. ১৪২১, ইবনু আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত।

[৩] শাওকানি, নায়লুল আউতার, খ. ৬, পৃ. ১৪২।

"তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে পাত্রের বস্তু ফেলে দিয়ে পাত্রটি সাতবার ধুয়ে নেবে।"

কিন্তু হানাফি ইমামগণ শিরোনামে উল্লিখিত তাঁদের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে হজরত আবু হুরায়রার সাতবার ধৌত করার হাদিসকে আমলে নেননি। কারণ, রাবি থেকে এ হাদিসের বিপরীত আমল পাওয়া গিয়েছে। যেমনটি ইমাম তাহাভি ও দারাকুতনি (রহ.) বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি মাওকুফ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়। সেখানে আছে–

أَنَّه يَغْسِلُ مِنْ وُلُوْغِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"তিনি (আবু হুরায়রা রা.) কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধৌত করতেন।"[১]

উক্ত মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় অর্থাৎ, বর্ণনাকারী নিজ বর্ণনার বিপরীত আমল করেছেন, সেরকম আরেকটি মাসআলা হলো– 'স্বামীর সহবাসের কারণে স্ত্রীর স্তনে সৃষ্ট দুধের বিধান কী হবে?' অর্থাৎ, কোনো মেয়ে শিশু যদি কোনো মহিলার দুধ পান করে, তার জন্য ঐ মহিলার স্বামী এবং স্বামীর বাপ-দাদা ও আগের ঘরের সন্তানরা হারাম হয়ে যাবে? নাকি হারাম হওয়াটা শুধুমাত্র স্তন্যদানকারিনী মহিলার সন্তান ও তার আত্মীয়দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে?

সংখ্যাগুরু ইসলামি আইনবিদদের মতে, স্বামীর সহবাসের কারণে স্ত্রীর স্তনে সৃষ্ট দুধ পানকারীনী কন্যা শিশু উক্ত স্ত্রীর স্বামীর জন্য ও তার (স্বামীর) বাপ-দাদা ও আগের ঘরের সন্তানদের জন্যেও হারাম হয়ে যাবে। তাঁরা হজরত আয়েশা (রা.)-এর একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন।

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِيْ الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَه، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلـَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُه بِالَّذِيْ صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آذَنَ لَه.

"পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আয়েশা (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় চাচা 'আফলাহ'–যিনি আবুল কুআয়সের (আয়েশার দুধ-পিতা) ভাই তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এলেন; আমি যা করেছি সে সম্পর্কে তাঁকে জানালাম। তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন।"[২] এ হাদিসে আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় হলো– হজরত আয়েশা (রা.) থেকে নিজ বর্ণনার বিপরীত আমল পাওয়া গেছে। (কারণ, বর্ণিত আছে– তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীরা যাদের দুধ পান করাতো অর্থাৎ, দুধ সম্পর্কীয় ভাতিজাদের জন্য তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি ছিলো না। প্রতীয়মান হয়– তিনি স্বামীর সহবাসের কারণে স্ত্রীর স্তনে সৃষ্ট দুধকে বিবাহ নিষিদ্ধকারী কারণরূপে মনে করতেন না।)

---

[১] শাওকানি, নায়লুল আউতার, খ. ১, পৃ. ৫১

[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ. ৭, পৃ. ১০ হা. ৫১০৩; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১০৬৯, হা. ১৪৪৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬২৭, হা. ১৯৪৮।

القاعدة الثانية: اَلْأَصْلُ أَنَّ الرُّخَصَ تُرَاعٰى فِيْهَا شَرَائِطُهَا الَّتِيْ وَقَعَتْ لَهَا الْإِبَاحَةُ، فَمَهْمَا أُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَادَ الْأَمْرُ إِلى التَّحْرِيْمِ الْأَصْلِيِّ، وَهٰذَا بَابٌ كَبِيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

মূলনীতি হলো, যেসব শর্তের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে বৈধতার রুখসাত[১] প্রদান করা হয়, সেসব শর্তের কোনো একটি লঙ্ঘিত হলে হারামের মৌলিক বিধানটি আবারও ফিরে আসবে। এটি জ্ঞানের একটি বড়ো অধ্যায়

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِيْ مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْ.

"তোমার শিকার পানিতে ডুবে মারা গেলে, তুমি তা খেয়ো না।"[২]

ইমাম খাত্তাবি (রহ.) উপর্যুক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় এ মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এই হাদিস আলোচ্য মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র।

খাত্তাবির কথার মর্মবাণী হলো– তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিকার পানিতে পাওয়া গেলে তা খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কুকুরের হত্যার কারণে নয়; পানি তাকে ডুবিয়ে নেয়ার ফলে তা মারা যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। অনুরূপভাবে শিকারীর তীরের আঘাতের আলামত ব্যতীত শিকারের মধ্যে অন্য কোনো আলামত পাওয়া গেলে, সেটিও খাওয়া যাবে না।

মূলনীতি হলো, 'রুখসাত'(বিশেষ প্রয়োজনে শরিয়তের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সহজীকরণের বিধান)-এর ক্ষেত্রে রুখসাত বৈধ হওয়ার শর্তগুলো পুরোপুরি রক্ষা করতে হবে।'[৩]

---

[১] Permission, that indicates to an easy way in carrying on a 'Fard' or avoiding a 'Haram'.

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ১০৯, হা. ২৮৫০; বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, হা. ৫৪৮৪; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৫৩১, হা. ১৯২৯; তিরমিজি, আস-সুনান, হা. ১৪৬৯।

[৩] -খাত্তাবি, মাআলিমুস সুনান, খ. ৪, পৃ. ১২৫

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতসমূহ হারাম বলে গণ্য হবে, যদি জন্তুর জবাইকারী মুসলিম বা আহলে কিতাব না হয়। বরং, তার অবস্থা অজানা থাকে।

যে দেশ থেকে গোশত আমদানি করা হয়, যদি সেদেশের সকল বাসিন্দা বা অধিকাংশ অধিবাসীর অভ্যাস হয় যে, তারা শরিয়তের পদ্ধতিতে জন্তু জবাই করে থাকে এবং তারা মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব; তবে তাদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত আমাদের জন্য ভক্ষণ করা হালাল হবে। আর যদি তাদের অভ্যাস হয়ে থাকে, তারা শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায় জন্তু জবাই করে থাকে– যেমন শ্বাসরোধ করে কিংবা মাথায় আঘাত করে অথবা বৈদ্যুতিক শক দিয়ে জন্তু জবাই করা তাদের সচরাচর নিয়ম; তবে তাদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত হারাম হবে। আর যদি জবাইকারীদের অবস্থা অজ্ঞাত থাকে, তারা কোন পদ্ধতিতে জন্তু জবাই করে তা জানা না যায়; তাহলেও হারামের ঝুঁকি প্রবল হওয়ায় তা খাওয়া বৈধ হবে না।

দশম অধ্যায়

زاء/যা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

(এ অধ্যায়ের অধীনে ১টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة: الزِّيَادَةُ عَلٰى النَّصِّ تُعْتَبَرُ نَسْخًا عِنْدَ الْأَحْنَافِ، وَلَا تُعْتَبَرُ نَسْخًا عِنْدَ الْآخَرِيْنَ.

মূলনীতি: হানাফি বিশেষজ্ঞদের মতে, নসের (শরিয়তের বক্তব্যের) সাথে কিছু যোগ করা এর বিধান রহিত করার নামান্তর। অন্যান্য ইমামদের মতে, এমন যোগসাধন রহিতকরণ হিসেবে বিবেচিত নয়

নসের (শরিয়তের বক্তব্যের) সাথে অতিরিক্ত যোগসাধন হয়তো স্বতন্ত্র হবে অথবা হবে না। স্বতন্ত্র হয়ে হয়তো অসমগোত্রীয় হবে, যেমন– নামাজের ওপর জাকাতের আবশ্যকতাকে বৃদ্ধি করা। এরকম বর্ধিতকরণ সর্বসম্মতিক্রমে (নাসিখ) বিধান রহিতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে না। ওলামায়ে কিরাম এ মূলনীতির ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইবাদতের ওপর ইবাদতকে বৃদ্ধি করা হলে, তা ইবাদতের রহিতকারী সাব্যস্ত হবে না। অথবা যোগসাধন (স্বতন্ত্র হয়ে) সমগোত্রীয় হবে, যেমন– পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে আরেক ওয়াক্ত নামাজ যোগ করা। এরকম যোগসাধনও অধিকাংশ স্কলারের মতে বিধান রহিতকারী সাব্যস্ত হবে না। আর যদি শরিয়তের বক্তব্যের সাথে অতিরিক্ত যোগসাধনটা স্বতন্ত্র না হয়, যেমন– কোনো একটি অংশ বা একটি শর্ত বৃদ্ধি কিংবা মাফহুমে মুখালিফকে (কোনো শব্দ বা কথার বিপরীত মর্ম) দূর করে দেয় এমন কিছু বাড়ানো হয়; তবে এ ধরনের বৃদ্ধি বিধান রহিতকারী হিসেবে গণ্য হবে কি-না তা নিয়ে ইসলামি আইনবিদদের মতানৈক্য রয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনটি মতামত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: এ ধরনের বর্ধিতকরণ কোনোভাবেই বিধান রহিতকারী হিসেবে গণ্য হবে না। শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বালি ফকিহগণ (আইনবিদ) এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মত: এ ধরনের বর্ধিতকরণ বিধান রহিতকারী হিসেবে গণ্য হবে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসি (রহ.) তাঁর 'আল-উসুল' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 'আর চতুর্থ পদ্ধতি হলো –নসের (শরয়ি দলিল) ওপর বর্ধিতকরণ। আমাদের মতে, এটি (সুরাতান) বাহ্যদৃষ্টিতে দলিলের ব্যাখ্যা হলেও (মা'নান) অর্থগতভাবে দলিলের নাসখ

(রহিতকরণ)। চাই বৃদ্ধিটা সবব (বিধানের কারণ)-এর ক্ষেত্রে হোক বা সরাসরি বিধানের মধ্যেই হোক।"[১]

তৃতীয় মত: যার (নস/শরয়ি দলিল) ওপর বৃদ্ধি করা হয়েছে, তা যদি বৃদ্ধির মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত মর্মকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়; তাহলে নসের ওপর এমন বর্ধিতকরণ বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন–রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

فِيْ سَائِمَةِ غَنَمٍ زَكَاةٌ

"চরে বেড়ানো ছাগলের জাকাত আবশ্যক।"[২] এ হাদিস তার বিপরীত অর্থ গৃহপালিত ছাগলের জাকাতকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর যদি বর্ধিত অংশের মাধ্যমে কোনো কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা না হয়; তাহলে তা বিধান রহিতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

যেসব হাদিসে উপর্যুক্ত মূলনীতির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়, তার সংখ্যা অগণিত। আমরা এখানে শুধুমাত্র নির্বাচিত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করবো।

ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য স্কলাররা বলেছেন– 'নস-এর ওপর বর্ধিতকরণটা যদি স্বতন্ত্র না হয়, তাহলে তা কোনোভাবেই রহিতকরণ হিসেবে গণ্য হবে না।' এ মূলনীতির নিরিখে তারা ওজুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওজুর ফরজ কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগত বাণী থেকে তাদের এ মত গ্রহণ করেছেন। যেখানে রাসুল (সা.) বলেছেন–

اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِه

"তোমরা আরম্ভ করো ঐ স্থান থেকে যার কথা আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন।"[৩] হাদিসের অংশটুকু যদিও হজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তথাপি কথাটি ব্যাপক। ওজুও তাতে শামিল রয়েছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ব্যতীত কখনো ওজু করেননি। যদি ওজুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক সময়ের জন্য হলেও ধারাবাহিকতা বর্জন করতেন। অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধোয়া বা অন্যান্য

[১] সারাখসি, আল-উসুল, খ.২, পৃ.৮২

[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.২, পৃ.১২৩-১২৪ জাকাত অধ্যায়

[৩] দারাকুতনি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ.২৮৯, হা. ২৫৭৯-২৫৮০ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; নাসায়ি, আল-মুজতাবা মিনাস সুনান, খ.৫, পৃ.২৩৬, হা.২৯৬২

বিষয়ের মতো ধারাবাহিকতা বজায় না রাখা জায়েজ হওয়ার পক্ষেও কোনো প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যেতো। অথচ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওজুতে ক্রমধারা বজায় রেখে ওজু করার পর বলেছেন– هذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِه "এটা হলো সেই ওজু, যা ছাড়া আল্লাহ কারো নামাজ কবুল করেন না।"[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীগণ তাঁদের মূলনীতি, '(নস্) শরিয়তের দলিলের ওপর বর্ধিতকরণ এর বিধান রহিতকরণ বলে গণ্য হবে'–এর ওপর ভিত্তি করে ওজুতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাকে ওজুর সুন্নাহ গণ্য করেছেন। কারণ, কুরআনে বর্ণিত বিধানই হলো নস বা মূল শরয়ি বক্তব্য। আর নসকে রহিত বা বাতিল করতে হলে তার সমপর্যায়ের নস লাগবে। কুরআনে ওজুতে শুধুমাত্র চারটি অঙ্গ পবিত্র করতে বলা হয়েছে। অঙ্গ পবিত্রকরণ ধারাবাহিকতা রক্ষা ছাড়াও অর্জিত হয়। ওজুতে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর নিয়মিত ধারাবাকিতা বজায় রাখার কারণে তা রুকন বা ফরজ সাব্যস্ত হয়ে যায় না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কাজ ধারাবাহিকভাবে করতেন, কখনো ছাড়তেন না; তা সুন্নাহ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওজুতে সবসময় কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। আর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিন্যাসধারা অক্ষুণ্ন রেখে ওজু করার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হলো রাসুলের কার্যক্রমের বয়ান। আর রাসুলের কার্যক্রিয়ার মধ্যে যদি কুরবাত (আল্লাহর নৈকট্য) উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো সাধারণত নুদুব (পছন্দনীয়) হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে থাকে।

অনুরূপভাবে উল্লিখিত মূলনীতি 'যদি শরিয়তের দলিলের ওপর বৃদ্ধিকরণটা পরতন্ত্র হয় তথা স্বতন্ত্র না হয়, তাহলে তা বিধান রহিতকরণ বলে গণ্য হবে না'-এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে কুরআনের ওপর বৃদ্ধি বা খবরে ওয়াহেদ (Solitary Roport) দ্বারা খবরে ওয়াহেদের ওপর বৃদ্ধি সহিহ হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এর আলোকে ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্র) বিভিন্ন অঙ্গনে তিনি বিভিন্ন হাদিস উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো বস্তুত তিনি এ মূলনীতির সমর্থনেই উল্লেখ করেছেন। যেমন- বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস, যেখানে (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে না, তার নামাজ হবে না।"[২] এ হাদিসের মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা নামাজের একটি রুকন বা ফরজ কাজ। ইমাম আহমদও (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ মতানুসারে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। মুসলিম শরিফে বর্ণিত একটি হাদিস দিয়েও তাঁরা প্রমাণ

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ.১৪৫, হা. ৪১৯

[২] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.১, পৃ.১৫১, হা.৭৫৬; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ.২৯৫, হা. ৩৯৪।

উপস্থাপন করে থাকেন। যেখানে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি বলেছেন–

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ.

"যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) পাঠ করেনি, তার নামাজ ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেলো, পূর্ণাঙ্গ হলো না।" এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে থাকবো, তখন কী করবো? তিনি বললেন, তোমরা নিম্নস্বরে তা পাঠ করে নাও।"[১]

হানাফি স্কলারদের মতামত হলো, নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠকে নির্ধারিত করে নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সুরা ফাতিহাকে নির্ধারিত করে নিলে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যের ওপর বৃদ্ধিকরণ সাব্যস্ত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾

"তোমরা কুরআন থেকে যতোটুকু সহজ, ততটুকু পড়ো।" [সুরা আল-মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ২০] আর কুরআনের ওপর বর্ধিতকরণ এর বিধান রহিতকরণের নামান্তর। তাই হানাফিদের মূলনীতি অনুসারে খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে কুরআনের এ আয়াতের ওপর বৃদ্ধি করা যাবে না। এখানে খবরে ওয়াহেদ হলো-

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে না, তার নামাজ হবে না।" হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত নামাজে ত্রুটিকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদিসে আলোচ্য মাসআলার সমর্থন পাওয়া যায়। সে হাদিসে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"যখন তুমি নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু করবে। এরপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবির বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে।"[২]

একইভাবে নামাজে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবৃত হাদিস থেকেও উল্লিখিত মাসআলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এসেছে, নামাজে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন–

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হা. ৩৯৫।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, সালাত অধ্যায়, হা.৫৯৮

فَإِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَاانْتَقَصْتَ مِنْ هٰذا، فَقَدِ انْتَقَصْتَه مِنْ صَلَاتِكَ.

"তুমি এভাবে নামাজ আদায় করলে তোমার নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। আর এর কোনো অংশ আদায়ে ত্রুটি করলে তোমার নামাজও ত্রুটিপূর্ণ হবে।"[১] এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়, নামাজে বেদুইন ব্যক্তির ত্রুটিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের পরও তার নামাজকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'নামাজ' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে কুরআনের নসের ওপর বৃদ্ধি করে 'নামাজে ধীরস্থিরতা'-কে ফরজ ধার্য করেননি।

কারণ, হানাফিদের মতে, নসের ওপর বৃদ্ধিকরণ সংশ্লিষ্ট বিধান রহিতকরণের নামান্তর। আর খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে তা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে তাঁদের অভিমত হলো– অবিবাহিত নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে শাস্তিস্বরূপ শুধু একশো বেত্রাঘাত করা হবে। তাদেরকে নির্বাসন দেয়া হবে না। কারণ, হানাফিদের মূলনীতি হলো– 'নসের ওপর বৃদ্ধিকরণ রহিতকরণ হিসেবে বিবেচিত। খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে নসের ওপর বৃদ্ধি করা জায়েজ হবে না।' এ মূলনীতির পক্ষে সমর্থন মিলে হজরত ওমর (রা.)-এর সাথে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা থেকে। তিনি (ওমর রা.) রবিআ ইবনু উমাইয়া ইবনু খালাফকে মদপানের কারণে খায়বারে নির্বাসিত করেছিলেন। সে (রবিআ) সেখানে গিয়ে হিরোক্লিয়াসের দলে যোগদান করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর হজরত ওমর (রা.) বললেন, "তার পরে আমি আর কাউকে নির্বাসন দেবো না।" যদি নির্বাসন দেওয়াটা শরিয়ত নির্ধারিত বিধান হতো, হজরত ওমরের পক্ষে তা পরিত্যাগ করার অধিকার থাকতো না।

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.১, পৃ.২২৬, হা.৮৫৬

একাদশ অধ্যায়

ضاد/দোয়াদ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৩টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

প্রথম মূলনীতি

ক্ষতি (যেকোনো মূল্যে)অপসারণ করতে হবে[১]

(اَلضَّرَرُ) শব্দটির অর্থ হলো- কারো যেকোনো প্রকার ক্ষতি করা আর (اَلضِّرَارُ) শব্দটির অর্থ হলো- শরিয়ত বা আইনবহির্ভূত পদ্ধতিতে ক্ষতির বদলায় ক্ষতি করা। আল্লামা ইবনুল আসির তাঁর "*আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল আসার*" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন– "لَا ضَرَرَ" এর অর্থ: কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের ক্ষতি করতে পারে না, তার প্রাপ্য অধিকার থেকে কোনো কিছু হ্রাস করতে পারে না। অপরদিকে "اَلضِّرَارُ" শব্দটি (ضَرٌّ) মূলধাতু থেকে (فِعَال) এর ওজনে গঠিত। অর্থাৎ (হাদিসের ভাষ্য মতে) ক্ষতির প্রতিদান ক্ষতির মাধ্যমে দেয়া যাবে না।"

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে যেসব মূলনীতি অসামান্য গুরুত্ব ও অনির্বচনীয় তাৎপর্য বহন করে, তন্মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অন্যতম। কারণ, ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মূলনীতির অবারিত বিচরণ ও বহুল প্রয়োগ রয়েছে। তাইতো অসংখ্য ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মাসআলার ভিত্তি এই মূলনীতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। উদাহরণত– ক্রটির কারণে পণ্য প্রত্যর্পণ, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার এখতিয়ার, হাজর (চুক্তি সম্পাদনে বিধিনিষেধ আরোপ) ও শুফ'আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার/Pre-emption)সংক্রান্ত বহু মাসআলার সাথে এই মূলনীতির রয়েছে গভীর সম্পর্ক।[২]

<u>মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:</u>

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"(ইসলামি শরিয়তে) নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো সুযোগ নেই।"

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৮, ধারা: ২০।

[২] ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ির, পৃ. ১০৭।

মূলত হাদিসটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বমর্মী বাণীসমগ্রের একটি এবং তা ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্রের) অন্যতম সামগ্রিক মৌলিক মূলনীতি। এই হাদিসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো যা ইমাম হাকিম ও অন্যান্য হাদিস বিশারদগণ আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَمَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"(ইসলামে) নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট করবে আল্লাহ তার অনিষ্ট করবেন আর যে (অকারণে) অন্যকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তাকে কষ্ট দেবেন।"[১]

হাদিসের শেষাংশটি সহিহ বুখারিতে এভাবে বর্ণিত আছে:

مَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে অন্যের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবেন।"[২]

তাবরানির বর্ণনায় এসেছে, আহমদ ইবনু জুহাইর আত-তাসতারি থেকে বর্ণিত, ইসহাক ইবনু শাহিন (শায়খুল বুখারি) থেকে বর্ণিত:

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشُقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"যে অন্যের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে, আল্লাহও তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবেন।"

হাদিসটি ইমাম নাসাফির বর্ণনায় এভাবে এসেছে:

مَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"যে অন্যের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহও তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন।"

উল্লিখিত সব হাদিসের মর্ম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যে ব্যাক্তি মানুষকে কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে, আল্লাহও তার কর্মফল হিসেবে তাকে কষ্টকর পরিস্থির সম্মুখীন করবেন।

জ্ঞাতব্য যে, আলোচ্য মূলনীতিটি শুধুমাত্র উল্লিখিত হাদিসের অর্থ বহন করে এমন নয়; বরং এর সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্র আরো বহু দলিল রয়েছে। ইমাম শাতিবি (রহ.) যথার্থই বলেছেন যে–

---

[১] তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬, হা. ১৯৪০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, খ. ২, পৃ. ৬৬, হা. ২৩৪৫, তিনি বলেছেন- এর সনদ (বর্ণনাসূত্র) মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ এবং ইমাম জাহবি এই মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৯, পৃ. ৬৪, হা. ৭১৫২।

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" হাদিসটি ধারণানির্ভর দলিল (Speculative Source) হলেও তা একই অর্থপ্রকাশক অকাট্য মূলনীতির পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত। কারণ, নিজেকে কিংবা অন্যকে ক্ষতির সম্মুখীন করা যে নিষিদ্ধ, সে ব্যাপারে শরিয়তে অসংখ্য সামগ্রিক মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾

"তাদের (স্ত্রীদের) ক্ষতি করে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩১]

﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

"তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) উত্ত্যক্ত করবে না সঙ্কটে ফেলার জন্য।" [সুরা আত-তালাক, আয়াত: ৬]

﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾

"কোনো মাতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩]

অনুরূপভাবে মানুষের জান-মাল ও মান-সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, অপহরণ-জবরদখল ও নির্যাতন এবং এমন প্রত্যেক অপরাধ যার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, বংশধারা কিংবা সম্পদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়– এই সবগুলোর নিষিদ্ধতা একথা প্রমাণ করে যে, যে হাদিসটি সর্বপ্রকার ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ করে তা শরিয়তের ব্যাপক ও অকাট্য মূলনীতির পর্যায়ে পড়ে। খবরে ওয়াহেদ নিয়ে গবেষণা চালালেও একই ফলাফল বেরিয়ে আসবে।[১]

রাসুলল্লুাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহ এই মহান মূলনীতিকে সামনে রেখেই গৃহীত হয়েছিলো। যেমন– 'সুনান' রচয়িতাগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন:

(অনুবাদ) একজন ব্যক্তির বাগানে অন্যের খেজুর গাছ ছিলো। গাছের মালিকের গমনাগমনের কারণে বাগানের মালিক কষ্ট হতো। এ ব্যাপারে নবিজির নিকট নালিশ পৌঁছলে তিনি গাছের মালিককে আদেশ দেন– সে যেনো বাগান মালিকের কাছ থেকে তার গাছের বিনিময় নিয়ে নেয় কিংবা তাকে দান করে দেয়। তবে এতে সে অস্বীকৃতি জানালে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাগান মালিককে গাছ

---

[১] শাতিবি: আল-মুওয়াফাকাত, খ. ৩, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

উপড়ে ফেলার অনুমতি দিয়ে দেন এবং গাছের মালিকের উদ্দেশে বলেন- "তুমি তো দেখি (মানুষকে) কষ্ট দিতে আগ্রহী।"[১]

বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একটি লম্বা হাদিসে অন্য শব্দে উল্লেখ করেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে: গাছের মালিক ছিলেন সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) আর বাগান মালিক ছিলেন একজন আনসারি সাহাবি। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামুরা (রা.)কে বলেছিলেন– "তুমি তো দেখি কষ্টদানকারী"। এরপর আনসারি সাহাবিকে বলেছিলেন: "তুমি গিয়ে তার খেজুর বৃক্ষটি উপড়ে ফেলো।"[২]

আবু জার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُه بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوْا.

"হে আমার বান্দাগণ, আমি নিজের ওপর জুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও এ কাজটিকে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।"[৩]

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِه.

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ক্ষতিসাধন করে কিংবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, সে অভিশপ্ত।[৪]

বলা বাহুল্য, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এসব বিচারিক সিদ্ধান্ত ও হাদিস তাঁর সারগর্ভ উক্তি "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" -কে সুদৃঢ় ও সুসংহত করে।

উল্লেখ্য যে, শরিয়ত বান্দাকে নিজের কিংবা অন্যের ক্ষতিসাধন থেকে নিষেধ করে ক্ষান্ত করেনি; বরং মানুষের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রাণীর সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছে। বর্ণিত আছে– নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

---

[১] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৮, পৃ. ১০৪।

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩১৫, হা. ৩৬৩৬।

[৩] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪, হা. ২৫৭৭।

[৪] তিরমিজি, আস-সুনান, হা. ১৮৬৪।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ (ইহসান) অপরিহার্য করেছেন। অতএব, তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, উত্তমরূপে হত্যা করবে, আর যখন কোনো জন্তু জবাই করবে, তখন উত্তম পন্থায় জবাই করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকে যেনো তার ছুরি ধার করে নেয়; এতে করে তার জবাইকৃত জন্তুর আরাম (কষ্ট কম) হবে।[১]

কোনো কোনো আলেম "اَلضَّرَرُ يُزَالُ" এর পরিবর্তে "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" মূলনীতিটিকে ফিকহের পাঁচটি মৌলিক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তবে উভয় মূলনীতির অর্থ প্রায় একই।

মূলনীতি দুটির আলোকে নিম্নে দুটি বিধান উল্লেখ করা হলো:

প্রথম বিধান:

অকারণে কারো ক্ষতিসাধন করা যাবে না। কারণ, মানুষকে কষ্টে ফেলা এক প্রকার জুলুম। আর (শরিয়তের দৃষ্টিতে) যেকোনো প্রকারের জুলুম নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, কোনো ব্যাক্তির জন্য বৈধ নয় অকারণে অন্যের জান-মালের ক্ষতিসাধনে উদ্যত হওয়া। কেননা, অকারণে কারো ক্ষতিসাধন করা জুলুমের আওতাভুক্ত। আর যাবতীয় আসমানি কিতাব, ধর্ম ও মতবাদ জুলুমকে অস্বীকার করে।

প্রথম বিধানসংক্রান্ত কিছু উদাহরণ:

- জায়েদ যদি খালেদের রাস্তায় চলাচলের অধিকার অর্জন করে, তবে খালেদ জায়েদকে এই রাস্তায় চলাচল থেকে বারণ করতে পারবে না।
- কোনো ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে উক্ত পণ্য কাউকে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ, ত্রুটি গোপন রাখার কারণে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে কারো ক্ষতিসাধন হারাম ও নিষিদ্ধ।
- কোনো জনপদবাসীর জন্য বৈধ নয় কোনো ব্যক্তিকে তাদের সাথে বসবাস করা থেকে নিষেধ করা এই ওজুহাতে যে– তারা তার সাথে বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। কেননা, তাদের এহেন কর্ম অন্যের জন্য ক্ষতিকর। আর শরিয়ত কারো ক্ষতিসানের অনুমতি দেয় না।
- ঘরের জানালা খোলা রাখা বৈধ। তবে জানালা খোলা রাখার কারণে প্রতিবেশী রমণীদের প্রতি দৃষ্টি গেলে, জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

---

[১] নাসায়ি, আস-সুনান, খ. ৭, পৃ. ২২৭-২২৯, হা. ৪৪০৫, ৪৪১২, শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা.) থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় বিধান:

ক্ষতির বদলায় ক্ষতি করা যাবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জান-মালের ক্ষতিসাধন করলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় প্রতিদানে ক্ষতিকারকের জান-মালের ক্ষতি করা। বরং তার উচিত হলো বিচারকের শরণাপন্ন হয়ে শরয়ি পদ্ধতিতে উক্ত ক্ষতি অপসারণের তদবির তলব করা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামের এই সুমহান মূলনীতির মাঝে মানবহিতৈষণার পরাকাষ্ঠা ও সহানুভূতির যাবতীয় নিদর্শন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যা সুচারুরূপে এ কথা সাব্যস্ত করে যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, গৌণ-মৌল যেকোনো বিষয়ে সর্বপ্রকার ক্ষতি-অনিষ্ট অপসারণযোগ্য এবং শরিয়তের সমূহ বিধানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো- ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মহানুভবতা প্রদর্শন। কাজেই সমাজে "الضَّرَرُ يُزَالُ" এর নীতি বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

القاعدة الثانية: اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

যা অপরিহার্য, তা নিষিদ্ধ বিষয় বা বস্তুকে বৈধ করে দেয়[১]

মূলনীতির মর্ম হলো- মানুষ যদি তীব্র অভাবের সম্মুখীন হয় যেমন, প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা কিংবা অনুমতি ব্যতীত অন্যের সম্পদ থেকে নিয়ে খাওয়া তার জন্য বৈধ। এভাবে স্বাভাবিক ও প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থায় যেসব বিষয় নিষিদ্ধ, প্রয়োজনের মুহূর্তে সেসব বিষয় অনুমোদিত হয়ে যায়। এমনকি বাধ্য হয়ে (অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে) মুখে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করাও বৈধ।

মূলনীতির বিশদ বর্ণনা:

'জরুরত' (প্রয়োজন) হলো- মানুষের জীবনধারণের জন্য যা অপরিহার্য। আর 'মাহজুরাত' হলো- হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু। জ্ঞাতব্য যে, 'জরুরত' সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয় না; বরং সেসব নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ হবে যেগুলো জরুরতের চেয়ে লঘুতর হয়। পক্ষান্তরে যেসব নিষিদ্ধ বস্তু জরুরতের তুলনায় গুরুতর সাব্যস্ত হয়, সেগুলো কখনো বৈধ হবে না। প্রয়োজনের তাগিদে নিষিদ্ধ বস্তুর অনুমোদন প্রদানকে উসুলুল ফিকহের (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্র) পরিভাষায় 'রুখসত' বলে।

রুখসত (ছাড়যুক্ত বিধান) তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: রুখসত বা ছাড়যুক্ত বিষয়টি ততক্ষণ অনুমোদিত থাকবে যতক্ষণ জরুরত বিদ্যমান থাকে। যেমন- ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় হয়ে মৃত প্রাণী বা শূকরের গোশত থেকে ততোটুকু খাওয়া যতোটুকু খেলে প্রাণ বেঁচে যায় কিংবা প্রাণবিনাশী পিপাসার শিকার হয়ে মদ্যপান করা। অনুরূপভাবে কোনো মুমিনকে এসব অখাদ্য গ্রহণে কারো পক্ষ থেকে একান্ত বাধ্য করা হলে তখনো তা রুখসতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৮, ধারা: ২১

দ্বিতীয় প্রকার: রুখসতপ্রাপ্ত বিষয়টি হারাম থেকে যায়; তবে প্রয়োজনের তাগিদে শরিয়ত এতে লিপ্ত হওয়াকে অনুমোদন দেয়। যেমন- কোনো মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করা অথবা অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে মুখে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে যে সম্পদ নষ্ট করা হয় তার ক্ষতিপূরণ মালিককে শোধ করে দেয়া অপরিহার্য।

তৃতীয় প্রকার: যে বিষয়টি শরিয়ত কর্তৃক কখনো অনুমোদিত হয় না; এমনকি কারো পক্ষ হতে এতে লিপ্ত হতে জোর-জবরদস্তি করা হলেও। যেমন- কোনো মুসলমানের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি করা, ব্যভিচার করা, পিতামাতার একজন বা উভয়জনকে প্রহার করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে গুনাহ রহিত হয়ে যায় না।

মূলত আলোচ্য মূলনীতির সম্পর্ক হলো মানবজীবনের পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সাথে। সেগুলো হলো:

১. দ্বীনের হেফাজত (الحفاظ على الدين)
২. জীবনের হেফাজত (الحفاظ على النفس)
৩. সম্মান-সম্ভ্রমের হেফাজত (الحفاظ على العرض)
৪. বিবেকের হেফাজত (الحفاظ على العقل)
৫. সম্পদের হেফাজত (الحفاظ على المال)

সমস্ত আসমানি ধর্ম এ পাঁচটি বিষয়ের সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ পাঁচ বিষয়াবলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "যা অপরিহার্য, তা নিষিদ্ধ বিধানকে বৈধ করে দেয়"-এর মতো মূলনীতি অনুযায়ী আমলের অনুমোদন রয়েছে।

মূলনীতি-প্রমাতা ভিত্তিসমূহ:

মূলত এই মূলনীতি "اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ" শীর্ষক সামগ্রিক মৌলিক মূলনীতি থেকে উদ্ভূত। কারণ, এই সামগ্রিক মূলনীতির সমর্থনে যেসব হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, সে হাদিসগুলো-ই বক্ষ্যমাণ মূলনীতির দালিলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। সেই হাদিসসমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হবে। হাদিসগুলো বিস্তারিত ঐ সামগ্রিক মূলনীতির অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেন, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) সহজ করো, কঠোরাতা করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, তাদের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টি করো না।[১]

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২৫, হা. ৬৯।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাহাবিদের কোনো কর্মের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতোটুকু করতে সক্ষম, ততোটুকুরই নির্দেশ দিতেন।"[১]

এ বিষয়ে কতিপয় কুরআনের আয়াতও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩]

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾

"কিন্তু তার কথা ভিন্ন যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।" [সুরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬]

﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

"কিন্তু যে নিরূপায় অথচ নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।" [সুরা আশ-শারহ, আয়াত: ৬]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম (বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে) বান্দার ওপর কোনো প্রকার কঠোরতা কিংবা বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় না; বরং কষ্টসাধ্য বিধানের তুলনায় সহজসাধ্য বিধানকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। পাশাপাশি উপর্যুক্ত মূলনীতি প্রয়োগের নির্দেশনাও উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এ দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, বান্দা এর আনীত সমস্ত বিধি-বিধান অতি সহজ-সরলভাবে পালন করবে। যেখানে না কোনো বিধান নিয়ে সৃষ্টি হবে বাড়াবাড়ি, আর না কোনো বিধানের প্রতি প্রদর্শিত হবে শিথিলতা। সকল ধর্মের মাঝে একমাত্র ইসলামই হলো মধ্যমপন্থী ধর্ম। কীভাবে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা যায়, কীভাবে মানুষের সামনে একে বিতর্কিত রূপ দিয়ে উপস্থাপন করা যায় এবং কীভাবে একে অনমনীয় ও জটিল ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়–এসব কর্মযজ্ঞের পেছনে প্রাচ্যবিদরা তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হা. ২০।

অথচ ইসলাম বান্দার প্রতি যে সহজতা ও নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে, অন্যান্য ধর্মে এর নজির কল্পনা করাও অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾

"আল্লাহ তোমাদের ভার কমাতে চান; আর মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৮]

القاعدة الثالثة: اَلضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

তৃতীয় মূলনীতি

যা অপরিহার্য, তার ব্যবহার প্রয়োজন অনুপাতেই নির্ধারিত হয়[১]

মূলনীতির সারকথা হলো- প্রয়োজনের তাগিদে যা বৈধ করা হয়, তার ব্যবহার ততোটুকুই বৈধ যতোটুকুতে প্রয়োজন সেরে যায়। কাজেই যে পরিমাণে প্রাণ বেঁচে যায় তার ওপরই ক্ষান্ত করতে হবে, এর অতিরিক্ত ব্যবহার অনুমোদিত হবে না। উদাহরণত- প্রয়োজনের তাগিদে মৃত প্রাণী থেকে ততোটুকুই খাওয়া যাবে, যতোটুকু পরিমাণ খেলে জীবনরক্ষা হয়। অতএব প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে মিথ্যা শপথ করা বৈধ হবে না; তবে 'তাউরিয়া' ও 'তারিজ'-এর আশ্রয় নেয়া যাবে।[২]

ইসলামি আইনবেত্তাগণ শরয়ি বিধি-বিধানের জন্য কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেন। এসব মূলনীতির বাইরে কিছু ব্যতিক্রম বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে জরুরি অবস্থা অন্যতম। তাইতো জরুরি অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে অনেক নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করা হয়। তবে তাঁরা 'জরুরত'-সংক্রান্ত মূলনীতিটিকে "الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" (যা অপরিহার্য, তার ব্যবহার প্রয়োজন অনুপাতেই নির্ধারিত হয়)-এর মতো মূলনীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে থাকেন।

দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতুল আহকাম নামক গ্রন্থে এসেছে: "প্রয়োজনের তাগিদে যা বৈধ করা হয়েছে তা প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত থাকবে। অর্থাৎ, প্রয়োজনের ভিত্তিতে যা বৈধতা পেয়েছে তার ব্যবহার কেবল ততোটুকু পরিমাণে সীমিত থাকে, যতোটুকু ব্যবহারে উক্ত প্রয়োজন সেরে যায়; প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার কোনোক্রমেই বৈধ হবে না।"

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, প. ১৮, ধারা: ২২।

[২] আরবিতে 'তাউরিয়া' (تورية) বা 'তারিজ' (تعريض) বলা হয়: এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করা, শ্রোতা যার প্রকাশ্য অর্থ বুঝে থাকে তবে বক্তা তার মানসে ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। যা স্পষ্টত মিথ্যা হয় না। প্রয়োজনের মুহূর্তে এ জাতীয় বক্রোক্তির ব্যবহার শরিয়তস্বীকৃত। (অনুবাদক)

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

মূলত এই মূলনীতিও "اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ" শীর্ষক সামগ্রিক মৌলিক মূলনীতি থেকে উৎসারিত। কারণ, এই সামগ্রকি মূলনীতির সমর্থনে যেসব কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে, সেই আয়াত ও হাদিসগুলো-ই বক্ষ্যমাণ মূলনীতির দালিলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। সঙ্গত কারণেই এখানে সেই দলিলসমূহের পুনরাবৃত্তি সমীচীন মনে হচ্ছে না। বিস্তারিত জানার জন্য ঐ সামগ্রিক মূলনীতি দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

عين/আইন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৭টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

প্রথম মূলনীতি

(আইন প্রণয়নে) সামাজিক রীতি নিয়ামকরূপে বিবেচ্য[১]

এই সুপ্রসিদ্ধ মূলনীতিটি পবিত্র কুরআন ও সুবিমল সুন্নাহর ওপর ভিত্তিশীল মূলনীতিসমূহের অন্যতম। কারণ, 'উরফ' বা সামাজিক প্রথা ও 'আদাত' বা প্রচলিত উত্তম রীতিনীতির বিবর্তনের ফলে ইসলামি নিয়মবিধির মাঝেও লক্ষণীয় পরিবর্তন-পরিমার্জন সাধিত হয়। তাই ইসলামি অনেক বিধান এবং ফিকহি অনেক শাখাগত মাসআলা এই মূলনীতির সাথেই কেন্দ্রীভূত।[২]

<u>**মূলনীতির সারকথা:**</u> যে বিষয়ে শরিয়তের কোনো নস্ (বক্তব্য) নেই, সেই বিষয়ে শরয়ি বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথাকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। আর যদি নস্ পাওয়া যায়, তবে তদানুসারে বিধান সাব্যস্ত হবে। তখন উরফ বা প্রথার জেরে নস্‌কে নাকচ করা যাবে না। কারণ, নস্ পরিবর্তনের অধিকার প্রথার নেই। উরফ অপেক্ষা নস (শরয়ি বক্তব্য) অধিক শক্তিশালী। কারণ, উর্ফ কখনো-কখনো শরিয়ত অসমর্থিত বিষয়ের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ফুকাহায়ে কিরাম (ইসলামি আইনজ্ঞ)-এর ভাষ্যে 'আদাত'-এর পরিচয়: 'আদাত' (Custom) হলো মানুষের অভ্যাসে রূপ নেওয়া সেসব পৌনঃপুনিক ঘটমান কর্মকাণ্ড, সুস্থ ও রুচিবান স্বভাব যেগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

উর্ফ (Social Tradition)-এর পরিচয়: উত্তম বিবেকের প্রত্যক্ষ মদদে স্বভাব কর্তৃক স্বীকৃত কর্মকাণ্ডসমূহ।

'محكمة' শব্দটি 'التحكيم' মাসদার (ক্রিয়ামূল) হতে ইসমে মাফউল (কর্মবাচক বিশেষ্য)। এর অর্থ: মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করা। অর্থাৎ: বিচার-ফায়সালার প্রয়োজনে আদাত বা প্রচলিত রীতিনীতিকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। প্রথা বা সামাজিক রীতিনীতিকে কেবল তখনই প্রমাণ ও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, যখন তা নস (শরয়ি বক্তব্য)বিরোধী না হবে অথবা চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মাঝে উরফের বিপরীত কোনো শর্তারোপ না করা হবে।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ.২০, ধারা. ৩৬।

[২] বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য দেখুন : ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.১১৬।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

কতিপয় বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উরফ বা প্রথাকে যে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, এ ব্যাপারে সুন্নাহ বর্ণিত কয়েকটি দলিল নিম্নরূপ। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

অর্থ: "ওজনের (Weight) ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের ওজন মানসম্মত এবং পরিমাপে (Measure) মদিনাবাসীদের পরিমাপ মানসম্মত।"[১]

ইমাম সালাহুদ্দিন আল-আলায়ি (রহ.) 'আল-মাজমুউল মুজহাব ফি কাওয়াইদিল মাজহাব' গ্রন্থে বলেন, "উপর্যুক্ত হাদিসে প্রামাণ্য বিষয় হলো, মদিনাবাসী যেহেতু খেজুর ও কৃষি পণ্য নির্ভরশীল ছিলো, তাই তাদের জন্য নবিজি তাদের রীতি বা প্রথা অনুসারে পরিমাপক যন্ত্র 'কায়ল' নির্ধারণ করেছেন। পক্ষান্তরে মক্কাবাসী ছিল বণিক শ্রেণি। তাই নবিজি তাদের প্রথানুসারে পণ্য মেপে দেয়ার ক্ষেত্রে 'ওজন'-কে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ: জাকাত, সদকাতুল ফিতর, কাফ্‌ফারা ও দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণের সময় মদিনাবাসী কায়ল (পাত্রের পরিমাপ) অনুসারে দেবে এবং মক্কাবাসী ওজন অনুসারে দেবে।"[২]

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হিনদা বিনতে উতবা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাদের এতো পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে; তবে আমি তার অজান্তে তার মাল থেকে কিছু নিয়ে নিই। তখন তিনি বললেন–

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য নিয়মানুসারে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো।"[৩]

আল্লামা আইনি (রহ.) বলেন, "এ থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রচলিত রীতিনীতি একটি সতত সিদ্ধ আমল।"[৪] ইবনু বাত্তাল (রহ.)-এর মতে, "উরফ বা প্রচলিত প্রথা ইসলামি আইনবিদদের নিকট স্বীকৃত আমলযোগ্য বিষয়।"[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তরসমূহ খতিয়ে দেখতে পেলেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-

---

[১] নাসায়ি, আস-সুনান, খ.৫, পৃ.৫৪, হা.২৫২০, খ.৭, পৃ.২৮৪, হা.৪৫৯৪ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) এর সূত্রে "পরিমাপের ক্ষেত্রে মদিনাবাসীদের পরিমাপ এবং ওজনের ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের ওজন মানসম্মত" শব্দে।

[২] আলায়ি, আল-মাজমুউল মুজহাব ফি কাওয়াইদিল মাজহাব, খ.২, পৃ.৪০৫।

[৩] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.৭, পৃ.৬৫।

[৪] বদরুদ্দিন আল-আইনি, উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি, খ.১২, পৃ.১৬-১৮।

[৫] প্রাগুক্ত।

এর হৃদয়জগত সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং, মুসলমানরা যা ভালো মনে করে, আল্লাহর কাছে তা ভালো বলে স্বীকৃত।"[১]

আলোচ্য মূলনীতির আরেকটি প্রামাণ্যসূত্র হলো নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নিষ্পত্তিমূলক বিচারের নিম্নোল্লিখিত ঘটনা: হারাম ইবনু মুহাইয়্যাসা (রহ.) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, একদা আল-বারা ইবনু আজিব (রা.)-এর উষ্ট্রী জনৈক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে এর ফসল নষ্ট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফায়সালা দিলেন, দিনের বেলায় বাগানের মালিক বাগানের হেফাজত করবে এবং রাতের বেলায় পশুর মালিক পশুর হেফাজত করবে।"[২]

অপর বর্ণনায় এসেছে, "বাগানের মালিক দিনের বেলায় বাগানের হেফাজত করবে। আর পশুর মালিক রাতের বেলায় পশুর হেফাজত করবে। সুতরাং রাতের বেলায় পশু কোনো ক্ষতিসাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দেবে পশুর মালিক।"[৩]

এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি আইনবিশারদগণ দিনের বেলায় পশু কারো ধন-দৌলতের ক্ষতিসাধন করলে, পশু-মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না মর্মে মত দিয়েছেন। অবশ্য রাতের বেলায় পশু কোনো ক্ষতিসাধন করলে পশু-মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি (রহ.) বলেন, "এর কারণ হলো, সামাজিক প্রথা অনুসারে বাগবাগিচা ও উদ্যান মালিকেরা দিনের বেলায় তাদের বাগানের যত্ন নিয়ে থাকেন। পাহারাদার, দারোয়ান ও প্রহরী নিয়োগ করে এর দেখভাল করেন। অপরদিকে পশু মালিকেরা সচরাচর দিনের বেলায় তাদের পশুগুলোকে ময়দানে ছেড়ে দেয় এবং সাঁঝবেলায় সেগুলোকে আস্তাবলে ফিরিয়ে নেয়। সুতরাং, যার তরফে প্রচলিত এই নিয়মের ব্যত্যয় পওয়া যাবে, সে-ই আপন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে বলে ধরা হবে। ফলে ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। বিষয়টি হলো, যেমন- কেউ যদি নিজের আসবাব-সামগ্রী রাজপথে ছুঁড়ে রাখে বা অরক্ষিত কোনো স্থানে ছড়িয়ে রাখে; এমতাবস্থায় পথচারী বা যেকেউ তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তার হাত কর্তন করা আইনত সিদ্ধ হয় না।"[৪]

আদতে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন অনেক মূলনীতি এবং মৌলিক ধারা-উপধারা ঠিক করে দিয়েছেন; শরয়ি বিভিন্ন মাসআলা ও কঠিন সমস্যার নিষ্পত্তিতে যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষত শরয়ি আদালতের বিচারকদের জন্য এগুলোর আবশ্যকতা অপরিসীম। নবিজি নির্দেশিত সেসব মূলনীতির অন্যতম হলো, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃত-প্রচলিত প্রথা ও রীতিকে বিবেচ্য বিষয় ধার্য করা। এর স্বপক্ষে আলোচ্য হাদিস

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ.১, পৃ.৩৭৯ (আলামুল কুতুব সংস্করণ)।

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.৩, পৃ.২৯৮, হা.৩৫৬৯।

[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ.২, পৃ.৭৮১, হা.২৩৩২; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.৩, পৃ.২৯৮, হা.৩৫৬৯।

[৪] আল-খাত্তাবি, মাআলিমুস সুনান, খ.৩, পৃ.১৭৮-১৭৯।

অনেক বড়ো দলিল। হাদিসে উষ্ট্রীর মালিক এবং বাগান মালিক উভয়ের দাবি-ই গ্রহণীয় ছিলো।

তাই নবিজি তাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা 'দিনের বেলায় বাগান ও সম্পদের মালিকেরা নিজেদের সম্পত্তি হেফাজত করে এবং রাতের বেলায় পশুর মালিকেরা পশুকে নিয়ন্ত্রণে রাখে'–এটি বিবেচনায় নিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছিলেন।

নারীদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং গোপন অবস্থা (হায়েজ-রজঃস্রাব, নেফাস-প্রসবউত্তর রক্তস্রাব, ইস্তিহাজা-রক্তপ্রদর)সংক্রান্ত বেশিরভাগ বিধানই উরফ বা প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভরশীল করে ফায়সালা দেয়া হয়েছে। তাই হামনা বিনতু জাহশ (রা).-কে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন–

فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

"তুমি রজঃস্রাবের সময়সীমা ছয় অথবা সাত দিন ধরে নেবে।"[১]

তার (হামনা রা.) অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাজা-রক্তপ্রদরগ্রস্ত হওয়ার অনুযোগের ভিত্তিতে নবিজি তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। উক্ত নির্দেশের মাঝে প্রচলিত প্রথা এবং সাধারণ প্রচলনকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কারণ, মেয়েদের স্বাভাবিক হায়েজ-রজঃস্রাব হয়ে থাকে ছয় অথবা সাতদিন।

ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি (রহ.) 'মা'আলিমুস সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "হামনার সমস্যার সমাধান নবিজি প্রচলিত প্রথা এবং মহিলাদের সচরাচর নিয়ম মাথায় রেখে দিয়েছিলেন। একইভাবে মহিলাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রতি মাসে সর্বসাকুল্যে একবার রজঃস্রাব হওয়ার বিষয়টিকেও তিনি হামনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে নিয়েছিলেন। নবিজির বক্তব্য "*যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের রজঃস্রাবের সময়ে এবং তুহরের (পবিত্রতার) সময়ে নিজেদের হায়েজের সময়সীমা ও তুহরের সময়সীমা গণনা করে থাকে*"-থেকে বিষয়টি স্পষ্টতই বোঝা যায়।"[২]

উপর্যুক্ত হাদিসের সমর্থন পাওয়া যায় ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি হলো, হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতু আবু হুবায়শ (রা.) নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইস্তিহাজা-রক্তপ্রদর হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি নামাজ পরিত্যাগ করবো? নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন–

لاَ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

---

[১] তিরমিজি, আস-সুনান, খ.১, পৃ.১৮৯, হা.১২৮।

[২] খাত্তাবি, মাআলিমুস সুনান, খ.১, পৃ.৮৮।

"না, এ হলো রগ নির্গত রক্ত। তবে যে কয়দিন তুমি ঋতুবর্তী থাকতে, সে কয়দিন অবশ্যই নামাজ পরিত্যাগ করো। তদনন্তর গোসল করে নেবে ও নামাজ আদায় করবে।"[১]

রাসূলের বাণী "যে কয়দিন ঋতুবর্তী থাকতে.." থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, নবিজি ফাতিমার হায়েজের সময়সীমাকে তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের ওপর বহাল রেখেছিলেন।

বক্ষ্যমাণ মূলনীতির সমর্থনে আরেকটি প্রামাণ্য দলিল হলো, আবু দাউদ (রহ.) বর্ণিত হাদিস। হজরত সাদ (রা.) বলেন, যখন মহিলারা রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট বাইআত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন, তখন তাদের মধ্যে একজন স্থূলদেহী মহিলাও ছিলো। সম্ভবত মহিলাটি মুদার গোত্রীয়। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আমাদের পিতা, পুত্রের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন– আমার ধারণা হাদিসে এটাও আছে: এবং আমাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদে আমাদের কী পরিমাণ অধিকার আছে? তিনি বললেন,

الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ.

"তোমরা যা (রাতাব হিসেবে) খাও এবং দান কর।" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, 'আর-রাতাব' হচ্ছে রুটি, তরি-তরকারি ও তাজা খেজুর।[২]

হাদিসে নবিজি 'আর-রাতাব'- কে বিশিষ্ট করার কারণ হলো, এর দুর্বিপাক অতি সহজে পুষিয়ে নেওয়া যায়। এটা উপার্জনে তেমন কষ্টও পোহাতে হয় না। ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি (রহ.) কার্যত উরফ বিবেচনায় হাদিসে 'আর-রাতাব'-কে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে তিনি বলেন, "পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-পরিজনের মাঝে তরি-তরকারি ও তাজা ফলমূল পরস্পরকে হাদিয়া প্রদান, রান্না করে অঞ্জলি ভরে একে অপরকে এসব খাদ্য দান এবং মেহমান আপ্যায়নে 'আর-রাতাব'-এর প্রচলন ব্যাপক ছিলো।

তাই হাদিসে প্রথা বিবেচনা করে এবং সামাজিক উত্তম রীতিনীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে সে পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।"[৩]

উপরিউক্ত সকল নসের আলোকে ইমামগণ আলোচ্য মূলনীতিটি স্থাপন করেছেন এবং প্রচুর মাসআলা ও বিষয় তাঁরা এই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। ওমর (রা.)-এর আমলে তাঁতিদের উদ্দেশ্য করে ইমাম কাজি শুরাইহ (রহ.)-এর একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের প্রথা বা রীতি তোমাদের

---

[১] বুখারি, আল জামি আস-সহিহ, খ.১, পৃ.৭২, হা.৩২৫।

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ.২, পৃ.১৩১, হা.১৬৮৬।

[৩] খাত্তাবি, মাআলিমুস সুনান, খ.২, পৃ.৭৯।

মাঝে"। এই বক্তব্যটি আলোচ্য মূলনীতির সাথে শতভাগ খাপ খেয়ে যায়। বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) শুরাইহের ঐ বক্তব্যের বিশ্লেষণে 'উমাদাতুল কারি শরহু সাহিহিল বুখারি' গ্রন্থে লিখেছেন, "অর্থাৎ: তোমাদের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও প্রচলন তোমাদের পরস্পরের মাঝে বিবেচ্য বলে ধর্তব্য হবে।"[১]

[১] বদরুদ্দিন আল-আইনি, উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি, খ.১২, পৃ.১৬।

القاعدة الثانية: الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلفَاظِ والْمَبَانِيْ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচ্য হয়, শব্দ ও সাংকেতিক চিহ্ন (বিবেচ্য) নয়[১]

মূলনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

অর্থাৎ লেনদেন ও চুক্তিসমূহে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়ত ও অন্তর্নিহিত অর্থ ধর্তব্য এবং বিবেচ্য হবে। এখানে নিয়ত ও উদ্দেশ্য গুরুত্ব পায়, কার্যকর হয়। শব্দ ও সাংকেতিক চিহ্ন গুরুত্ব পায় না।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওজিয়্যা (রহ.) তাঁর ইলামুল মুওয়াককিইন আন রাব্বিল আলামিন" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, শরিয়তের উৎসসমূহে অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়তপ্রণেতা সেসব শব্দকে বিবেচনায় নেননি—যেসব শব্দকে বক্তা কোনো অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করেনি; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে বক্তার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে যেসব মূলনীতি বা বিধানকে অগ্রাহ্য-উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নিয়ত সেভাবে বিবেচ্য এবং কার্যকর, ঠিক যেভাবে ইবাদত ও নৈকট্যসূচক কার্যাবলিতে বিবেচ্য এবং গ্রহণীয়।[২]

বস্তুত এক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অর্থই নির্ভরযোগ্য, বাহ্যিক বা শাব্দিক অর্থ নয়।[৩]

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন, লেনদেন ও চুক্তিসমূহে নিয়ত ও উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য। তার প্রমাণ হলো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত হাদিস, তিনি বলেন-

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৬. ধারা. ৩।

[২] ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াককিইন আন রাব্বিল আলামিন, খ. ৩, পৃ. ৭৮-৮৮।

[৩] মুহাম্মদ আবু বকর ইসমাঈল, আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ বাইনাল আসালাতি ওয়াত-তাওজিহ, পৃ. ৩৯।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.

"মানুষের কার্যক্রম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তির তাই প্রাপ্য যা সে নিয়ত করবে।" এই হাদিসটি 'হিলা' বা ফন্দি বাতিল হওয়ার অন্যতম দলিল। ইমাম বুখারি (রহ.) এই হাদিস দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন।[১]

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইসলামি শরিয়ত এমন অনেক চুক্তি ও লেনদেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে সঠিক বা বিধিসম্মত মনে হলেও অন্তর্নিহিত গুণের কারণে সেসব চুক্তি অসার ও বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন তার উদাহরণ হচ্ছে- "بَيْعُ العِيْنَة" (কোন জিনিস বাকিতে বিক্রি করার পর বিক্রেতা নিজেই আবার কম দামে ক্রয় করে নেয়া)। মূলত এই চুক্তি সেসব নিন্দনীয় ফন্দির একটি যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর হারামকৃত সুদী লেনদেনকে হালাল করার অপপ্রয়াস চালানো হয়।[২]

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন,

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ.

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "ইহুদিরা যে অপরাধের শিকার হয়েছে তোমরা তার শিকার হয়ো না। সুতরাং, অতি তুচ্ছ ফন্দির মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল হিসেবে রূপান্তর করতে যেয়ো না।"[৩]

---

[১] মুত্তাফাক আলাইহি, আততাদাবিরুল ওয়াকিয়াহ, খ. ৪, পৃ. ১২২।

[২] মুহাম্মদ বকর ইসমাঈল, বাইনাস সায়িলি ওয়াল ফাকিহি, পৃ. ৪৯। জাইলাই, নাসবুর রায়াহ, খ. ৪, পৃ. ৪২।

[৩] ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ২৯।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

জ্ঞাতব্য যে, আলোচ্য মূলনীতিটি الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا "কার্যের বিচার হয় তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে" শীর্ষক মূলনীতির একটি শাখা মূলনীতি। অতএব যেসব হাদিস উক্ত মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র বা দলিল হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো এই মূলনীতিরও দলিল বিবেচিত হবে। এর পুনরাবৃত্তি না করাই শ্রেয় মনে করছি। প্রয়োজনে "কার্যের বিচার হয় তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে" শীর্ষক মূলনীতি ও তার প্রামাণিক হাদিসসমূহ পুনরায় দেখে নেয়া যেতে পারে।

القاعدة الثالثة: عُمُوْمُ الْمُقْتَضَى.

তৃতীয় মূলনীতি

দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতা

ইমাম সাআদুদ্দিন আত-তাফতাযানি, তাঁর "শরহুত-তালবিহ আলাত-তাওজিহ" শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতা" নীতিটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর উক্তি।[১] তিনি বলেন,

إِنَّ الْمُقْتَضٰى بِمَنْزِلَةِ الْمَنْصُوْصِ فِيْ ثُبُوْتِ الْحُكْمِ، حَتّٰى كَانَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِه كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ، لَا بِالْقِيَاسِ، فَكَذٰلِكَ فِيْ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُمُوْمِ فِيْه، فَيُجْعَلُ كَالْمَنْصُوْصِ.

"নিশ্চয়ই বিধান সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো জিনিসের দাবি বা আবেদন প্রকাশ্য ভষ্যের ন্যায়।[২] তাই আবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিধান (শরিয়তের) প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিধানের মতো হবে; কিয়াস (যুক্তি) দ্বারা প্রমাণিত বিধানের মতো হবে না। অনুরূপভাবে আবেদনের ক্ষেত্রে সেই প্রকারের ব্যাপকতা বিদ্যমান থাকবে, যে প্রকারের ব্যাপকতা (শরিয়তের) প্রকাশ্য ভাষ্যে বিদ্যমান থাকে।"[৩]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

যারা দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতার মূলনীতিটির পক্ষে মত পোষণ করেছেন, তাঁরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه.

"আমার উম্মত থেকে ভুল, অনিচ্ছাকৃত কাজ এবং জোরপূর্বক কৃত কাজের দায়-দায়িত্ব তুলে নেয়া (বিলুপ্ত করা) হয়েছে।"[৪]

---

১ সাদ আত-তাফতাজানি, শরহুত-তালবিহ আলাত-তাওজিহ, খ. ১, পৃ. ২৬৪।

২ যা শব্দের মধ্যে উহ্য থাকে তার হুকুম শরিয়তের প্রকাশ্য ভাষ্যের ন্যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের মাতাদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" এখানে যা উহ্য আছে তা হলো— তাদের সাথে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে হারাম করা হয়েছে। (নিরীক্ষক)

৩ সারাখসি, আল-উসুল, খ. ১, পৃ. ২৪৮।

৪ ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৫৯, হা. (২০৪৩-২০৪৫)।

হাদিসের বাহ্যিক শব্দ থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো— সরাসরি ভুলকে তুলে নেয়া হয়েছে। অথচ এটি একটি অসম্ভব এবং অবাস্তব বিষয়। তাই হাদিসকে মূল অর্থের নিকটতম অর্থের জন্য বিবেচনা করতে হবে। আর তা হচ্ছে- ভুলসংশ্লিষ্ট সব বিধানকে তুলে নেয়া। কারণ, যখন কোনো উক্তির মূল অর্থ অসম্ভব হয়ে যায় তখন তার নিকটতম অর্থের দিকে যাওয়া জরুরি হয়ে যায়। আর এই ক্ষেত্রে নিকটিতম অর্থ হচ্ছে- ভুলের সব বিধান তুলে নেয়া। কারণ, কোনো জিনিসের সব বিধানকে তুলে নেয়া (বিলুপ্ত করা) মানে প্রকারান্তরে মূল জিনিসটিকেই তুলে দেয়া (বিলুপ্ত করা)। তদুপরি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এও ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"[১]

এই হাদিসটিও বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আবেদনের ব্যাপকতা শরয়ি দলিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ি, মালিকি এবং হাম্বালি মাজহাব মতাবলম্বী ইমামগণ বলেন, কেউ যদি সালাতের মধ্যে ভুলে বা অনিচ্ছায় কিঞ্চিৎ কথা বলে ফেলে তাতে তার সালাত ভঙ্গ হবে না।

তাঁরা তাঁদের এই রায়ের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতার নীতিকে—যা উপরিউক্ত হাদিস তথা

رفع عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ...

"আমার উম্মত থেকে ভুল, অনিচ্ছাকৃত কাজ এবং জোরপূর্বক কৃত কাজের গুনাহ তুলে দেয়া হয়েছে" থেকে বোঝা যায়। কারণ, তাঁরা হাদিসের মধ্যে 'হুকুম' (বিধান) শব্দটিসহ বর্ণনা করেছেন। আর বিধানকে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার 'হুকুম' বা বিধান হচ্ছে (কোনো ইবাদত বা কর্ম) বাতিল না হওয়া, আর আখিরাতের 'হুকুম' বা বিধান হচ্ছে (ভুলের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে) পাকড়াও না করা।

তাঁরা এই মাসআলার মধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে জুল ইয়াদাইনের হাদিস দিয়েও প্রমাণ করে থাকেন। হাদিসটি সহিহ মুসলিমে এভাবে এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ

---

[১] বুখারি, আস-সহিহ, খ. ১. পৃ. ৬, হা. (১), ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।

ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ"، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ -وَهُوَ جَالِسٌ- بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামাজ আদায় করলেন, তিনি দু'রাকাতে সালাম ফিরালেন। অতঃপর জুল ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে? নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, দুটির কোনোটি হয়নি। তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ এদুটির কোনো একটি নিশ্চয়ই হয়েছে। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসাল্লীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, জুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে সত্য বলেছে। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করলেন। অতঃপর সেজদার পরে বসে দুটি সেজদায়ে সাহু করলেন।"[১]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফাতহুল বারি"তে জুল ইয়াদাইনের উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমার উম্মত থেকে ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কাজের দায়-দায়িত্ব তুলে নেয়া হয়েছে"—এ হাদিসের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কাজের গুনাহ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান। তবে এতে মতবিরোধ রয়েছে এই মর্মে যে, এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে খাস। অর্থাৎ গুনাহকে তুলে দেয়া হয়েছে; সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানকে নয়।[২]

অনুরূপভাবে শাফেয়ি মতাবলম্বী ও অন্যান্য অনেকেই বলেন যে, ওজুতে নিয়ত করা অন্যান্য ফরজের মতো ফরজ। অর্থাৎ ওজু সহিহ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত।[৩] তাঁরা তাদের এই রায়ের স্বপক্ষে "দাবি বা আবেদনের ব্যাপকতার নীতি" দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন, যেটি "নিশ্চয়ই মানুষের আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল" হাদিস থেকে বোঝা যায়।[৪]

"ফাতহুল বারি"-তে এসেছে— হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ বর্জনীয়। কারণ, যেসব কাজের ওপর নিয়তের হুকুম বর্তাবে সে কাজগুলোকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ হাদিসের মূলরূপ হচ্ছে- নিয়ত ব্যতীত কোন আমল নেই। যেহেতু নিয়ত বিহীনও আমল পাওয়া যায়, সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য আমলকে 'না' করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট হুকুমকে 'না' করা। যেমন- আমলের

---

১ শাফেয়ি, আল-উম্ম, খ. ১, পৃ. ১৪৭; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৪০৩-৪০৪, হা. ৫৭৩।

২ ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ফাতহুল বারি শরহু সাহিহিল বুখারি, খ. ৩, পৃ. ১০২।

৩ ইবনু কুদামা, আল-মুগনি, খ. ১, পৃ. ১১০।

৪ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৬, হা. ১, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।

বিশুদ্ধতা, পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদিকে 'না' করা। তবে নিয়তের বিশুদ্ধতা 'না' করাটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। কারণ, এটি মূল বিষয়কে 'না' করার সাথে অধিক সামঞ্জস্য রাখে।[১]

---

[১] ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ফাতহুল বারি, খ. ১, পৃ. ১৩।

القاعدة الرابعة: العَمَلُ بِخَبْرِ الواحِدِ إذا خالَفَ القِياسَ.

চতুর্থ মূলনীতি

'খবরে ওয়াহেদ' এবং 'কিয়াস' পরস্পর বিরোধী হলে, 'খবরে ওয়াহিদ'-এর ওপর আমল করা হবে

'খবরে ওয়াহেদ' (خَبَر واحِد) এবং কিয়াস (قِياس)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

মুহাদ্দিসগণের মতে 'খবরে ওয়াহেদ' হলো- এমন হাদিস যা মুতাওয়াতির[১](مُتَواتِر) নয়; হাদিসটির বর্ণনাকারী একজন হোক কিংবা আরো বেশি।

উসুলবিদদের মতে, 'খবরে ওয়াহেদ' হলো- এমন হাদিস যার বর্ণনা 'মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি।

উসুলবিদদের মতে, 'কিয়াস' হলো- একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিধানকে আরেকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা; উভয় বিষয়ে হুকুমটির ইল্লাত (কার্যকারণ) এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে।

জ্ঞাতব্য যে, দলিল উপস্থাপনায় সহিহ হাদিসকে ইজমা ও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা।

এটি একটি উসুলি মূলনীতি (Methodological Rule)। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ইবনু হাম্বাল এবং হাদিসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ এই মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। হাদিসের বর্ণনাকারী আলেম, ফকিহ হোক বা না হোক, সে পার্থক্য তাঁরা করেননি। কারণ, 'খবরে ওয়াহেদ' হলো- 'নস' (শরয়ি বক্তব্য), আর 'কিয়াস' হলো- ইজতিহাদ-ব্যক্তিগত অভিমত । 'নস' ইজতিহাদের ওপর প্রাধান্য পায়। আর যদি 'খবর'(হাদিস)টি অনুমানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হাদিস হয় (মুতাওয়াতির নয় এমন), তখনও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে।

---

[১] খবরে মুতাওয়াতির: এমন হাদিসকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়, যা সনদের প্রত্যেক স্তরে এমন একদল লোক দ্বারা বর্ণিত, যাদের পক্ষে সাধারণত যোগসাজশ করে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা অসম্ভব ঠেকে। (অনুবাদক)

'খবর' (হাদিস) কবুল হওয়া নির্ভর করে- বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকটি প্রাধান্য পাওয়ার ওপর। সাহাবায়ে কিরাম ও বর্ণনাকারীগণ সাধারণত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তারা হাদিস যেভাবে শুনেছেন ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

হানাফি ওলামায়ে কিরামও এই মূলনীতিটি গ্রহণ করেছেন, তবে শর্তসাপেক্ষে। তাদের শর্ত হলো- বর্ণনাকারীকে ফকিহ, ন্যায়পরায়ণ ও বর্ণিত হাদিস খুব ভালোভাবে মুখস্থ রেখেছেন–এমন হতে হবে।

'খবরে ওয়াহেদ' আর 'কিয়াস'-এর মাঝে দু'ভাবে বিরোধ হতে পারে:

এক. উভয়টি সর্বোতভাবে পরস্পরবিরোধী হবে। অর্থাৎ একটি দ্বারা ইতিবাচক বিধান সাব্যস্ত হলে অন্যটি দ্বারা নেতিবাচক বিধান সাব্যস্ত হবে।

দুই. উভয়টি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হবে না, বরং কোনো একদিক থেকে বিরোধী হবে। অর্থাৎ একটি আরেকটিকে খাস (নির্দিষ্ট) করে দেবে।

যদি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হয় তাহলে ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বাল, কারখি ও অনেক ফকিহগণ বলেন, খবর (হাদিস)টি কিয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর অনুসারীগণ বলেন, কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ঈসা ইবনে আবান বলেন, বর্ণনাকারী যদি আলেম হয়, বর্ণিত হাদিস তার কাছে ভালোভাবে মুখস্থ থাকে এবং তা সংরক্ষণে সতর্ক হয়, তখন তার 'খবর' (হাদিস) কিয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে। অন্যথায়, এর বিপরীতে ইজতিহাদের সুযোগ থাকবে (এবং প্রয়োজনে এর ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া যাবে)।

আর যদি 'খবরে ওয়াহেদ' 'কিয়াস'-এর অনুকূল হয়, তখন সবার ঐকমত্যে 'খবরে ওয়াহেদ'-এর ওপর আমল করবে।

মূলনীতি-এর প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

এই উসুলি মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস হলো– "নবি করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবি মুআজ (রা.)-কে ইয়ামেনে গভর্নর করে প্রেরণকালে বলেছিলেন, তুমি কী দিয়ে ফায়সালা করবে? মুআজ (রা.) বললেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে। তিনি বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মুআজ (রা.) বললেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ (হাদিস) দিয়ে ফায়সালা করবো। নবি করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি রাসুলের হাদিসেও না পাও, তাহলে? মুআজ বললেন, আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করবো, এ ব্যাপারে আমার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি থাকবে না।[১]

---

[১] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ , খ. ৩৬, পৃ. ৩২৮, হা. ২২০৬১; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০৩, পৃ. ৩০৩, হা. ৩৫৯২; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ০৩, পৃ. ০৯, হা. ১৩২৭।

এই হাদিসে মুআজ ইবনু জাবাল (রা.) কিয়াসের ওপর আমল করার কথাটিকে হাদিসের ওপর আমল করার পরে এনেছেন। সেক্ষেত্রে হাদিসটি মুতাওয়াতির হবে, নাকি আহাদ (একক সূত্রে বর্ণিত হাদিস); সেই ব্যাখ্যা তিনি করেননি এবং নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও তাকে সে কথার ওপর সম্মতি দিয়েছেন।

এটি এমন একটি মৌলিক মূলনীতি, যার ওপর ভিত্তি করে শাখাগত অনেক মাসআলায় ওলামায়ে কিরামের মাঝে প্রচুর মতবিরোধ হয়েছে। নিচে কয়েকটি আলোচনা করা হলো-

১। স্তন ফুলিয়ে রেখে পশু বিক্রয়: সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম বলেন– দুধ দোহনের পরে ক্রেতা যদি বুঝতে পারে, ক্রয়কৃত পশুটির ওলান (প্রতারণার উদ্দেশ্যে) ফুলিয়ে রাখা হয়েছিলো তখন তার ইখতিয়ার থাকবে, হয় সে পশুটি রেখে দেবে নতুবা দুধ দোহনের বিনিময় বাবদ এক সা (পরিমাপক বিশেষ) পরিমাণ খেজুরসহ পশুটি ফেরত দেবে।

তাঁদের দলিল হলো- বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

لَا تُصَرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنَ التَّمْرِ.

"উট, ছাগলের (বিক্রয় করার আগে) স্তনে দুধ জমা রেখে স্তনকে ফুলিয়ে রেখো না। যদি কেউ এরূপ করে তখন ক্রেতার জন্য দুধ দোহনের পর সুযোগ থাকবে– হয় সে পশুটি রাখবে, কিংবা দুধ পানের বিনিময়ে এক সা খেজুরসহ পশুটি ফেরত দেবে।"[১]

হানাফি আলেমগণ বলেন, স্তন ফুলিয়ে রাখার মতো দোষের কারণে ক্রয়কৃত পশু ফেরত দেয়া যাবে না এবং এক সা খেজুরও অতিরিক্ত দিতে হবে না। কারণ, হাদিসটি কিয়াসবিরোধী এবং হাদিসটির বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতো কোনো ফকিহ (ইসলামি আইনজ্ঞ) সাহাবিও নন।

২। ক্রয়-বিক্রয়ের বৈঠক চলাকালে প্রযোজ্য ইখতিয়ার: উল্লিখিত উসুলি মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম শাফে'য়ি, আহমদ ও মুহাদ্দিস ফুকিহগণ বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য خِيَارُ الْمَجْلِس (ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে প্রযোজ্য ইখতিয়ার) থাকবে। অর্থাৎ পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত উভয়ের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করা-না করার অধিকার থাকবে। তাদের দলিল হলো, ইবনু ওমর (রা.) এর বর্ণিত হাদিস। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ০৩, পৃ. ৭১, হা. ২১৫০; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ০৩, পৃ. ১১৫৫, হা. ১৫১৫; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০৩, পৃ. ২৭০, হা. ৩৪৪৩।

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"যদি দু'জন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে-অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।"[১]

কিন্তু ইমাম মালিক, আবু হানিফা ও তাদের অনুসারীগণ এই হাদিসের ওপর আমল করেননি। কারণ, এটি কিয়াস বিরোধী।

৩। সংখ্যাগুরু স্কলারের মতে কিয়াস এর ওপর 'খবরে ওয়াহেদ-কে প্রাধান্য দেয়ার অরেকটি উদাহরণ হলো- হজরত ওমর (রা.) দাহ্হাক বিন সুফয়ান এর 'খবর' (হাদিস) কবুল করেছেন। তার খবরের ভিত্তিতে তিনি স্বামী নিহত হওয়া স্ত্রীকে স্বামীর 'দিয়াত' (রক্তপণ) বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে মিরাস দিয়েছেন।[২] অথচ সেটি ছিলো কিয়াসবিরোধী। কারণ, কিয়াসের আলোকে মিরাস (Law of Inheritance) সাব্যস্ত হয় শুধুমাত্র ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে যা মৃত্যুর আগে মৃত ব্যক্তির মালিকানায় ছিলো। কিন্তু, 'দিয়াত' (রক্তপণ) ওয়াজিব হয় মৃত্যুর পরে। আবার দাহ্হাক নামক সাহাবি ফকিহও (ইসলামি আইনজ্ঞ) ছিলেন না।

---

[১] বুখারি, আল-জামি খ. ০৩, পৃ. ৬৪, হা. ২১১২; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ০৩, পৃ. ১১৬৩, হা. ১৫৩১।

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০৩, পৃ. ১২৯, হা. ২৯২৭; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ০৪, পৃ. ২৭, হা. ১৪১৫০, ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান, সহিহ।

القاعدة الخامسة: عَلى اليَدِ ما أَخَذَتْ حَتّى تُؤَدِّيْهِ.

পঞ্চম মূলনীতি

(ধাররূপে) গৃহীত বস্তু ফেরত না দেয়া পর্যন্ত গ্রহীতা দায়বদ্ধ থাকবে[১]

এই মূলনীতি মূলত একটি হাদিস থেকে গৃহীত, যা মুসনাদে আহমদ, চার সুনান ও মুসতাদরাক হাকিম-এ বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই সাহাবি সামুরা ইবনু জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি তাঁর সুনান গ্রন্থে এই হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন।

মূলনীতির ব্যাখ্যাঃ

'ما' (اِسْمُ مَوْصُوْل) 'ইসমে মাওসুল' বাক্যে বিদ্যমান ما أَخَذَتْ বাক্যাংশটি عَلى اليَدِ- এর (خَبَر مُقَدَّم) 'খবর মুকাদ্দাম'।[২] সুতরাং বাক্যটির উহ্যরূপ হবে এরকম-

أنَّ الَّذِيْ أَخَذَتْهُ اليَدُ ثَابِتٌ أو مُسْتَقِرٌّ عَلى اليَدِ لا يَرْتَفِعُ عَنْها إلّا بِالأَدَاءِ.

"যদি কোনো ব্যক্তি (ধাররূপে) কোনো জিনিস গ্রহণ করে, তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ধারকৃত জিনিসের জন্য সে দায়ী থাকবে"। অতএব গৃহীত বস্তু তার দায়িত্বে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ তা তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। এর (দায়িত্বের) শেষ সীমা হলো- গৃহীত বস্তু (মালিকের নিকট) ফিরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, সে তার জামিন হবে এবং ঐ জিনিস ফেরত না দেয়া পর্যন্ত দায়মুক্ত হবে না। আলোচ্য মূলনীতিতে يد (হাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- মালিক বা গ্রহীতা। এখানে মূলত শরীরের একটি অংশ (হাত) উল্লেখ করে সম্পূর্ণ শরীর (গ্রহীতা)কে বুঝানো হয়েছে। আর 'হাত' উল্লেখ করার কারণ হলোঃ

১। কোনো কিছু গ্রহণ করা বা প্রদান করা হাত দিয়েই হয়ে থাকে।
২। জোরপূর্বক দখলকাজে ব্যবহৃত 'হাত'-এর কারণেই হাতের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, যদিও পরবর্তীতে উক্ত জিনিস কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয় কিংবা তাতে কোনো দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে কোনো বিশ্বস্ত

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কবির, খ. ০৪, পৃ. ১৩০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ০২, পৃ. ৮০২; আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ০৫, পৃ. ০৮।

[২] আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে বাক্যস্থিত বিধেয়কে 'খবর' (خَبَر) বলা হয়। সাধারণত তা উদ্দেশ্যের পরে উল্লিখিত হয়। তবে কখনো কখনো খবরকে উদ্দেশ্যের পূর্বে উল্লেখ করা হলে তাকে 'খবর মুকাদ্দাম' (خَبَر مُقَدَّم) বলে।

ব্যক্তির হাতেও যদি 'গচ্ছিত সম্পদ' তার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলার কারণে নষ্ট হলে, তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই মূলনীতিটিকে জোরালোভাবে সাব্যস্তকারী আরেকটি মূলনীতি হলো- إِحْتِرَامُ مالِ الْمُسْلِمِ। "মুসলমানের সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা"। এধরনের মূলনীতিগুলো প্রমাণ করে যে– সম্পদের ওপর মালিকানা থাকার অর্থ হলো– সম্পদে মালিকের অনুমতি ব্যতিত অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না। যদি কেউ অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করার পর নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায়, মানব সম্পদের সিকিউরিটি-নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হতে থাকবে।

মোটকথা, মুসলমানদের রক্ত যেমন হারাম, তাদের সম্পদও হারাম। এমনকি অমুসলিমদের সম্পদও হারাম। আর 'মাকাসিদুশ শারী'আহ' (The Higher objectives of Sharia) বলতে বোঝায়– মানুষের জীবন, সম্পদ, বংশ, দ্বীন ও বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ করা। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণ করা- 'মাকাসিদুশ শারীআহ'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও বটে।

মূলনীতির প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১। যদি কোনো ব্যক্তি কিছু বিনিময় গ্রহণপূর্বক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিষ্পত্তি করে নেয় এবং মীমাংসা শেষে স্বীকার করে যে, ওখানে তার কোনো অধিকার ছিলো না; তখন সে যা কিছু গ্রহণ করেছে, সবকিছু ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

২। যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে ঋণদাতা মনে করে তাকে কোনো সম্পদ পরিশোধ করে দেয়, পরে প্রমাণিত হয় যে সে প্রকৃত ঋণদাতা ছিলো না, তাহলে পরিশোধিত সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে।

৩। কেউ যদি কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেয়, ঐ সম্পদ মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সে উক্ত সম্পদের জবরদখলকারী ও জামিন বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- لَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ أَوْ وِلَايَةٍ "অনুমতি বা অভিভাবকত্ব পাওয়া ব্যতিত অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ বৈধ নয়"।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

এই মূলনীতিটি মূলত একটি হাদিস, যা মুসনাদে আহমদ, চার সুনান ও মুসতাদরাক হাকিম- এ বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই সাহাবি সামুরা ইবনে জুনদাব (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

---

[১] মুস্তফা আজ-জারকা, আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, খ. ০১, পৃ. ৯৭৭।

القاعدة السادسة: العَدَمُ هُوَ الأَصْلُ فِيْ الصِّفاتِ العَارِضَةِ.

ষষ্ঠ মূলনীতি

নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিক অবস্থা হলো- অবিদ্যমানতা[১]

এই মূলনীতির সাথে মৌলিক মূলনীতি- اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের কারণে রহিত হয় না"-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে; বরং বলা যায়, সেটি এই মৌলিক মূলনীতি থেকে নির্গত।

মূলনীতির ব্যাখ্যা:

الأَصْل (আল-আস্‌ল) শব্দের অর্থ- বস্তুর মূল বা পুরাতন অবস্থা। الصِفَة (আস-সিফাহ) অর্থ: "বস্তুতে অতিরিক্ত যুক্ত হওয়া গুণ বা বৈশিষ্ট্য। যেমন, বস্তুর রং, নড়াচড়া, আওয়াজ ইত্যাদি। العَارِضَة (আল-আরিজা)-এর অর্থ- ক্ষণস্থায়ী। العَدَم (আল-আদাম) শব্দের অর্থ- অস্তিত্বহীনতা, অবিদ্যমানতা।"[২]

'নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিক অবস্থা হলো- অবিদ্যমান হওয়া, আর 'মূল বৈশিষ্ট্যের নীতি হলো- বিদ্যমান থাকা'। এ নীতির ভিত্তিতে বলা হয়, কোনো বস্তুতে নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো কি-না, এ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে; যে দাবি করবে, ছিলো না, তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে দাবি করবে, নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান ছিলো, তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে।[৩]

কোনো বস্তুর মাঝে দু'প্রকারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে:

১। মৌলিক বৈশিষ্ট্য: যা বস্তুতে শুরু থেকেই বিদ্যমান থাকে। যেমন, বিক্রীত পণ্য দোষ-ত্রুটিমুক্ত থাকা, মুদারাবা ব্যবসার মূলধন লাভ-লোকসানমুক্ত থাকা।

২। নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য: যা বস্তুতে সাধারণত শুরু থেকেই থাকে না, পরবর্তীতে যুক্ত হয়। যেমন, বিক্রীত পণ্যে দোষ-ত্রুটি পাওয়া যাওয়া, মুদারাবার মূলধনে লাভ বা লোকসান যুক্ত হওয়া।[৪]

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ ১৭, ধারা. ০৯

[২] আবুল বাকা আইয়ুব বিন মুসা আল-হুসাইনি আল-কাফাভি, আল-কুল্লিয়াত।

[৩] দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ০১, পৃ. ২৩, ধারা- ০৯।

[৪] মুহাম্মদ সিদ্‌কি আলে বুরনো, আল-ওয়াজিয ফি ইদাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়া, পৃ. ১৮৪।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই মূলনীতিটি অন্য একটি মৌলিক মূলনীতি- اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের কারণে রহিত হয় না" থেকে নির্গত। অতএব সেই মৌলিক মূলনীতির হাদিসগুলোই এই মূলনীতির প্রামাণ্য দলিল। সুতরাং বিস্তারিত জানতে 'ইয়া' অধ্যায়ের প্রথম মূলনীতি اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের কারণে রহিত হয় না" পড়ে নেয়া যেতে পারে।

মূলনীতির প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১। যদি কোনো ব্যক্তি অন্যজন থেকে ঘোড়া আথবা গাড়ি ক্রয়পূর্বক বুঝে নেয়। এরপর ক্রেতা এসে দাবি করে, পণ্যটিতে পুরাতন দোষ রয়েছে। আর বিক্রেতা বলে, না, তাতে কোনো দোষ-ত্রুটি ছিলো না। তবে তাদের কারো কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় বিক্রেতাকে শপথ করিয়ে তার দাবিকে প্রাধান্য দেয়া হবে। কারণ, বস্তুর 'আসল' বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো- দোষ-ত্রুটিমুক্ত থাকা। আর 'আসল'-এর বিপরীত যে দাবি করবে, তাকেই প্রমাণ দিতে হবে। কারণ, দোষ-ত্রুটি হলো নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য।[১]

২। যদি নিজ স্বীকারোক্তি বা প্রমাণের মাধ্যমে কারো ওপর ঋণ সাব্যস্ত হয়, এরপর সে দাবি করে, উক্ত ঋণ সে পরিশোধ করে দিয়েছে বা সে ঋণমুক্ত ছিলো, কিন্তু পাওনাদার তা অস্বীকার করে, তখন পাওনাদারের দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, ঋণ যখন সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন 'আসল' বা মৌলিক বিধান হলো- ঋণ আদায়ের প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। অতএব ঋণগ্রস্ত হওয়াটাই আসল, ঋণমুক্ত থাকাটা নৈমিত্তিক। সুতরাং আসল বিষয়টি-ই গ্রহণযোগ্য হবে, নৈমিত্তিক বিষয় (ঋণমুক্ত হওয়া) অগ্রাহ্য হবে।[২]

৩। যদি কেউ অন্যের খাদ্য খেয়ে দাবি করে, তাকে খাদ্যের মালিক অনুমতি দিয়েছে; কিন্তু মালিক তা অস্বীকার করে, তখন মালিকের দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মালিকের দাবি 'আসল' (অনুমতি ব্যতিত কারো খাদ্য বৈধ না হওয়া)-এর স্বপক্ষে। অপরদিকে, অন্যের খাদ্য বৈধ হওয়া- নৈমিত্তিক বিষয়, যা অবৈধ হওয়াটাই আসল।[৩]

এই মূলনীতিনির্ভর আরো বহু ফিকহি উদাহরণ রয়েছে। মূলনীতিটি বিচারিক প্রমাণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলিল কিংবা স্বীকারোক্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া না গেলে এটি দিয়েই বিচারক ফায়সালা করে থাকেন।

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৫৮, ইবনু নুজাইম, খ. ০১, পৃ. ১১৫; শরহুল মাজাল্লাহ, পৃ. ২৩; মুহাম্মদ সিদ্কি আলে বুরনো, আল-ওয়াজিয ফি ইদাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়া, পৃ. ১৮৪।

[২] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ন নাজায়ির, পৃ. ৫৮; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, খ. ০১, পৃ. ১১৫।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

القاعدة السابعة: العِبْرَةُ بِالغَالِبِ ولَا عِبْرَةِ بِالنَّادِرِ.

সপ্তম মূলনীতি

অধিকাংশের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ হয়, বিরল বিষয় অবিবেচ্য

মূলনীতির মর্মার্থ হলো- যদি অধিকাংশের ভিত্তিতে শরয়ি কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি সাধারণভাবে সবার ওপর প্রযোজ্য হবে। স্বল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে উপর্যুক্ত বিধান প্রয়োগ না হলে, তা বিবেচনায় নেয়া হবে না।

এই মূলনীতিটি অন্য আরেকটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি- إِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ "শুধুমাত্র বহুল প্রচলিত রীতিনীতিই গ্রহণযোগ্য"-এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ইসলামি আইনের মৌলিক বিধান হলো- অধিকাংশ বা প্রচলিত বিষয়কে বিবেচনা করা, বিরল বিষয় বা স্বল্প সংখ্যকের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়ত সফর অবস্থায় অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। যেমন, সালাতে কসর করা (চার রাকাতকে দু'রাকাত পড়া), 'জামা বাইনাস সালাতাইন' (দু'ওয়াক্ত সালাতকে একত্রে পড়া), রোজা ছেড়ে দেয়া (পরে কাজা করার শর্তে) ইত্যাদি। কারণ, সফরে কষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে প্রবল। সুতরাং এ প্রবল অবস্থার ভিত্তিতে মুসাফিরের কোনো কষ্ট না হলেও তার জন্য রুখ্সাত গ্রহণ (বিকল্প পদ্ধতি/ছাড়যুক্ত বিধান) বৈধ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

غين /গাইন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

(এ অধ্যায়ের অধীনে একটি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة: الغُرْمُ بالغُنْمِ.

মূলনীতি:
লাভ অনুযায়ী ঝুঁকি বহন করতে হয়[১]

(মূলনীতিটি এভাবেও এসেছে- مَنْ له الغُنْمُ عليه الغُرْمُ "যে লাভের অংশীদার হবে তাকে ঝুঁকিও নিতে হবে"; الغُنْمُ بِالْغُرْمِ "ঝুঁকি যেখানে লাভ সেখানে")

মূলনীতির অর্থ ও বিশ্লেষণ:

الغُنْم। এর আভিধানিক অর্থ হলো- কোনো বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা, লাভবান হওয়া, মুনাফা লাভ করা। এই সাফল্য বা মুনাফা লাভ-ই মূলত কোনো বিষয়ের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলরূপে বিবেচ্য হয়।

আর الغُرْم- এর শাব্দিক অর্থ হলো- ঋণ, অত্যাবশ্যকীয় জিনিস আদায় করা, একজন ব্যক্তিকে জান কিংবা মালের ক্ষতিপূরণ বাবদ যা দিতে হয় তাই غُرْم।

مَنْ له الغُنْمُ عليه الغُرْمُ বা الغُنْمُ بالغُرْم অথবা একই অর্থে অন্য কোনো বাক্য হোক; যেমন, النَقْمَةُ بِقَدْرِ النِعْمَةِ "যেমন কষ্ট, তেমন ফল" এবং النِعْمَةُ بِقَدْرِ النَقْمَةِ "কষ্ট যেমন, ফলও তেমন", no reward without risk "যেখানে ঝুঁকি নেই সেখানে পুরস্কারও নেই"।

অর্থাৎ, যে ফল ভোগ করবে, তাকে ঝুঁকি নিতে হবে। যেমন, যৌথ কারবারে প্রত্যেককে তার পুঁজি অনুযায়ী লাভের অনুপাতে ঝুঁকি বহন করতে হয়।

আর কোনো জিনিসের ব্যয় ও লোকসানের ভার সেই ব্যক্তি বহন করবে, যে উক্ত জিনিস থেকে শরিয়তসম্মতভাবে উপকৃত হয়।

এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মূলনীতি। এরূপ আরেকটি মূলনীতি রয়েছে; যেমন, الخَرَاجُ بالضَّمَانِ "ঝুঁকির কারণেই লাভের অধিকারী হওয়া যায়"। যদিও সরল অর্থের দিক থেকে মূলনীতি দু'টি ভিন্নার্থক, তবে এ দু'টিকে সূক্ষ্মভাবে দেখা হলে বোঝা যায়, এর সাধারণ উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্য বহন করতে হবে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সে ভোগ করে;

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৬, ধারা. ৮৭

যেনো দায়িত্ব বহন এবং অধিকার ও সুবিধা গ্রহণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কেউ যেনো অন্যের খরচে লাভের ভাগ বসাতে না পারে।

উল্লিখিত মূলনীতিদ্বয় অর্থেও দিক থেকে ভিন্ন হলেও মূলনীতি দু'টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, ইসলামি শরিয়ত মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করে।

الغُرْمُ بالغُنْمِ "লাভ যেখানে ঝুঁকিও ঠিক সেখানেই" এই মূলনীতিটি চুক্তির গ্যারেন্টিসংক্রান্ত বিষয়ের অধীনে আলোচিত হয় এবং প্রচলিত আইনে প্রসিদ্ধ নীতি الإثْرَاءُ بلا سَبَبٍ "বিনা কারণে সমৃদ্ধি"/"Illicit enrichment"কে অস্বীকার করে, যা মানব রচিত মূলনীতিগুলোর একটি।

মূলনীতির মূলভিত্তি যে হাদিসটি:

আলোচ্য মূলনীতিটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস الخَرَاجُ بالضَمانِ "ঝুঁকির কারণেই লাভের অধিকারী হওয়া যায়"[১]-এর মর্মার্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মূলত এ মূলনীতির মাঝে ইতোপূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি الخَراجُ بالضِمانِ-এর অর্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–যেটি সরাসরি হাদিসের টেক্সট এবং একটি মূলনীতি হিসেবেও প্রসিদ্ধ।

শায়খ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি (রহ.) বলেন, "যেসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলো বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হলো- الغُرْمُ بالغُنْمِ "লাভ যেখানে ঝুঁকিও ঠিক সেখানেই", যার মূল ভিত্তি ও উৎপত্তি হলো:

এক. রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচারিক ফায়সালা- الخَراجُ بالضَّمانِ "ঝুঁকির কারণেই লাভের অধিকারী হওয়া যায়।"[২]

দুই. রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরেকটি হাদিস-

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"বন্ধক রাখা বস্তু থেকে তার মালিককে বঞ্চিত করা যাবে না, যা লাভ হবে তা তার, এবং লোকসানও তাকেই নিতে হবে।"[৩]

---

[১] خاء (খা) অক্ষরের প্রথম মূলনীতির আওতায় হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

[২] শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ০২, পৃ. ২৬২।

[৩] ইমাম শাফেয়ি ও দারাকুতনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসের সনদ হাসান, মুত্তাসিল (হাদিস নং- ১৪০৬); নাছির উদ্দিন আলবানি, ইরওয়াউল গলিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবিল, পৃ. ২৩৯।

হাদিসে উল্লিখিত শব্দ غُنْمُهُ- দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বন্ধককৃত বস্তু থেকে বর্ধিত ও উৎপন্ন বস্তু; আর غُرْمُهُ- দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধ্বংস হওয়া ও হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ নষ্ট করবে, হোক সেটি বন্ধকী কিংবা ভাড়াকৃত সম্পদ কিংবা গচ্ছিত আমানত; তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তিন. তেমনিভাবে এই মূলনীতিটি খুঁজে পাওয়া যায়, হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে। হাদিসটি এরকম- "হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আনাস (রা.)-এর ব্যাপারে একটি গচ্ছিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ফায়সালা দিয়েছিলেন, যেটি তাঁর কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিলো কিংবা হারিয়ে গিয়েছিলো।"[১]

ইমাম বায়হাকি (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, সংরক্ষণে অবহেলা করার কারণে মূলত তাঁকে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়েছিলো। যদি অবহেলা করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে গচ্ছিত সম্পদ নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়, যেমন- কেউ যদি জোরপূর্বক সম্পদটি ছিনিয়ে নেয়, তখন এর ক্ষতিপূরণ আসবে না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমানতদার ব্যক্তির ওপর ক্ষতিপূরণ নেই।"[২]

মূলনীতির প্রায়োগিক মাসআলাসমূহ:

১. ধারকৃত বস্তু ধারদাতার কাছে ফেরত দেওয়া বাবদ যাবতীয় খরচ ধারগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। কারণ, সে ধারকৃত বস্তু থেকে সুবিধা ভোগ করেছে, সুতরাং তাকেই ফেরতসংক্রান্ত ব্যয় বহন করতে হবে।

২. আমানতের বস্তু ফিরিয়ে দেয়াসংক্রান্ত পুরো ব্যয়ভার আমানতদাতাকে বহন করতে হবে। কারণ, তার কল্যাণের জন্যই আমানত রাখা হয়।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ে দলিল ও চুক্তিনামা লেখার খরচ খরিদদারকে বহন করতে হবে। কারণ, সেটি সম্পদে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও সুবিধা ভোগ করার রেজিস্ট্রেশন।

৪. যৌথ সম্পদ মেরামত করতে হলে প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশানুপাতে মেরামত করবে। কেননা, প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশানুপাতে সুবিধা ভোগের অধিকার অর্জন করে।[৩]

---

[১] শরহুজ জারকাশি আলা মুখতাসারিল কারখি ফিল ফিকহি আলা মাজহাবিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল।

[২] দারাকুতনি, আস-সুনান, পৃ. ৩০৬; বায়হাকি, খ. ০৬, পৃ. ২৮৯ ।

[৩] এসব প্রায়োগিক ও শাখাগত মাসআলাগুলো মুহাম্মদ মুস্তফা আজ-জুহায়লি প্রণিত "আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ ওয়া তাতবিক্বাতুহা ফিল মাজাহিবিল আরবাআ" নামক গ্রন্থে (৫৪৩) নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

فاء/ফা দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

(এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে একটি মূলনীতি)

القاعدة: فِيْ إِطْلاقِ الاِسْمِ اِعْتِبارُ العُرْفِ.

মূলনীতি:

কোনো নাম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলে, এর অর্থ নির্ধারণে প্রচলিত রীতি বিবেচ্য হয়[১]

মূলনীতির অর্থ ও বিশ্লেষণ:

এই মূলনীতিটি সমাজে প্রচলিত রীতি ও প্রথার সাথে সম্পৃক্ত এবং মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ "(আইন প্রণয়নে) প্রচলিত রীতি নিয়ামকরূপে বিবেচ্য" মূলনীতির একটি শাখা।

'উর্‌ফ' বলতে বুঝায়, যুক্তির নিরিখে মানুষ যা স্থীর করে নিয়েছে এবং তা স্বভাবে পরিণত হয়েছে[২], অথবা 'উর্‌ফ' হলো, কোনো কথা বা কাজে বিরাট সংখ্যক জনগোষ্টির প্রচলিত রীতিনীতি।[৩]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

যে হাদিসের ওপর ভিত্তি করে এই মূলনীতিটি নির্মিত সেটি হলো-

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنه، قَالَ: إِنَّ صَاحِباً لنا أَوْجَبَ بَدَنَةً، أَفَتُجْزِئُه البَقرَةُ؟ فَقَالَ: مِمَّ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: مِنْ بَنِيْ رَبَاحٍ، فَقَالَ: ومَتى اِقْتَنَتْ بَنُوْ رَبَاحٍ البَقرَةَ؟ إِنَّما وَهِمَ صَاحِبُكُمْ الإِبِلَ.

"এক ব্যক্তি ইবনু ওমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের এক সাথী 'বাদানা' (পূর্ণ একটি গরু কিংবা উট) মানত করেছে, সে কি গরু কুরবানি দিলে হবে? ইবনু ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের সাথী কোন গোত্রের? লোকটি বললো, রাবাহ গোত্রের। ইবনু ওমর (রা.) বললেন, রাবাহ গোত্রের লোক গরু পাবে কোথায়? নিশ্চয়ই তোমাদের সাথী উটকে بَدَنَة (বাদানা) বিবেচনা করেছে"।[৪]

---

১ বারাকাতি, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৯৬, মূলনীতি- ২০২।

২ জুরজানি, আত-তারিফাত, পৃ. ১৯৩।

৩ মুস্তাফা আহমদ আজ-জারকা , আল-মাদখালুল ফিক্‌হি আল-আম, খ. ০২, পৃ. ৮৭২।

৪ সারাখসি, শরহু সিয়ারিল কাবির, খ. ০৫, পৃ.৭৮।

মূলনীতির প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ:

১. স্ত্রীর খোরপোষ সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দিতে হবে। যেমন, কুরআনে কারিমে এসেছে–

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো"। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন–

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের ওপর (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"সন্তান যে পিতার, তার কর্তব্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের (মায়েদের) খোরপোষের ভার বহন করা।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩]

২. কুরআনে বর্ণিত এতিমদের সম্পদ থেকে ভক্ষণ করার বিষয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"আর (এতিমদের অভিভাবকদের মধ্যে) যে নিজে স্বচ্ছল, সে তো নিজেকে (এতিমদের সম্পদ খাওয়া থেকে) সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখবে আর যে অভাবগ্রস্থ সে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তা খেতে পারবে।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৬]

ইবনু তায়মিয়া (রহ.) বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত হলো- স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারিত হয় সামাজিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে। এটি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়; বরং স্থান, কাল, স্বামী-স্ত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের প্রচলিত রীতি ভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।"[১]

৩. যদি কেউ শপথ করে, সে কখনোই دَابَّة (প্রাণী)-এর ওপর আরোহণ করবে না, (আর دَابَّة বলতে তাদের সমাজে শুধুমাত্র গাধা ও ঘোড়াকে বুঝানো হয়) তাহলে

[১] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৪, পৃ. ৮৩

এ দু'য়ের কোনো একটি ব্যতিত অন্য যেকোনো প্রাণীর ওপর আরোহণ করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। সুতরাং সে যদি গরু কিংবা উটে আরোহণ করে, শপথ ভঙ্গকারী হবে না, যদিও دَابَّة (প্রাণী) শব্দটি আভিধানিক অর্থে পৃথিবীতে বিচরণকারী সব ধরনের প্রাণীকে বুঝায়।

৪. যদি কেউ শপথ করে বলে- সে بَدَنَة (কুরবানি) দেবে, তবে যদি সে উট আছে এমন গোত্রের লোক হয়) তাহলে তাকে উট বা উটনী দিয়েই কুরবানি দিতে হবে। আর যদি সে গরু আছে এমন গোত্রের লোক হয় এবং উট কী, তা চিনে না তাহলে সে গরু ছাড়া অন্য কোনো জন্তু কুরবানি দিলে হবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ق/ক্বফ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে দু'টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: قَبُوْلُ الخَبْرِ الواحِدِ فِيْمَا تَعُمُّ بِه البَلْوى.

প্রথম মূলনীতি

সচরাচর ঘটে থাকে– এরূপ কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহেদ' (সনদের কোনো এক স্তরে একজন রাবি বিশিষ্ট হাদিস)-কে গ্রহণ করা

এটি উসুলুল ফিক্হের (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্র) একটি মূলনীতি। ইমাম মালিক, শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)-এর মতে, সচরাচর ঘটে থাকে এ জাতীয় কোনো বিষয়সংক্রান্ত **'খবরে ওয়াহেদ'**-কে কবুল করা যাবে। কিন্তু পূর্ববর্তী হানাফি আলেম ইমাম কারখি (রহ.) এবং পরবর্তী সকল হানাফি আলেমের মতে, এ ধরনের **'খবরে ওয়াহেদ'**-কে কবুল করা যাবে না। তার ওপর আমলও করা যাবে না।[১]

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

আলোচ্য মূলনীতির প্রমাণসরূপ এমন অসংখ্য 'নস' (শরয়ি দলিল) রয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে– খবরে ওয়াহেদ সচরাচর প্রায়ই ঘটে– এমন কোনো বিষয়সংক্রান্ত হোক বা না হোক, তা (সহিহ সনদে বর্ণিত হলে) গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন–

১. ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَا نُخَابِرُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا نَرى بذلك بَأساً حَتّى رَوى لنَا رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ ذلك فَانْتَهَيْنا.

"আমরা চল্লিশ বছর ধরে জমি বর্গা দিয়ে আসছিলাম, সেটাকে আমরা কোনো অপরাধ মনে করতাম না। ইত্যবসরে, রাফে ইবনু খাদিজ (রা.) আমাদেরকে হাদিস শোনালেন যে, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। সেদিন থেকে আমরা আর করিনি।"[২]

---

[১] দেখুন, আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ০২, পৃ. ১১২

[২] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আমেদি, আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ. ০২, পৃ. ১১২; ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.)ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২. এক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ হলো– বীর্যপাত ব্যতীত দুই যৌনাঙ্গের মিলন হলে গোসল ওয়াজিব হবে কি-না, এ নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্য ছিলো। কিন্তু যখন তারা হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ পেয়ে গেলেন তখন সবাই গোসল ওয়াজিব হওয়ার ওপর ঐকমত্য পোষণ করলেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত খবরে ওয়াহেদটি হলো এরকম–

إذا اِلْتَقى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، فَعَلْتُه أنا ورَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واغْتَسَلْنَا.

"যদি দুই যৌনাঙ্গ একত্রিত হয়, গোসল ওয়াজিব হবে। আমি ও রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর মাঝে এমনটি হয়েছিলো; আর আমরা গোসল করেছিলাম।"[১]

উল্লেখিত মূলনীতিটিতে স্কলারদের মতবিরোধের ভিত্তিতে ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। নিচে তার কয়েকটি পেশ করা হচ্ছে।

এক. পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওজু ভেঙ্গে যাওয়া:

উল্লিখিত উসুলি (ইসলামি নীতিমালা বিষয়ক) মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়িসহ সংখ্যাগুরু আলেমের মতে, হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা.) এর হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। নবি করিম (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

"مَنْ مَسَّ ذَكَرَه، فلا يُصلِّ حتَّى يتوضَّأ"

"যে ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলো সে যেনো নামাজ পড়ার আগে অবশ্যই ওজু করে নেয়।"[২]

আর হানাফি আলেমদের মতে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওজু নষ্ট হবে না। তারা কাইস ইবনু তাল্ক (রা.)-এর হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। কাইস ইবনু তাল্ক তার বাবা তাল্ক ইবনু আলি (রা.) হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ هَلْ عَليه أنْ يَتَوَضَّأَ؟ فقَالَ: لا هَلْ هو إلّا بُضْعَةٌ مِنْه.

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১৯৯, হা. ৬০৮; আমেদি, আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খ.০২, পৃ. ১১২

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১৬১, হা. নং ৪৭৯; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ৪৬, হা. ১৮১; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১৩৯, হা. ৮২, তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন; নাসায়ি, আল-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১০০, হা. ১৬৩-১৬৪।

"তিনি রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে তাকে আবার ওজু করতে হবে কি-না? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "না, এটি শরীরের-ই একটি অঙ্গ মাত্র।"[১]

তাঁরা বুসরা (রা.)-এর হাদিসের ব্যাখ্যায় এভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন যে– খবরে ওয়াহেদটি সচরাচর প্রায়ই ঘটে থাকে– এরূপ বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না।[২]

দুই. উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট সালাতে সুরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বড়ো আওয়াজে পড়া:

উল্লিখিত উসুলি মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অভিমত হলো, উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট সালাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বড়ো আওয়াজে পড়া হবে। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা.) এর হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। হজরত আনাস (রা.) বলেন-

صَلّى مُعاوِيةُ بالمدينةِ صلاةً فجَهَرَ فيها بالقِراءَةِ، فقرأ بسمِ الله الرحمن الرحيم "لأُمّ القرآن ".

"হজরত মুআবিয়া (রা.) মদিনায় উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট নামাজের ইমামতি করেছেন। তিনি সুরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' পড়েছেন।"[৩]

আর হানাফিদের মতে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' নিচুস্বরে পড়া হবে। তারা আনাস ইবনু মালিকের হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন, তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا منهمْ يَقْرَأُ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

"আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর, ওমর ও ওসমানের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, কিন্তু কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' পড়তে শুনিনি।"[৪]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ২৬, পৃ. ২১৪-২২২, হা. ১৬২৮৬, ১৬২৯২, ১৬২৯৫, আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ৪৬, হা. ১৮২, নাসায়ি, আল-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১০১, হা. ১৬৫।

[২] কারণ, এ ধরনের বিষয়সমূহ রাসুল কেবল একজন বা দুজনকে বর্ণনা করবেন, এমনটি যৌক্তিক মনে হয় না; বরং রাসুল তা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বর্ণনা করবেন, এমনটিই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ঠেকে।

[৩] শাফেয়ি, আল-উম্ম, খ. ০১, পৃ. ১৩০, হাকিম, আল-মুসতাদরাক, খ.০১, পৃ. ৩৫৭, হা. ৮৫১, তিনি হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

[৪] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ২০, পৃ. ১৯৯, হা. ১২৮১০, মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ০১, পৃ. ২৯৯, হা. ৩৯৯; নাসায়ি, আল-সুনান, খ. ০২, পৃ. ১৩৫, হা. ৯০৭।

তিন. রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় হাত তোলা:

উল্লিখিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ি, মালিক, আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ.)সহ সংখ্যাগুরু সাহাবিদের অভিমত হলো- সালাতের মধ্যে রুকুতে যেতে ও উঠতে দু'হাত উঠাবে, যেভাবে তাকবিরে তাহরিমার মধ্যে উঠানো হয়। তাদের দলিল হলো, ইবনু ওমর (রা.)-এর হাদিস। তিনি বলেন-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلى الصَّلاةِ رفَعَ يَدَيْه حَتي يَكُونا بِحَذْوِ مَنْكِبَيه، ثم يُكَبِّرُ، فإذا أرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهما، وإذا رَفَعَ مِنْ الرُكوعِ رَفَعَهما كذلك أيضاً.

"রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাতে দাঁড়াতেন, উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং তাকবির বলতেন। অতঃপর তিনি যখন রুকু করতেন, উভয় হাত উঠাতেন আর যখন রুকু থেকে উঠতেন, তখনও একইভাবে উভয় হাত উঠাতেন।"[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তাঁর অনুসারী ও একদল কুফাবাসীর অভিমত হলো- শুধুমাত্র তাকবিরে তাহরিমার মধ্যে হাত উঠাবে। তারা ইবনু মাসউদের হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন,

لأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْه إلّا مَرَّةً وَاحِدَةً

"আমি তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সালাত পড়ে দেখাবো। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন, কিন্তু শুধুমাত্র একবার হাত ওঠালেন।"[২]

ইবনু ওমর (রা.)-এর হাদিসটি 'সাহিহাইন' (বুখারি-মুসলিম)-এ থাকা সত্ত্বেও তারা সেই হাদিসের ওপর আমল করেননি। কারণ, সেটি সচরাচর ঘটে- এমন বিষয়সংশ্লিষ্ট ছিলো, যা প্রসিদ্ধ হওয়ার কথা; কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়নি।

---

[১] বুখারি, আস-সহিহ, খ. ০১, পৃ. ১৪৮, হা. ৭৩৫; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ০১, ২৯২, হা. ৩৯০; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১৯২, হা. ৭২২।

[২] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ০৬, পৃ. ২০৩, হা. ৩৬৮১; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ০১, পৃ. ১৯৯, হা. ৭৪৮; তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ০১, ৩৪৩, হা. ২৫৭।

القاعدة الثانية: القَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلى قِدَمِهِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

পুরনো জিনিসকে পুরনো অবস্থাতেই বহাল রাখা হয়[১]

এ মূলনীতির সাথে মৌলিক একটি মূলনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বরং বলা য়ায়, এটি সেই মৌলিক মূলনীতি থেকে উৎকলিত। মূলনীতিটি হলো– اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের কারণে রহিত হয় না"।

উদাহরণস্বরূপ, যদি মুদারাবা ব্যবসায় মুনাফা হওয়া-না হওয়া নিয়ে শরীকদ্বয়ের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয় তখন 'মুদারিব' (ব্যবসা পরিচালনাকারী)-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুনাফা হয়েছে, তা প্রমাণ করতে 'রাব্বুল মাল' (অর্থযোগানদাতা)কে দলিল পেশ করতে হবে।

আলোচ্য মূলনীতির অর্থ হলো- রাস্তা, নালা ইত্যাদির মতো বস্তুসমূহকে তার পুরাতন অবস্থায় বহাল রাখা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরাতন অবস্থার বিপরীতে কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়।

মূলনীতির বিশ্লেষণ:

পুরাতন বৈধ জিনিস তার নিজস্ব অবস্থাতেই বহাল রাখা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বিপরীতে দলিল পাওয়া যায়। কারণ, মুসলমানদের প্রতি এরকম সুধারণা রাখতে হয় যে, সে কাজটি বৈধ পন্থায় সম্পন্ন করেছিলো।

এই মূলনীতির আলোকে বলা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের কাছে বিদ্যমান থাকা বস্তু, সেবা ও রাস্তাসমূহ মূলত বৈধ এবং সেগুলো তাদের কাছেই বহাল থাকবে। দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যমান থাকাটাই বৈধ অধিকারের একটি প্রামাণ্য দলিল। সুতরাং যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়া কারো কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। যদি অনেক দিন আগ থেকে কারো নর্দমার পানি অন্য কারো ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যায় কিংবা কেউ অন্যের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে অথবা কারো ঘরের রুম অন্যের দেওয়ালের ওপর ভর করে থাকে, সেগুলো সরানো হবে না; বরং সেগুলো আপন

[১] মাজাল্লাতুল আহকামল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৬, ধারা- ৬

অবস্থায় বহাল থাকবে। মূলত মুসলমানদের প্রতি সুধারণা রাখার নিমিত্তে দীর্ঘকালীন বিদ্যমানতাকে সেসব বস্তুর বৈধতার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আর সেগুলো সরিয়ে দেয়া বহুকাল স্থায়িত্বশীল অধিকার নষ্ট করার নামান্তর।

মূলনীতিটিতে القَدِيْم- দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পুরনো বৈধ বস্তু। আর যদি পুরনো অবৈধ বস্তু হয় তাহলে তা অন্য মূলনীতি الضَرَرُ لا يَكُوْنُ قَدِيْماً "ক্ষতিকারক বস্তু কখনো পুরনো হওয়ার বিধান লাভ করে না" এর নিমিত্তে দূরীভূত করা হবে।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসঃ

যেহেতু এই মূলনীতিটি একটি মৌলিক সামগ্রিক মূলনীতি اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের কারণে রহিত হয় না" থেকে নির্গত, সুতরাং উক্ত মূলনীতির হাদিসগুলো এই শাখা মূলনীতির দলিল বলে গণ্য হবে। সেই দলিলগুলো জানতে মৌলিক মূলনীতিটি পুনরায় দেখা যেতে পারে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

كاف/কাফ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৩টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: كُلُّ مَا يَضُرُّ فَأَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ حَرَامٌ.

প্রথম মূলনীতি

যেকোনো ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া কিংবা পান করা হারাম[১]

মূলনীতিটির সারবক্তব্য:

কোনো মুসলমানের জন্য এমন কোনো খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্য সেবন করা বৈধ নয় যা কিনা দ্রুত কিংবা বিলম্বে তার প্রাণনাশ করবে। যেমন, যেকোনো ধরনের বিষ, অথবা যা তার ক্ষতিসাধন করবে কিংবা কষ্টের কারণ হবে। কারণ কোনো মুসলিম (মানুষ) নিজের সত্তার মালিক নয়। হ্যাঁ, সে তার ধর্ম-কর্ম, জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদের মালিক। বরং এগুলোও আল্লাহর নেয়ামত যা তার কছে আমানত।

মূলনীতির কুরআনিক ভিত্তি:

(১) মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

(২) তিনি আরো বলেন-

﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না; বরং কল্যাণ কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকামীদেরকে ভালোবাসেন।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫]

---

[১] কারজাভি, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ৭১।

হাদিস থেকে মূলনীতির ভিত্তি:

যে হাদিস থেকে আলোচ্য মূলনীতিটি সংগৃহীত, তা হচ্ছে হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের রিওয়ায়াত (বর্ণনা)। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.

"নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা- কোনোটাই বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কারো ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহও তার ক্ষতিসাধন করবেন। যে কঠোরতা প্রদর্শন করে আল্লাহও তার প্রতি কঠোর প্রদর্শন করবেন।"[১]

মূলনীতির প্রয়োগিক উদাহরণ:

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে আমরা বলতে পারি, যেহেতু তামাক (ধুমপান) সেবনকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, তাই তা হারাম ও অবৈধ। বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তির জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তা ক্ষতিকর বলে সাব্যস্ত করে। তদুপরি এর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি পরিলক্ষিত না হলেও এতে সংঘটিত হয় সম্পদ নষ্ট করার অপরাধ, এমন বিষয়ে যাতে দিন-দুনিয়ার কোনো উপকার নেই। অথচ নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পদ নষ্ট করা থেকে নিষেধ করেছেন।[২]

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, খ. ২, পৃ. ৬৬, হা. ২৩৪৫।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১২১, আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯২, হা. ৭২২।

القاعدة الثانية: الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

লিখিত বিবরণ উক্তির সমতুল্য[১]

অন্যান্য শব্দে মূলনীতির বিবরণ:

(الْبَيَانُ بِالْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ، الْبَيَانُ بِالْكِتَابِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ)
"লিখিত বিবরণ উক্তির বিবরণের স্তরে গণ্য। লিখে বিবরণ দেয়া মুখে বিবরণ দেয়ার মতো।"

মূলনীতির ব্যাখ্যা:

অনুপস্থিত দুই ব্যক্তি বা দুই পক্ষের মধ্যকার লিখিত বর্ণনা উপস্থিত দুই ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যকার উক্তির মতোই গণ্য হবে। কারণ, কলম দুই ভাষ্যকারের (মনের ভাব ব্যক্ত করার দুই উপকরণের) একটি। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালতের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আদিষ্ট ছিলেন। আর তিনি সে দায়িত্ব কোনো সময় লিখিত আকারে আবার কোনো সময় বক্তব্য আকারে পৌঁছে দিয়ে পালন করেছেন।

লেখার মাধ্যমে বিধান প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত প্রযোজ্য:

এক. লেখা সুস্পষ্ট হওয়া। এক্ষেত্রে সলিল পৃষ্ঠে কিংবা হাওয়া ও অনুরূপ কিছুর ওপর লেখা লিপি গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. লেখা অফিসিয়াল হওয়া। অর্থাৎ, মানুষের মাঝে প্রচলিত লিখন পদ্ধতি ও নিয়ম মতে সম্পন্ন হওয়া। মানুষের মাঝে প্রচলিত লিখন পদ্ধতি বলতে শিরোনাম এবং প্রেরক ও প্রাপকের নামসম্বলিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে প্রয়োগিক উদাহরণ উপস্থাপিত হলো:

যেমন কোনো ব্যক্তি দামেশকে বসবাস করেন। তিনি কুফা শহরে বসবাসরত জনৈক ব্যক্তির নামে এ মর্মে লিপি প্রেরণ করেন যে, আমি আমার অমুক বাড়িটি আপনাকে বিক্রি করলাম যার বিবরণ এমন-এমন। আর কুফার ক্রেতা ব্যক্তিও

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ৬৯।

লিখলেন- হ্যাঁ, আমি বাড়িটি ক্রয় করলাম। তাহলে এই বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ লিখিত বর্ণনা মৌখিক ভাষ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য হয়। বস্তুত মানুষের মাঝে প্রচলিত নিয়মে যা লিপিবদ্ধ হয় তা মৌখিক উক্তির ন্যায় প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাকের উদ্দেশ্যে লিখে, "তুমি তালাক।" এবং তা স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেয় তাহলে এই লিপি দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সরাসরি তালাক উচ্চারণে তালাক হয়ে যায়।

মূলনীতির প্রামাণিকতা:

এই ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মূলনীতির ওপর চলে আসছে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তদপরবর্তী সাহাবিদের আমল। কারণ, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন গোত্র ও গোত্রীয় নেতাদের নিকট এবং রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখতেন। তেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন গোত্রের নিকট তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের নিকট ইসলামের বিধি-নিষেধ পৌঁছানোর লক্ষ্যে কিংবা শরয়ি কোনো বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেরণ করতেন। যেমন জাকাত, কর ইত্যাদি উশুল করা।

তাঁর পরবর্তী খলিফাগণের আমলও ছিলো অনুরূপ। তাঁরা গভর্নর এবং বিচারকদের নিকট শরয়ি বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় বিষয়াদিসংক্রান্ত লিপি প্রেরণ করতেন এবং যথারীতি তা বাস্তবায়িতও হতো।

القاعدة الثالثة: كُلُّ مَا فِيْهِ أَذًى لِلنَّاسِ فِيْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ فِيْ أَمْوَالِهِمْ يُبَاحُ قَتْلُهُ.

তৃতীয় মূলনীতি

যেসব প্রাণীর কারণে মানুষের জান বা মালের ক্ষতি সাধিত হয়, সেসব প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ[১]

মূলনীতির ব্যাখ্যা:

মূলনীতিটিতে মুহরিম (مُحْرِمٌ) (হজে ইহরাম পরিধানকারী) ও নন-মুহরিমের জন্য কোন কোন জিনিস অনুমোদিত এবং কোন কোন জিনিস নিষিদ্ধ তা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, হিল (الْحِلُّ) (হারামের সীমানা বহির্ভূত স্থান—যেখানে মুহরিমের জন্য শিকার ইত্যাদি বৈধ) ও হারামে (الْحَرَمُ) (হারমের সীমানার অন্তর্ভুক্ত স্থান যেখানে মুহরিমের জন্য শিকার ইত্যাদি নিষিদ্ধ) মুহরিমের জন্য কোন জন্তুকে হত্যা করা বৈধ তা আলোচ্য মূলনীতিতে নির্দেশিত হয়েছে। হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহরিমের জন্য ফাওয়াসিক (অনিষ্টকারী প্রাণী) তথা চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং পাগলা কুকুরকে হারামের সীমানার মধ্যে হত্যা করা বৈধ। ওলামায়ে কিরাম হারামের এলাকায় এই প্রাণীগুলোকে হত্যা করার বৈধতার ওপর একমত পোষণ করেছেন। তবে যেসব অনিষ্টকারী প্রাণীর কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

অধিকাংশ স্কলারগণ বলেছেন, ঐসব প্রাণী হত্যা করা বৈধ আছে যেগুলো মুহরিমের ক্ষতি করে কিংবা তাকে কষ্ট দেয়। এতে তার ওপর কোনো 'ফিদিয়া'[২] আসবে না। অন্যদিকে হানাফি ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, হত্যার বিধান হাদিসে উদ্ধৃত পাঁচটি প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে সাপও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বিশুদ্ধ হাদিস

---

১ ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনি, খ. ৩, পৃ. ৩৪২।

২ কোনো ভুল-ভ্রান্তির দরুন শরিয়তের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক করে করে দেয়া বিনিময়। (অনুবাদক)

দ্বারা তা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তারা বাঘকে হিংস্রতার মধ্যে কুকুরের সাথে পুরো মিল থাকার কারণে কুকুরের বিধান দিয়েছেন। একইভাবে তাদের নিকট যেসব প্রাণী বিনা উস্কানীতে আক্রমণ ও ক্ষতি করতে উদ্যত হয় সেগুলোও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মূলনীতির প্রামাণিকতা:

(১) হজরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ."

"পাঁচটি প্রাণী আছে যাদের প্রত্যেকটি ফাসিক (অনিষ্টকারী), যাদেরকে হারামেও হত্যা করা বৈধ। সেগুলো হলো: কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর।"[১]

(২) মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে-

خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ.

"পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণীকে হিল ও হারমে হত্যা করা বৈধ।"[২]

(حِدَأَة) শব্দটি ح এর কাসরা ও ফাতাহ সহকারে পড়া যায় এবং তা জিনসে মাহমুজ (হামজা বিশিষ্ট শব্দ)।

---

১ বুখারি, আল-জামি' আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩, হা. ১৮২৯।

২ মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৮৫৬, হা. ১১৯৮; ইহকামুল আহকাম শরহু ওমদাতিল আহকাম, পৃ. ১৫৬, হা. ২২৭।

সপ্তদশ অধ্যায়

ل/লাম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে ৬টি মূলনীতি)

القاعدة الأولى: لَا مَسَاغَ لِلاِجْتِهَادِ فِيْ مَوْرِدِ النَّصِّ.

প্রথম মূলনীতি

নস (কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল) বিদ্যমান থাকতে ইজতিহাদ (গবেষণাপ্রসূত মত প্রদান)-এর কোনো সুযোগ নেই[১]

এটি একটি ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) মূলনীতি—যার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, উপকারিতা ও উপাদেয়তা অপরিসীম ও অনির্বচনীয়। তাইতো প্রাচীন ও আধুনিক নির্বিশেষে সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম এই মূলনীতিটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

মূলনীতিটির সরল অর্থ এই- ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ "আর আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]
উক্ত আয়াতকে (ইজতিহাদের ভিত্তিতে) ভিন্ন কোনো অর্থে রূপায়িত করে তার বিপরীত বিধান দেয়ার সুযোগ নেই।

মূলনীতির সারবক্তব্য:

যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল বিদ্যমান রয়েছে, ঐ বিষয়ের বিধান বের করার জন্য নিজস্ব কোনো মত কিংবা কিয়াস (যুক্তি) কোনোক্রমে দাঁড় করানো যাবে না।
যেমন সুস্পষ্ট একটি নস (কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য) যা সুনির্দিষ্ট বিধানের ওপর নির্দেশ করে, যার কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই এমন কোনো নসকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা বৈধ হবে না।

জ্ঞাতব্য যে, এখানে নসের উপস্থিতিতে ইজতিহাদ নিষিদ্ধ হওয়াটা তখনই প্রণিধানযোগ্য, যখন তা এমন কোনো বিশুদ্ধ নসের সাথে সাংঘর্ষিক হয় যার অর্থ এতোটাই সুস্পষ্ট যে, তা কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। মূলনীতির প্রকৃষ্ট

---
[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, প. ১৭, ধারা: ১৪।

একটি উদাহরণ এই— যদি কেউ বাদীর ওপর সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের অপরিহার্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিবাদীর ওপর প্রমাণ দেয়াকে অনিবার্য করে দেয় কিংবা বাদীর কাছে সাক্ষী-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার ওপর শপথ করা অনিবার্য সাব্যস্ত করে, তাহলে এমন ইজতিহাদ অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, এটি হাদিসে রাসুলের পরিপন্থী। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তায় বাদীর ওপর আর শপথ আসে বিবাদীর ওপর।"[১]

হাদিসটি দাবি প্রমাণে সাক্ষ্য-সাবুত বাদীর ওপর হওয়াটাকেই অনিবার্য করে।

মূলনীতির বিশদ বিবরণ:

নস (কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল) বিদ্যমান থাকতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। অথবা বলা যায়, নসের স্থলে কোনো ইজতিহাদ চলবে না।

এখানে নস বলতে কুরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহ ও ইজমাকে বোঝানো হয়েছে। যে নসের বর্তমানে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই সেই নসটি হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর মুফাস্‌সার (সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসম্বলিত উদ্ধৃতি) ও মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন উদ্ধৃতি)। পক্ষান্তরে মুফাস্‌সার ও মুহকাম ব্যতীত অন্যান্য নস ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বিষয়টি আরো খোলাসা হবে নিম্নোক্ত আলোচনায়।

বিধান উৎসারিত হওয়ার দিক থেকে হানাফিদের নিকট শাব্দিক দলিল চার প্রকারে বিভক্ত। যথা-

১. (الظَّاهِرُ) আজ-জাহির: যার অর্থ শব্দ থেকে প্রকাশ পায় তবে ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে।

২. (النَّصُّ) আন-নস: (শব্দের প্রয়োগ থেকে) যার অর্থ 'যাহির'-এর তুলনায় অধিক প্রকাশমান। তবে এতেও ব্যাখ্যার অবকাশ থেকেই যায়।

৩. (الْمُفَسَّرُ) আল-মুফাস্‌সার: যার অর্থ 'নস' থেকেও এতোটাই সুস্পষ্ট যে, তাতে কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। তবে তা মানসুখ বা রহিত হওয়ার অবকাশ থাকে।

৪. (الْمُحْكَمُ) আল-মুহকাম: যার অর্থ এতোটাই সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট যে, এর কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে বা কিংবা তা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

---

[১] باء (বা) দিয়ে আরম্ভ দ্বিতীয় মূলনীতিতে হাদীসের রেফারেন্স-সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি- যেহেতু প্রথমোক্ত দুটির মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে তাই এতদুভয়ে ইজতিহাদেরও অবকাশ আছে। আর শেষোক্ত দুটির মধ্যে যেহেতু ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তাই এ দুটিতে ইজতিহাদেরও অবকাশ নেই। বস্তুত ইজতিহাদ মুফাস্‌সর ও মুহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ইজতিহাদ আবার দুই প্রকার:

প্রথম: কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধানসম্বলিত নস অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন গবেষকদের ইজতিহাদ। অর্থাৎ দলিল থেকে বিধান আহরণ বা জানার জন্য সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করা বা যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়: শরয়ি বিধানসম্বলিত কোনো বিষয়ের ওপর শরয়ি বিধান নেই এমন কোনো বিষয়কে কিয়াস (তুলনা/Analogical Reasoning) করার ক্ষেত্রে ফকিহগণের (ইসলামি আইনজ্ঞ) ইজতিহাদ।

ইজতিহাদের উভয় প্রকার অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে কিয়াসের ইজতিহাদ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনো নস বিদ্যমান থাকবে না। তখন সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি বিষয়ের একটিকে অপরটির সাথে কিয়াস (তুলনা) করার অপরিহার্যতা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে কোনো নস অনুধাবন করতে তখনই ইজতিহাদের অবকাশ থাকবে যখন নসটি তার অর্থের দিক থেকে অস্পষ্ট হয় কিংবা তার বিচার-বিশ্লেষণে বিভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। সুতরাং, নস যখন সুস্পষ্ট হয় তখন ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না।

"নস বিদ্যমান থাকতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই" মূলনীতিটির এই অর্থ দাঁড়ায়— শরয়ি বিধান নস (শরয়ি বক্তব্য) থেকে প্রমাণিত হয়। আর নস থেকে বিধান অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, এটি তো নস থেকে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। তদুপরি ইজতিহাদ হচ্ছে ধারণাপ্রসূত বিষয়। আর এর দ্বারা অর্জিত বিধানও ধারণাপ্রসূত। অন্যদিকে নস হচ্ছে 'কাত্‌ই' (অকাট্য) এবং ইয়াকিনি (সন্দেহাতীত) বিষয়। আর এর বিধানও 'কাত্‌ই' বা অকাট্য হবে। সুতরাং ধারণাপ্রসূত কোনো বিষয় দিয়ে অকাট্য-নিশ্চিত কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করার কোনো যৌক্তিতা নেই।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

(১) এই মূলনীতি প্রমাণের অন্যতম দলিল হচ্ছে হজরত মুআজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁকে বিচারক ও শিক্ষক হিসেবে ইয়ামেনে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাকে বললেন-

"كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، أي: بما في كتاب الله، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟" قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، وَلَا آلُو، أي: لا أقصر في البحث والاجتهاد، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ."

"তুমি কিসের মাধ্যমে ফয়সালা দেবে যখন তোমার সামনে বিচারের জন্য কোনো মামলা উপস্থাপন করা হবে?" তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে ফয়সালা করবো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে?" তিনি বললেন, তখন রাসুলের সুন্নাহর মাধ্যমে ফয়সালা করবো। তিনি বললেন, "যদি তা আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহর মধ্যেও না পাওয়া যায়?" তখন তিনি বললেন, "আমি নিজস্ব মতামত দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে চেষ্টা করবো এবং চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টায় ত্রুটি করবো না।" মুআজ (রা.) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারক দিয়ে আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, "ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি রাসুলের রাসুল (দূত)কে এমন জিনিসের তাওফিক দান করেছেন, যাতে তাঁর (আল্লাহর) রাসুল সন্তুষ্ট।"[১]

অনুরূপভাবে হাদিসটি হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত ওমর (রা.)-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

(২) নিম্নের আয়াতটিও উপরিউক্ত মূলনীতির দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন কোনো মুমিন মুমিনার জন্য তাদের নিজস্ব কোনো এখতিয়ার বা ইচ্ছা থাকতে পারে না।" [সুরা আল-আহজাব, আয়াত: ৩৬]

অনুরূপভাবে মূলনীতিটি ইজমা (Consensus of Scholars) এবং কিয়াস (যুক্তি/Analogical Reasoning) দ্বারাও প্রমাণিত।

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, মুসনাদু আহমদ, খ. ৩৬, পৃ. ৩৩৩, হা. ২২০০৭, খ. ৩৬, পৃ. ৪১৬, হা. ২২১০০।

القاعدة الثانية: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

দ্বিতীয় মূলনীতি

জুলুমের বিনিময়ে জালেমের কোনো হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না[১]

মূলনীতির মর্মার্থ:

অর্থাৎ জুলুম বা অত্যাচার জালেমের জন্য কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না।

عِرْقٍ ظَالِم এর অর্থ হলো— কোনো ব্যক্তির আবাদ করা জমিতে আরেকজন এসে জবরদখলপূর্বক সেখানে গাছ লাগানো, কিংবা ফসল ফলানো, কিংবা সেখানে এমন কোনো স্থাপনা ইত্যাদি তৈরি করা যদ্বারা ঐ জমিতে তার দখল প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে সে জালেম বা অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। কারণ, সে এমন জমিতে বৃক্ষরোপণ করেছে যে, সে জানে ঐ জমির স্বত্বাধিকারী অন্য লোক। এহেন গর্হিত কাজের কারণে সে অত্যাচারী, জালেম ও জবরদখলকারী হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে বিধান হলো- সে যা রোপন করেছে তা উপড়ে ফেলা বা যা নির্মাণ করেছে তা গুড়িয়ে দেয়া। তবে হ্যাঁ, জমির মালিক যদি ঐ বৃক্ষ বা স্থাপনা (নিজে ভোগ করার উদ্দেশ্যে) রেখে দিতে সম্মত হয় এবং জবরদখলকারীকে বৃক্ষ বা স্থাপনার মূল্য পরিশোধ করে দেয় সেটাও তার জন্য বৈধ হবে।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

উপর্যুক্ত মূলনীতিটি রাসুলের একটি হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ নিজেদের হাদিসগ্রন্থে, ইয়াহয়া ইবনু আদাম আল-কুরাইশি তাঁর 'আল-খারাজ' নামক গ্রন্থে, এবং আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম তাঁর 'আল-আমওয়াল' নামক গ্রন্থের "ইহয়াউ মাওয়াতিল

---

[১] আবু ইউসুফ, আল-খারাজ, পৃ. ৭৭।

আরদি" শীর্ষক অধ্যায়ে, এবং তদপূর্ব ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'আল-খারাজ'-এ উদ্ধৃত করেছেন।

(১) হাদিসের ভাষ্য নিম্নরূপ:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদ জমি আবাদ করলো সেই ঐ জমির মালিক। জবরদখলকারী জালেমের কোনো অধিকার সেখানে নেই।"[১]

মূলত হাদিসটি "অন্যায়কারী বা অত্যাচারীর জন্য কোনো হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না"—এই নীতির প্রমাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি কারো জমি জবরদখলপূর্বক সেখানে ফসল উৎপাদন করে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো স্থাপনা নির্মাণ করে, এর ফলে উক্ত জমিতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না—যদিও সে জমির প্রচলিত মূল্য আদায় করে। অনুরূপভাবে এ ধরনের জবরদখলের কারণে জমিতে বসবাসেরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না—যদিও এর প্রচলিত মজুরি আদায় করা হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, যদি জমির মালিক এতে সন্তুষ্ট হয় তখন ভিন্ন কথা। কারণ, কারো জন্য অন্য কারো সম্পদ শরয়ি কোনো কারণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, (الْعِرْقُ الظَّالِمُ) "বৃক্ষওয়ালা জালেম" বলতে, সে অন্যায়ভাবে যা নেয়, বা খনন করে কিংবা রোপণ করে সেসবকে বুঝানো হয়েছে। (عِرْقٌ) শব্দটি (عُرُوْقٌ) এর এক বচন। عُرُوْقُ الشجر এর অর্থ: বৃক্ষের শিকড়সমূহ। এখানে উদ্দেশ্য বৃক্ষ। বস্তুত এখানে মুজাফকে (সম্বন্ধসূচক পদ) বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃক্ষওয়ালা (জালেম)। বৃক্ষকে জুলুমের বিশেষণে বিশেষিত করে রূপক অর্থে সরাসরি বৃক্ষকে জালেম স্থির করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কিন্তু বৃক্ষ নয় বরং বৃক্ষওয়ালা-ই জালেম। বস্তুত হাদিসের অর্থ হচ্ছে এই- জুলুম জালেমের জন্য কোনো হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সাব্যস্ত করে না।

(২) ইমাম আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনু মাজাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ রাফে ইবনু খাদিজ (রা.)-এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এভাবেও বর্ণনা করেছেন-

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

[১] আবু ইউসুফ, আল-খারাজ, পৃ. ৭৭; ইয়াহয়া ইবনু আদম আল-কুরাশি, আল-খারাজ, পৃ. ৮০-৮৪, ২৬৬-২৭৯; আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম, আল-আমওয়াল, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪, হা. ৭০৪, ৭০৭। আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩৭, পৃ. ৪৩৮। আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৭৮, হা. ৩০৭৩। তিরমিজি, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৫৫, হা. ১৩৭৮।

"যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত ফসল ফলালো সে ঐ ফসলের কোনো কিছুরই মালিক নয়। তবে সে পারিশ্রমিক পেতে পারে।" শায়খ আলবানি (রহ.) হাদিসটিকে সহিহ এবং শায়খ ইবনু বাজ (রহ.) হাসান বলেছেন।

القاعدة الثالثة: لَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.

তৃতীয় মূলনীতি

শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া কারো জন্য অন্য কারো সম্পদ অধিকার করা বৈধ নয়[১]

শরিয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া কারো জন্য বৈধ নয় (সে যেই হোক না কেনো, হোক সে পিতা কিংবা পুত্র বা স্বামী) অন্য কারো সম্পদ অধিকার করা। এমনকি সম্পদের মালিক পুত্র কিংবা পিতা বা স্ত্রী হলেও। কারণ, বান্দাদের হুকুক (অধিকার/সম্পদসমূহ) অন্যের জন্য হারাম। যদি কেউ তা উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রহণ করে, সে তার জন্য দায়বদ্ধ বা জামিন থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি উপযুক্ত কারণ সহকারে গ্রহণ করে তবে তা তার জন্য বৈধ। এমনকি এতে যদি সম্পদের মালিক রাজি নাও থাকে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিকানা কিংবা লেনদেনের অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত কারণসমূহ:

শরিয়তস্বীকৃত কারণ বলতে ঐসব কারণকে বোঝায় যেগুলোকে বিধানদাতা (আল্লাহ) সম্পদের মালিকানা লাভের কিংবা তাতে লেনদেনের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, মিরাস, অসিয়ত, হিবা-দান, বেচা-বিক্রি। গ্যারান্টি প্রদানের শর্তে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অন্যের সম্পদ অধিগ্রহণ করা জায়েজ আছে যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়। মূলনীতিটিতে উল্লিখিত "অধিকার" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হোক সে অধিকার প্রতিষ্ঠা জুলুমপূর্বক, জবরদখলপূর্বক কিংবা চুরিপূর্বক।

এই বিষয়ে "শরহুস সিয়ারিল কাবির" গ্রন্থে অনেকগুলো মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাসআলা নিম্নরূপ:

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৭, ধারা: ৯৭।

আমির (রাষ্ট্রপ্রধান) যদি গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মাল বহনের জন্য (যোদ্ধা বিশেষের) বাহন ইজারা নেয়াকে সঙ্গত মনে করেন, তাহলে তিনি খুমুস (গনিমতের পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, জনকল্যাণের জন্য বরাদ্ধ) নেয়ার পূর্বেই তা (ইজারা মূল্য) পরিশোধ করবেন। কারণ, এই ইজারার মধ্যে গানেমিনের (গনিমতের মালের অংশীদারগণ) জন্য কল্যাণ রয়েছে। এটি ছাগল ও ঘোটকী হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য (শ্রমিক) ইজারা নেয়ার মতোই। বাহন-মালিকদের অধিকার এ ধরনের ইজারার ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না। কারণ, (মুসলমানদের আবাসস্থলে) গনিমতের সম্পদ সংরক্ষিতকরণ ও বণ্টন করার পূর্বে এতে যোদ্ধাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জ্ঞাতব্য যে, মালিকানার অংশিদারিত্বই ইজারার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে, হক বা অধিকারের অংশিদারিত্ব নয়। যেমন বাইতুল মালের সম্পদ। এতে সবার (জনগণের) অধিকার আছে, মালিকানা নয়। সুতরাং বাহন-মালিকগণ সম্মতি প্রদান করুক বা না করুক, এতে কিছু আসে যায় না যদি তারা ঐ বাহনের মুখাপেক্ষী না হয়। তখন তাদের এ অস্বীকৃতি হঠকারিতা হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এই ইজারার মধ্যে তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ এ ইজারার বিনিময়ে তাদের ভাড়া অর্জনের পাশাপাশি এমন এক মুনাফা অর্জিত হবে যা এই ইজারা ব্যতীত অর্জিত হওয়ার নয়। একইভাবে গানেমিন তথা মুজাহিদগণেরও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং তাদের অস্বীকৃতি হঠকারিতা হিসেবে গণ্য হবে। আর বিচারক তাদের হঠকারিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তদুপরি প্রয়োজনবোধে এ রকম ইজারা নেয়া ও ইজারা বহাল রাখা তো জনসাধারণের জন্যও জায়েজ। সেক্ষেত্রে আমিরের জন্য তো তা আরো জোরালোভাবে বৈধ হওয়ার দাবি রাখে।

উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জাহাজ-স্টীমার ভাড়া নেয়ার পর গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই যদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায় কিংবা জাহাজের মালিক মরে যায়, তাহলে মৃত্যুর ব্যাপারে বিধান হলো মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে প্রচলিত ভাড়ার ওপর নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হবে। আর সমুদ্রে অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত ভাড়ার ওপর চুক্তি নতুন করে সম্পাদিত হবে। মূলত এটি হচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে। অনুরূপভাবে গনিমতের মালের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে যখন তা বহন করার প্রয়োজন সামনে আসবে। হ্যাঁ, তবে যদি আমির এদেরকে বাধ্য না করে অন্যভাবে গনিমতের মাল বহন করতে সক্ষম হন তখন এদেরকে বাধ্য করবেন না। কারণ, এক্ষেত্রে জরুরত বা প্রয়োজন সাব্যস্ত হচ্ছে না।[১]

---

[১] সারাখসি, শরহু আস-সিয়ার আল-কাবির, খ. ৩, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

মূলনীতি প্রমাণে যেসব হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়:

- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلم إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه.

"কোনো মুসলিমের সম্পদ জায়েজ হবে না যদি না সে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি প্রদান করে।"[১]

- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমি আবাদ করলো, ঐ জমি তার মালিকানাধীন হবে। জবরদখলদার বৃক্ষওয়ালা জালেমের কোনো অধিকার সেখানে নেই।"[২]

---

[১] আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৩৪, পৃ.২৯৯, হা. ২০৬৯৫; দারাকুতনি, আস-সুনান, খ.৩, পৃ. ৪২৪, হা. ২৮৮৬।

[২] এই হাদিসের উদ্ধৃতি 'লাম' অধ্যায়ের দ্বিতীয় মূলনীতির অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

القاعدة الرابعة: لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ (يَعْنِيْ أنه لَا يُقالُ لِسَاكِتٍ: إِنَّهُ قَالَ كَذَا) وَلَكِنَّ السُّكُوْتَ فِي مَعْرِضِ الحاجَةِ بَيَانٌ (يَعْنِيْ أَنَّ السَّكُوْتَ فِيْمَا يَلْزَمُ التَّكَلُّمُ بِهِ إِقْرَارٌ وَبَيَانٌ).

চতুর্থ মূলনীতি

চুপ থাকা ব্যক্তির দিকে কোনো উক্তির সম্বন্ধ করা যাবে না। (অর্থাৎ চুপ থাকা ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যাবে না যে, সে এরকম এরকম বলেছে) তবে প্রয়োজনের সময় চুপ থাকাটাও এক প্রকার বিবৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়। (অর্থাৎ যেখানে উক্তি অনিবার্য সেখানে চুপ থাকাটা স্বীকৃতি এবং বিবরণ হিসেবে গণ্য হবে[১]

উপর্যুক্ত মূলনীতির দুটি অংশ রয়েছে। যথা-

এক. শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে মানুষের কার্যক্রমকে তার উক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা, যদি সেই উক্তি সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে করে থাকে। পক্ষান্তরে চুপ থাকার সাথে কোনো হুকুম বা বিধি-নিষেধকে সম্পর্কিত করা হয় না, যেভাবে উক্তির সাথে হুকুমের সম্পর্ক করা হয়।

এই ফিকহি মূলনীতিটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "কোনো চুপ থাকা ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যাবে না যে, তিনি অমুক বিষয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন, অথবা অমুক বিষয়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

দুই. দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে প্রথমাংশ থেকে এক্সেপশনাল বা ব্যতিক্রম। এই মূলনীতিটি হানাফি উসুলবিদগণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা চুপ থাকাকে ক্ষেত্র বিশেষে উক্তির স্থলে গণ্য করেছেন। যেখানে উক্তির অনিবার্যতা দেখা দেয়। সুতরাং যেভাবে উক্তি ও বিবরণ থেকে বিভিন্ন অর্থ এবং বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয়, তেমনিভাবে কখনো কখনো চুপ থাকা থেকেও বিধান বের করা হয়, যখন এর পক্ষে শক্তিশালী

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ২৪, ধারা: ৬৭।

লক্ষণ বা নির্দেশক কারণসমূহ পাওয়া যাবে। বস্তুত, এই মূলনীতিটি হানাফি উসূলবিদগণের পরিভাষা অনুযায়ী "প্রয়োজনের বিবরণ"[১] এর একটি ধরন।

"কাশফুল আসরার শরহু উসূলিল বাজদাভি" গ্রন্থে দ্বিতীয়টির ব্যাপারে এসেছে-

"তা (প্রয়োজনের মুহূর্তে চুপ থাকা থেকে বিধান সাব্যস্ত হওয়া) হচ্ছে এমন চুপ থাকা যা বক্তার অবস্থার নির্দেশে বা পরিপেক্ষিতে প্রমাণিত হবে।"[২]

এজন্য বলা যেতে পারে যে, মূলনীতির দ্বিতীয় অংশটি উসূলুল ফিকহের (ইসলামি আইনতত্ত্ব) একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এরই ভিত্তিতে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো বিষয় দেখা বা শোনার পর মৌন থাকাটা ঐ বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদানমূলক উক্তির নামান্তর বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন মৌনতা উক্তির সমতুল্য। কারণ, নবির জন্য নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ে নীরব থাকা সমীচীন নয়। তাই ফকিহগণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নীরব স্বীকৃতিকে উক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

হাদিসের বিশাল ভাণ্ডারে এ মূলনীতির রয়েছে অনেকগুলো উদাহারণ। যেমন, ঈদের নামাজের জন্য আজান-ইকামত না দেয়ার ওপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর নীরবতা পোষণ, ইত্যাদি।

এই মূলনীতির একটি অন্যতম উদাহরণ হলো- অবিবাহিতা সাবালিকা মেয়ের নীরবতা, যখন তার থেকে বিয়ের অনুমতি চাওয়া হয়। কারণ, এক্ষেত্রে তার নীরবতাকে সন্তুষ্টিমূলক উক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু লজ্জার কারণে তার সুস্পষ্ট মত প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে 'শফি' (শুফা-অগ্রক্রয়ের দাবিদার) যদি বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর শুফার দাবি না করে; বরং চুপ থাকে তাহলে তার এই চুপ থাকাটা (উক্তি সহকারে) শুফা বা অগ্রক্রয়াধিকার/প্রি-এমশন প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়- এটি একাধারে একটি ফিকহি-উসুলি মূলনীতি।

---

[১] যেখানে বক্তার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শব্দের পরিবর্তে প্রয়োজন বা পরিস্থিতির দাবির প্রেক্ষিতে নির্ণীত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "সে (মৃত ব্যক্তি) নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য থাকবে তিন ভাগের এক ভাগ।" [আন-নিসা: ১১] আয়াতে মাতার প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করার অর্থ হলো বাকি অংশটুকু পিতার জন্য সাব্যস্ত হওয়া। (অনুবাদক)

[২] আলাউদ্দিন আল-বুখারি, কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাভি, খ. ৩, পৃ. ১৪৭।

জ্ঞাতব্য যে, মূলনীতির আলোচনার শুরুতে লেখক তার আলোচনাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন। এখানে প্রথমাংশই মূলনীতি। কারণ মানুষের কার্যক্রম-মুআমলাত চুক্তি ও স্পষ্ট উক্তির ওপরই নির্ভরশীল। এজন্য মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত শাখাগত বিষয়াদির কোনো সংখ্যা-সীমা নেই। দ্বিতীয়াংশ কিন্তু তার বিপরীত। কারণ এই অংশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি খুবই সীমিত-পরিসংখ্যানযোগ্য।

মূলনীতির প্রথমাংশের উদাহরণসমূহ:

১. কেউ যদি অন্য কারো পণ্য তার উপস্থিতিতে বিক্রি করে, এবং সে নিষেধ না করে; বরং চুপ থাকে, তাহলে তার এই নীরবতা বিক্রির অনুমতি বলে গণ্য হবে না।

২. কোনো ব্যক্তিকে যদি সংবাদ দেয়া হয় যে, কোনো 'ফুদুলি' (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন কৌতূহলী ব্যক্তি) তার পণ্য বিক্রি করে দিয়েছে। তা শুনে সে নীরব থাকলে তার এ নীবরতা অনুমতি বলে গণ্য হবে না।

৩. কেউ যদি অন্য কারো সম্পদ তার সামনে নষ্ট করে এবং সম্পদের মালিক চুপ থাকলে তার এই চুপ থাকা অনুমতি বলে ধরা হবে না।

মূলনীতির দ্বিতীয়াংশের উদাহরণসমূহ:

১. বিয়ের অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে অবিবাহিতা সাবালিকা মেয়ের নীরবতা সন্তুষ্টি বলে গণ্য হবে। কারণ, লজ্জা পুরুষের প্রতি তার আগ্রহব্যঞ্জক উক্তি উচ্চারণে অন্তরায় হয়।

২. শপথে অনাগ্রহী ব্যক্তির নীরবতা তার ওপর দাবিকৃত অধিকারের স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রহ.)-এর মতে। তবে ইমাম মালিক ও শাফেয়ি (রহ.)-এর নিকট শপথ থেকে বিমুখতা ও নীরবতা তার পক্ষ থেকে দাবির অস্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান হিসেবে পরিগণিত হবে।

৩. ক্রেতার পণ্য কবজার সময় বিক্রেতার নীরবতা ক্রেতার জন্য অনুমতি বলে বিবেচিত হবে।

৪. অনুরূপভাবে 'শফি' (শুফার দাবিদার)-এর বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হয়েও চুপ থাকা এবং শুফার দাবি না করা তার পক্ষ থেকে উক্ত দাবির প্রত্যাহার হিসেবে গণ্য হবে।

القاعدة الخامسة: لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ.

পঞ্চম মূলনীতি:
কালের বিবর্তনে বিধি-বিধানের পরিবর্তন অনস্বীকার্য

মহান আল্লাহ তাআলা উদারতার ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের ওপর পরম অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে এমন এক সুচারু ও সুনিপুণ জীবনবিধান প্রদান করেছেন যা প্রত্যেক যুগ ও কালের জন্য উপযুক্ত। এমন কোনো নতুন সমস্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না যার সুষ্ঠু সমাধান এই শরিয়তে বিদ্যমান নেই। তাই তো যখনই কোনো সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে, তখনই ফুকাহায়ে কিরাম (Islamic Jurists) ইসলামি শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে 'নুসুসে শরিআহ' (Revealed Texts) থেকে তার যথাযথ সমাধান বের করেছেন, করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত হবে ইনশাআল্লাহ। তবে যেসব বিধান ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিংবা প্রবল ধারণানির্ভর তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। আর এগুলো হচ্ছে সেসব বিধি-বিধান যা কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তাই আলোচ্য মূলনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে (সমসাময়িক) ফতোয়াসমূহ—যেগুলো স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী বিধেয় বা পরিবর্তনশীল।

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, শরয়ি বিধানসমূহ দুই প্রকার। যথা:

এক. যেসব বিধান অপরিবর্তনশীল তথা স্থান-কাল-পাত্রের বিবর্তনে পরিবর্তনযোগ্য নয়; বরং তা সর্বাবস্থায় একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যেমন- শরিয়তের অকাট্য ফরজ ও হারাম বিধানসমূহ এবং বিভিন্ন অপরাধের বিষয়ে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি ইত্যাদি।

দুই. যেসব বিধান মানুষের কল্যানে স্থান্রর-কাল-পাত্র, পরিবেশ-প্রতিবেশের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল। তবে এর জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যা অবলম্বন করা এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যক।

মূলনীতির কতিপয় প্রকৃষ্ট উদাহরণ: যা প্রামাণিকতার স্বাক্ষরও বহন করে:

১. হজরত ওমর ও ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আমলসমূহ: অবিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ডবিধিতে এক বৎসরের দেশান্তর করার বিধানকে হজরত ওমর (রা.) মওকুফ করেছেন। তিনি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঈমানের দুর্বলতার ভয় এবং দারুল হারবে

(কাফের রাষ্ট্র) চলে যাওয়া আশংকা করেছেন। কারণ, কালের পরিবর্তনে মানুষের ঈমান দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে হজরত ওসমান (রা.) (পথহারা) কুড়ানো উট বিক্রি করা ও তদমূল্য মালিকের জন্য জমা রাখার রায় দিয়েছেন। অথচ এ ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ কালের বিবর্তনে তিনি মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয় এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখতে পেয়েছেন। তাই এই হুকুম প্রদান করেছেন।

২. ফকিহগণ (ইসলামি আইনবিদ) কারিগরের ওপর ক্ষতিপূরণের রায় প্রদান করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিধান হলো- কাঠমিস্ত্রি, কামার, দর্জি ইত্যাদি পেশাদারদের হাতে গ্রাহকের অর্ডারকৃত পণ্য কোনো সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলা ব্যতীত নষ্ট হলে, এক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামি আইনবিদরা দেখলন যে, মানুষের মাঝে দায়িত্বজ্ঞান ও জিম্মাদারি বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের তাগিদে কারিগরের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপের ফাতওয়া দিলেন।

৩. পণ্যের ত্রুটি বা দোষজনিত কারণে ক্রেতা-বিক্রেতাকে ইসলামে 'খিয়ারুর রাদ' তথা বিক্রি-চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি একটি অপরিবর্তনশীল বিধান। কিন্তু কোন্ কোন্ চরিত্র (জিনিস) ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য এবং কোনটি ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য নয়—এর মাপকাঠি স্থান-কাল-পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তনশীল।[১]

বস্তুত মানুষের কার্যকলাপ, অভ্যাস ও প্রচলনবিষয়ক শরয়ি বিধানসমূহ মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থকেন্দ্রিক। দেখা যায় যে, অনেক সময় মানুষের এসব কল্যাণ ও স্বার্থ কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং যখনই মানুষের স্বার্থ ও হিতাহিতের পরিবর্তন সাধিত হবে, সংশ্লিষ্ট বিধানের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হবে—এটাই যৌক্তিক। এ কারণে ফকিহগণ বিষয়টি নিরূপণপূর্বক আলোচ্য মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন।

---

[১] টিকা, মাজাল্লাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৬-১২৭।

القاعدة السادسة: لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ.

ষষ্ঠ মূলনীতি

'তাসরিহ' (সুস্পষ্ট ভাষ্য)-এর উপস্থিতিতে 'দালালাত' (শব্দের নির্দেশগত অর্থ)-এর কোনো মূল্য নেই[১]

- (التَّصْرِيْحُ) তাসরিহ: তাসরিহ হচ্ছে ঐ অর্থ যা সুস্পষ্ট-পরিপূর্ণ। হোক সেটি মূল কিংবা রূপক অর্থ।[২]
- (الدَّلَالَةُ) দালালাত: দালালাত হচ্ছে ঐ অর্থ যা প্রকাশ্য নয়, বরং তা অবস্থা, প্রচলন, ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়।

মূলনীতির সারসংক্ষেপ:

এটি প্রকৃতপক্ষে একটি উসুলি (ইসলামি নীতিশাস্ত্রীয়) মূলনীতি। তাসরিহ দালালাত অপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু যখন উভয়টি পরস্পর বিরোধী হয় তখন তাসরিহ-এর বিপরীতে 'দালালত'-এর কোনো মূল্য নেই। পরস্পর বিরোধী না হলে দালালাত অনুযায়ী আমল করা হবে। এই অর্থে কোনো কোনো উসুলবিদ মূলনীতিটির বিবরণ এভাবে দিয়েছেন- "الثَّابِتُ بِالدَّلَالَةِ مِثْلُ الثَّابِتِ بِالتَّصْرِيْحِ" "দালালাত দ্বারা প্রমাণিত বিষয় তাসরিহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের ন্যায়।"[৩]

মূলনীতির কতিপয় উদাহরণ:

১. যদি কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে তার অনুমতিক্রমে প্রবেশ করে পানপাত্র থেকে পানি পান করে এবং পান করা অবস্থায় উক্ত পাত্র হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না।

---

[১] শরহু মাজাল্লাতিল আহকামিল আদালিয়্যাহ, ধারা: ১৩, পৃ. ২৮; জুহাইলি, আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ ওয়া তাতবিকাতুহা, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

[২] নাসাফি, আল-মানার বিশারহি ফাতহিল গিফার লি ইবনে নুজাইম, খ. ২পৃ. ৮৩৫।

[৩] আবু মুহাম্মদ আল-খাব্বাজি, আল-মুগনি ফি উসুলিল ফিকহ, পৃ. ২৪৭।

কেননা, বাড়ির মালিক তাকে পান করা থেকে নিষেধ করেনি। অতএব তার পানি পান করা দালালাত (মৌন সম্মতি) হিসেবে অনুমোদিত। আর শরয়িভাবে কোন জিনিসের অনুমোদন থাকলে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আসে না। হ্যাঁ, যদি বাড়ির মালিক তাকে নিষেধ করার পরও সে পান করার জন্য পানপাত্র হাতে নেয় এবং তা ভেঙে যায় তাহলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। কারণ, স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে পরোক্ষ অনুমোদনের স্থান বাকি থাকে না। সুতরাং তাসরিহ-এর বিপরীতে দালালাত-এর কোনো বিধান অবশিষ্ট থাকবে না।[১]

২. আমানতদার ব্যক্তির জন্য আমানতের মালসহ সফর করা জায়েজ আছে। তবে আমানতদাতা যদি নিষেধ করে তাহলে তার জন্য আমানতসহ সফর করা জায়েজ হবে না। নিষেধের পরও যদি সে সফর করে এবং আমানতের মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ আসবে। কারণ, তাসরিহ (স্পষ্ট উক্তি) দালালাত (নিদের্শসূচক অর্থ) অপেক্ষা অগ্রগণ্য।[২]

৩. পূর্ববর্তী ওয়াকফ-তত্ত্বাবধায়কদের লেনদেন থেকে ওয়াকফের বিভিন্ন খাতসমূহের ওপর নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি ওয়াকফদাতার নির্ভরযোগ্য কোনো লিখিত ডকুমেন্ট পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ওয়াকফ-তত্ত্বাবধায়কদের লেনদেনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।[৩]

---

[১] জুহাইলি, আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ ওয়া তাতবিকাতুহা, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

[২] আতাসি, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৩৮।

[৩] মুস্তাফা আহমদ আজ-জারকা, শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৯৮।

অষ্টাদশ অধ্যায়

مِيْمْ/মীম দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে ১৭ টি মূলনীতি)

القاعدة الأولى: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

প্রথম মূলনীতি

ইসলামের যে বিধান কিয়াস-যুক্তির ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়নি, তার ওপর অন্য কোনো বিষয়কে কিয়াস (যুক্তির বিচারে তুলনা) করা যাবে না[১]

জ্ঞাতব্য যে, কিয়াস ইসলামের চতুর্থ দলিল। এটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কিয়াসের সংজ্ঞা হচ্ছে— 'আসল' (শরয়ি বিধানসম্বলিত বিষয়)-এর মতো বিধান 'ফারা' (শরয়ি বিধানশূন্য শাখা বিষয়)-এর মধ্যে প্রয়োগ করা, উভয়ের মাঝে যুৎসই কার্যকারণ বিদ্যমান থাকার ফলে। কিয়াসের জন্য নিম্নোক্ত চারটি শর্ত প্রযোজ্য:

১. তা তুলনামূলক শক্তিশালী কোনো দলিলের সাথে সংঘর্ষিক না হওয়া।

২. আসল (শরয়ি বিধানসম্বলিত বিষয়)-এর বিধানটি শরয়ি নস (কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল) বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হওয়া। যদি আসলের বিধান কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ওপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না।

৩. আসলের বিধানের জন্য জ্ঞাত 'ইল্লাত' (কার্যকারণ) থাকতে হবে যাতে ঐ ইল্লাতের মাধ্যমে 'আসল' এবং 'ফারা'-এর মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। সুতরাং আসলের বিধানটি যদি 'তাআব্বুদি' (যুক্তিনির্ভর নয়, বরং নিরেট ইবাদতসূচক) হয়, তাহলে তার ওপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না।

৪. ইল্লাতটি (কার্যকারণ) এমন অর্থের ওপর সন্নিবেশিত হতে হবে যা বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শরয়ি মূলনীতির আলোকে স্বীকৃত। সুতরাং বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো 'ফারা' (শরয়ি বিধানশূন্য শাখা বিষয়)-কে আরেক

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৭, ধারা: ১৫।

'ফারা'র সাথে তুলনা করা যাবে না; বরং ফারাকে আসলের সাথে তুলনা করতে হবে। অনুরূপভাবে যে বিধানটি যুক্তিগ্রাহ্য নয় তার সাথেও তুলনা করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, উটের গোশত ভক্ষণ করার পর ওজু ওয়াজিব হওয়া, 'হিজামাহ'-এর (শিঙার মাধ্যমে রক্ত বের করা) কারণে রোজা ভেঙে যাওয়া (ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্তিবিবর্জিত)। ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন- "ইবনু আব্বাস ও ইকরামা বলেন, সিয়াম হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকারী জিনিস থেকে (বিরত থাকা); নির্গমনকারী জিনিস থেকে নয়।

এটি মূলত উসুলুল ফিকহের (Principles of Islamic Jurisprudence) একটি মূলনীতি যা কিয়াসের অধ্যায়ে আসলের (শরয়ি বিধানসম্বলিত বিষয়) বিধানগত শর্ত সম্বন্ধে আলোচনার সময় উঠে আসে। কিয়াস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসকল শর্তের উপস্থিতি অনিবার্য তন্মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে— আসলের বিধানটি কিয়াস-যুক্তি বহির্ভূত না হওয়া। কারণ, বিধানটি যদি কিয়াসবহির্ভূত হয়, তখন তার ওপর কিয়াস করার কোনো কারণ থাকবে না। আসলের বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসলের সাথে তুলনা করে একই বিধান শাখার মধ্যেও প্রয়োগ করা। আর যখন আসলের বিধানটি যুক্তিবহির্ভূত হবে তখন তার ওপর আরেকটি জিনিসকে (ফারা) কিয়াস বা তুলনা করা যাবে না। কারণ, কোনো বিষয়কে এমন কোনো বিষয় দ্বারা প্রামণিত করা যায় না—যা তার অনুপস্থিতি কামনা করে।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

ইসলামি আইনবিদগণ এই মূলনীতির যে প্রয়োগিক উদাহরণ পেশ করেছেন তা হলো 'বাইউস সালাম' (অগ্রিম বেচাকেনার ব্যবসা)।[১] 'বাইউস সালাম' কিয়াস তথা যুক্তির বিচারে অবৈধ হওয়া চায়। কেননা, এতে বিক্রয়-চুক্তির সময় 'মাকুদ আলাই' (পণ্য) অবিদ্যমান থাকে। (তাই কিয়াসের দাবি- এ চুক্তি বৈধ না হওয়া।) তবে এ কিয়াস বা যুক্তি পরিহার করা হয়েছে শরয়ি নস (কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল) থাকার কারণে। নসটি হচ্ছে-

"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ."

"যে ব্যক্তি অগ্রিম বেচাকেনা করে, সে যেনো নির্দিষ্ট পরিমাপযন্ত্র ও নির্দিষ্ট ওজনে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের ওপর তা সম্পন্ন করে।"[২]

---

[১] বর্তমানে বিদ্যমান নেই এমন পণ্য পরে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বেচাকেনাকে 'সালাম' বলে। (অনুবাদক)

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ৮৫, হা. ২২৩৯-২২৪০, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে।

অনুরূপভাবে কিয়াস-যুক্তি বহির্ভূত আরেকটি ব্যাবসা হচ্ছে- 'বাইউল ইসতিসনা' (না দেখা পণ্য দিয়ে কোন জিনিস তৈরি করার চুক্তি। যেমন, জামা, জুতা, আলমারি বা সোফাসেট ইত্যাদি)। তার ধরনটা হচ্ছে এ রকম- "কোনো ব্যক্তি মোজা ইত্যাদির প্রস্তুতকারককে বলবে যে, আপনি আমার জন্য এই মূল্যের এক জোড়া মোজা প্রস্তুত করুন, এবং তিনি তার ধরন এবং পরিমাণ বলে দেবেন, আর প্রস্তুতকারকও বলবে যে, ঠিক আছে আমি প্রস্তুত করে দেবো।"[১] এই ব্যবসাটি ইজমা (ঐকমত্য)-এর ভিত্তিতে জায়েজ দেয়া হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে। অথচ তা কিয়াস বা যুক্তিবহির্ভূত। কারণ, অবিদ্যমান কোনো কিছুর বেচা-কেনা অবৈধ।

সুতরাং (বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মাসআলাদ্বয়ের সাথে অন্য বিষয়কে তুলনা করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, এটা বলা যাবে না যে, অগ্রিম বেচাকেনা কিংবা 'ইসতিসনা'-এর মতো লেনদেনের সাথে তুলনা করে এমন বৃক্ষের ফল বিক্রি করাও বৈধ হবে—যে বৃক্ষের ফল এখনো উৎপন্ন হয়নি। কারণ, 'বাইউস সালাম' বা 'বাইউল ইসতিসনা' নিজেই কিয়াস বা যুক্তিবহির্ভূত।[২]

শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যা প্রণেতা শায়খ মুস্তাফা জারকানি বলেন, "অসংখ্য শরয়ি বিধি-বিধান এমন রয়েছে যা কিয়াস বা যুক্তিবহির্ভূত। অতএব ঐ বিধানগুলো নসের (কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য) স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কোনো বিষয়কে এদের ওপর কিয়াস (তুলনা) করা যাবে না।"

নিম্নের মাসআলাগুলো এই নীতির অন্তর্ভুক্ত:

১. শরিয়তের দণ্ডবিধি। যেমন চোরের হস্তকর্তন ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান। কিন্তু তার সাথে কাফন-চোরের বিধানকে কিয়াস-তুলনা করা যাবে না।

২. অনুরূপভাবে ইজারা (Leasing/Renting); কারণ, এটি হচ্ছে মুনাফা বিক্রয় যা চুক্তির সময় অবিদ্যমান। আর অবিদ্যমান কোনো কিছুর বিক্রয় অবৈধ। তবে এটিকে মানুষের অত্যধিক প্রয়োজন বিবেচনায় বৈধ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যুক্তি পরিহারযোগ্য। সুতরাং এ বিধান প্রয়োজনের স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর সাথে অন্য কোনো বিষয়কে তুলনা করা যাবে না।

৩. পণ্য গ্রহণের পর বিক্রি-চুক্তিতে মতানৈক্য দেখা দিলে, উভয় পক্ষকে শপথ প্রদান করানোর বিধানটি কিয়াস-যুক্তিবহির্ভূত। সুতরাং নিকাহ (বিয়ে-শাদি)কে এর ওপর কিয়াস করা যাবে না। হ্যাঁ, পণ্য গ্রহণের পূর্বে মতবিরোধ দেখা দিলে, তখন উভয়পক্ষকে শপথ বাক্য পাঠ করানো কিয়াসের দাবি।

---

[১] কাসানি, বাদায়িউস-সানায়ি, খ. ৫, পৃ. ২।

[২] কাশফুল আসরার শরহুল মুসান্নিফ আলাল মানার, (নাসাফি), খ. ২, পৃ. ১৬৪।

القاعدة الثانية: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে[১]

এটি ফিকহের (ইসলামি আইনশাস্ত্রের) একটি সুমহান মৌলিক মূলনীতি এবং উসুলুল ফিকহের (ইসলামি নীতিমালাশাস্ত্র) একটি অন্যতম দলিলও বটে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব অনযায়ী আবিষ্কৃত। অধিকাংশ 'রুখসাত' (ইসলামের ছাড়যুক্ত বিধানসমূহ) এই মূলনীতি থেকে উৎসারিত। বরং ইসলামি আইনশাস্ত্রের সুবিশাল প্রাসাদটি যেসব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম একটি ভিত্তি। এটি একদিকে যেমন ফিকহি মূলনীতি একই সাথে একটি সাধারণ উসুলি মূলনীতি (Methodological Rule)-ও বটে। এটি বহু দলিলের আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রামাণ্য সুদৃঢ় নীতি। এই মূলনীতি থেকে উৎসারিত হয় অনেক ফিকহি বিধি-বিধান। যেমন- কর্জ, 'হাওয়ালা' (ঋণের বোঝা অন্যের ওপর অর্পণ করা), 'হাজর' (লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ) ইত্যাদি। ফুকাহায়ে কিরাম (ইসলামি আইনবিশারদগণ) শরয়ি বিধি-বিধান থেকে যেসব রুখসাত (ইসলামের ছাড়যুক্ত বিধানসমূহ) এবং তাখফিফ (সহজকৃত বিধানসমূহ)কে জায়েজ দিয়েছেন সেগুলোও এই মূলনীতি থেকেই নির্গত-আবিষ্কৃত। তন্মধ্য থেকে যেমন— সফরে "কাসরে সালাত" (চার রাকাত সালাতকে দুই রাকাত পড়া), রোগের আশঙ্কায় তায়াম্মুম করা, ক্ষমাযোগ্য পরিমাণ (সামান্য পরিমাণ) নাপাকসহ সালাত আদায় করা ইত্যাদি।

কারণ, ইসলামি শরিয়ত মানুষকে এমন কোনো জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করে না যা তারা করতে সক্ষম নয় কিংবা যা তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করবে কিংবা যা তাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বিজ্ঞ শরিয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে ছাড়, সহজতা ও উদারতাই কাম্য।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ. ১৮, ধারা: ১৭।

যে কষ্টের কারণে সহজতার বিধান আসে:

যে কষ্টের কারণে তাখফিফ বা সহজীকরণ বিধিবদ্ধ হয়, সেটি হচ্ছে এমন কষ্ট যা বান্দার ইবাদতে বড়ো ক্ষতির কারণ হবে। যেমন, তার মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে, অথবা অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে কিংবা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে অথবা প্রকাশ্য ব্যথার কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে সচরাচর কষ্ট কিংবা সাধারণ কষ্টের কারণে কোনো ছাড় বা সহজীকরণ হবে না। যেমন, সামান্য সর্দি বা হালকা ব্যথা ইত্যাদি।

মূলনীতির কতিপয় উদাহরণ:

১. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম বৈধ, যদি ওজুর কারণে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া কিংবা সুস্থতা বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে।

২. বিশেষ অবস্থায় "জমা বাইনাস সালাত্বাইন" (দুই সালাতকে এক সাথে আদায় করা) এর অনুমোদন বা উত্তম হওয়া। যেমন সফর কিংবা অসুস্থাতার কারণে অথবা এমন বৃষ্টির কারণে যাতে প্রতি বেলায় সালাত আদায় করলে কাপড় ভিজে যাবে বা কষ্টের কারণ হবে।

ইসলামে ছাড় বা সহজীকরণের কতিপয় কারণ:

- অসুস্থতা
- সফর
- জোর-জবরদস্তিকরণ
- অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়া
- ভুল-ভ্রান্তি
- উন্মাদনা, নাবালকত্ব, হায়েজ-রজঃস্রাব, নিফাস-প্রসবোত্তর রজঃস্রাব ইত্যাদি কারণে শারীরিক ত্রুটি দেখা দেয়া।

বক্ষ্যমাণ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত মূলনীতিসমূহ:

প্রথম: الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ "প্রয়োজন নিষিদ্ধতাকে বৈধতা প্রদান করে।"

দ্বিতীয়: الضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا "প্রয়োজন প্রয়োজনানুসারেই নির্ধারিত হবে।"

তৃতীয়: إذَا ضَاقَ الأَمْرُ اِتَّسَعَ "যখন কোনো বিষয় সংকীর্ণ (কষ্টকর) হয়ে যায় তখন তাতে প্রশস্ততা চলে আসে।"

চতুর্থ: لا وَاجِبَ مَعَ الْعِجْزِ "অপারগতার পরিস্থিতিতে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না।"

পঞ্চম: الْمَيْسُوْرُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ "যা সহজে সম্পন্ন করা যায়, তা কষ্টসাধ্য কোনো বিষয়ের কারণে রহিত হয় না।"

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

ওসামা ইবনু শরিক আত-তাগলবি (রা.)-এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন-

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، وَجَاءَتْهُ الْأَعْرَابُ مِنْ جوانِبَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ مِنْ كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً ظُلْمًا، فَذَلِكَ يَحْرَجُ وَيَهْلِكُ.

"আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম, যখন তাঁর সাহাবিদের মাঝে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিলো। নানান বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে বিভিন্ন দিক থেকে বেদুইনরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসছিলো। তারা জিজ্ঞেস করছিলো, এরকম এরকম করতে কি আমাদের অসুবিধে আছে? তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ কষ্ট ও অসুবিধেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তবে কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিম ভাইয়ের ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা রটনা করে। এটিই অসুবিধের বিষয় এবং ধ্বংসকারী।"[১]

ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ বিষয় এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি: "আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ধর্ম হচ্ছে খাঁটি এবং উদার (সহজতর) ধর্ম" শীর্ষক একটি অধ্যায় এনেছেন। এতে নিম্নোক্ত হাদিসগুলো পরিবেশন করেছেন:

(এক) হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

---

[১] আবু দাউদ তায়ালাসি, আল-মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ৫৫৯, হা. ১৩২৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ২১১, হা. ২০১৫।

"নিশ্চয়ই দ্বীন সহজতর বিষয়। যখনই কেউ দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন করবে, দ্বীন (উদারতা ও সহজতা নিয়ে) তার ওপর বিজয়ী হবে। (অর্থাৎ তাকে মধ্যপন্থা ও সহজের দিকে ঠেলে দেবে) অতএব সত্যকে আঁকড়ে ধরো, উত্তমের নিকটে থাকো। উৎফুল্ল থাকো, (ইবাদতে) সকাল-সন্ধ্যা-শেষরাত্রির কিয়দাংশ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো।"[১]

(দুই) অনুরূপভাবে ইমাম বুখারি (রহ.) হজরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا.

"সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিও না।"[২]

(তিন) হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ.

"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো কিছুর নির্দেশ দিতেন তখন তারা (সাহাবিরা) করতে সক্ষম হবেন এমন বিষয়ের নির্দেশ দিতেন।"[৩]

(চার) হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.

"একদা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে ছিলেন, তিনি মানুষের ভিড় অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান করা হচ্ছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার কী হয়েছে? তারা বললো, সে রোজা রেখেছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- বললেন, "সফরে সিয়াম পালন ভালো কাজ নয়।"[৪]

অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ.

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ১৬, হা. ৩৯।

[২] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫, হা. ৬৯।

[৩] বুখারি, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ১৩, হা. ২০।

[৪] প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪, হা. ১৯৪৬।

"তোমরা তোমাদের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত রুখসাত (ছাড়)কে গ্রহণ করো।"[১]

(পাঁচ) অনুরূপভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"যদি মুমিনদের ওপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম।"[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.

"যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর হবে বলে আমার মনে না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াকের আদেশ দিতাম।"[৩]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, "এর অর্থ হলো- যদি কষ্ট হওয়ার ভয় না থাকতো তাহলে মিসওয়াককে ওজুর ন্যায় সালাতের শর্ত সাব্যস্ত করতাম।" এরকম আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা-

(ক) শরয়ি বিধানসমূহে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজতিহাদের বিশাল দখল (প্রভাব) রয়েছে।

(খ) শরয়ি বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়।

(গ) কষ্ট দূরীকরণ শরিয়তের একটি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি।[৪]

(ছয়) অনুরূপভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ.

"এক সময় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কুরবানির দিনে গ্রামবাসীরা মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তিন দিনের পরিমাণ (গোশত) সঞ্চয় করে রেখো, বাকিটুকু সদকা করে দিও।"

---

[১] মুসলিম, সহিহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৭৮৬, হা. ১১১৫, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত।

[২] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২০, হা. (২৫২), হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

[৩] বুখারি, খ. ৯, পৃ. ৮৫, হা. ৭২৪০, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

[৪] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ৩১০।

অতঃপর পরবর্তীতে বলেছেন,

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا.

"ভক্ষণ করো, সদকা করো এবং সঞ্চয় করো।"[১]

এ ছিলো আলোচ্য অধ্যায়সংক্রান্ত বিশুদ্ধ হাদিসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা। প্রত্যেক হাদিসেরই রয়েছে সহজীকরণ ও হালকাকরণের মতো অনন্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক। পাশাপাশি এতে রয়েছে- "কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে" এই মূলনীতির প্রতি সুন্দর নির্দেশনা।

---

[১] মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ১৫৬১, হা. ১৯৭১; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৯৯, হা. ২৮১২, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

القاعدة الثالثة: الْمَيْسُوْرُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ.

তৃতীয় মূলনীতি

সহজসাধ্য বিষয় কষ্টসাধ্য বিষয়ের কারণে বিলুপ্ত হয় না

এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের অনির্বচনীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। অধিকাংশ আইনবিশারদগণ এই মূলনীতিটি গ্রহণ করেছেন। শরিয়তের 'তাইসির' (সহজীকরণ) এবং 'তাখফিফ' (হালকাকরণ)-এর দিক দুটি আলোচ্য মূলনীতির মাঝে ফুটে ওঠে।

(মূলনীতির মর্মার্থ):

অর্থাৎ একজন সাবালক ব্যক্তি (কোনো আদিষ্ট বা নিষেধকৃত বিষয়ে) যা পালন করতে সক্ষম তা অবশ্যই পালন করবে, সেটি যতো কঠিনই হোক না কেনো। বিষয়টি পুরোপুরি পালনে অক্ষম হওয়ার কারণে পুরো বিষয়টির বিধান থেকে সে দায়মুক্ত হবে না। কারণ, আদিষ্ট বিষয়টি যদি এমন হয় যে– তা ব্যক্তির পক্ষে সামর্থ্য না থাকার কারণে পরিপূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভব না হলেও কিছুটা আদায় করা সম্ভব, তাহলে যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু আদায় করা আবশ্যক। যেটুকু করা সম্ভবপর নয়, তার কারণে সবটুকু বিলুপ্ত হবে না।

ইসলামি আইনশাস্ত্রের সামগ্রিক মূলনীতিসমূহের মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি ইসলামি শরিয়তের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ থেকে একটি প্রধান উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তা হচ্ছে- "বান্দার সাধ্যের ওপর নির্ভর করেই ইসলামে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কোনো বিষয়ে অপারগতা-অক্ষমতা দেখা দিলে তা যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।"

এটি "কষ্ট লাঘবকরণ ও সহজীকরণ" নীতির সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অসংখ্য ও অগণিত শাখাগত ফিকহি মাসআলা। এর অধিকাংশই "ইবাদত এবং শরয়ি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন" অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। বস্তুত এ মূলনীতিটি "কষ্টসাধ্যতা সহজীকরণকে টেনে আনে"-মূলনীতির নিয়ন্ত্রক-নিয়ামক।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

ইসলামি আইনবিদগণ নিম্নের হাদিসটির শেষাংশ থেকে মূলনীতিটি আবিষ্কার করেছেন।

(ক) "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سمعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি– আমি তোমাদেরকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করি তা থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকো এবং যে জিনিসের আদেশ দেই তা থেকে যতোটুকু সম্ভব পালন করো।"[১]

(খ) অনুরূপভাবে ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"আমি অর্শরোগে আক্রান্ত ছিলাম। তাই আমি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বললেন- দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো। যদি দাঁড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হও তাহলে বসে আদায় করো। আর যদি বসেও আদায় করতে সক্ষম না হও তাহলে পার্শ্বদেশে ভর করে আদায় করো।"[২]

এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যা সহজে সম্পাদনযোগ্য তা তুলনামূলক কষ্টকর বিষয়ের কারণে রহিত হয় না। কারণ, সালাতের অপরিহার্যতা নির্ভর করে 'আকল' (বিবেক-বুদ্ধি) থাকার ওপর। সুতরাং সাবালকের মাঝে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকলে তার থেকে তাকলিফ (অর্পিত দায়িত্ব) বিলুপ্ত হবে না। যেমন, দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে রুকু-সেজদা বিলুপ্ত হয় না। উপরিউক্ত বিন্যাস থেকে প্রতিভাত হয়েছে যে, কেউ যদি সালাতের উত্তমটা করতে অক্ষম বিধায় আপেক্ষিক কম পর্যায়েরটা আদায় করে তাহলে সালাতের যা করা সম্ভব তা আদায় করেছে বলে গণ্য হবে।

---

১ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ৯, পৃ. ৯৪, হা. ৭২৮৮; মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হা. ১৩৩৭।

২ বুখারি, আস-সহিহ খ. ২, পৃ. ৪৮, হা. ১১১৭।

(গ) অনুরূপভাবে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় দেখতে পাবে, সে যেনো তা স্বহস্তে পরিবর্তন করে দেয়। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেনো মুখ দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। আর যদি তাও করতে না পারে তাহলে যেনো অন্তর দিয়ে (ঘৃণা) করে। আর এটি হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"[১]

যেহেতু মদ্যপের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, মদ ঢেলে ভাসিয়ে দেয়া ইত্যাকার ঘৃণাব্যঞ্জক আচরণের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশের সক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত, তাই তা কারো থেকে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত হবে না। উল্লিখিত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর যা ওয়াজিব করেছেন, তার সব কিছুর জন্যই 'কুদরাত' (সক্ষমতা) শর্ত। পক্ষান্তরে যা করতে বান্দা সক্ষম না, আল্লাহ তাকে তার দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

(ঘ) ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-এর হাদিস প্রণিধানযোগ্য— যা ইমাম বুখারি ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদিসে এসেছে-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

"জনৈক ব্যক্তি ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বললো, আমি জুনুবি (গোসল ফরজ হয় এমন অপবিত্রতায় নিপতিত) হয়েছি, তবে আমি পানি পাইনি। তখন আম্মার (রা.) ওমর (রা.)-এর উদ্দেশে বললেন, আপনার কি স্মরণ হয় না যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম? অতঃপর আপনি ঐ অবস্থায় সালাত আদায় করেননি, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি করে সালাত আদায় করেছিলাম। পরে বিষয়টি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমার জন্য এভাবে করা যথেষ্ট ছিলো। এ কথা বলে তিনি স্বীয় হস্ত মোবারক মাটিতে মারলেন, এবং

১ মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৬৯, হা. ৪৯।

ফুৎকার দিলেন, (ঝেড়ে ফেললেন) অতঃপর উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন।"[১]

হাদিসটিতে মূলনীতির প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার (রা.)-এর আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। এতে করে বোঝা গেলো যে, "সহজসাধ্য বিষয় কষ্টসাধ্য বিষয়ের কারণে বিলুপ্ত হয় না।"

মূলনীতির কতিপয় উদাহরণ:

- যদি কারো কোনো অঙ্গ কর্তিত থাকে, তাহলে অঙ্গের যেটুকু অংশ বাকি আছে সেটুকু ধৌত করতে হবে।
- পুরো সতর ঢাকতে অক্ষম ব্যক্তিকে সম্ভবপর সতর ঢাকতে হবে।
- সুরা ফাতিহার কিয়দাংশ পড়তে সক্ষম ব্যক্তিকে সবার ঐকমত্যে তা পড়তে হবে।
- কেউ যদি ওজুবিহীন থাকাবস্থায় তার শরীরে নাপাকি লেগে থাকে এবং তার নিকট যে পরিমাণ পানি বিদ্যমান আছে, তা দিয়ে কোনো একটি নাপাকি দূর করা যাবে, তাহলে তাকে দৃশ্যমান নাপাকি দূর করতে হবে।
- যার বাহু কনুই থেকে কর্তিত তাকে কনুইয়ের মাথার হাঁড় ধুতে হবে।

---

১ বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ৭৭, হা. ৩৪৭।

القاعدة الرابعة: اَلْمَجْهُوْلُ فِيْ الشَّرِيْعَةِ كَالْمَعْدُوْمِ وَالْمَعْجُوْزِ عَنْهُ.

চতুর্থ মূলনীতি

শরিয়তের দৃষ্টিতে অজ্ঞাত বস্তু অস্তিত্বহীন কিংবা সাধ্যাতীত বস্তুর মতো[১]

যেসব মূলনীতি "কষ্ট লাঘব ও সহজীকরণ নীতি"-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত তন্মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অন্যতম। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) মূলনীতিটি বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু রাজাব হাম্বালি (রহ.)-এর ভাষায় মূলনীতির গঠন নিম্নরূপ:

يَنْزِلُ الْمَجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُوْمِ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ بَقَاءَهُ، إِذَا يَئِسَ مِنَ الوُقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ شَقَّ اِعْتِبَارُهُ.

"অজ্ঞাত বিষয় অস্তিত্বহীন বিষয়ের স্থানে বিবেচিত হয়, যদিও তার অস্তিত্ব থাকাটাই মৌলিক বিধান হয়। এমন বিবেচনা তখনই হয় যখন সে বস্তুর ওপর অবগত হওয়া অসম্ভব ঠেকে, কিংবা তার অস্থিত্ব বিবেচনা করা কষ্টকর হয়।"[২]

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিসসমূহ:

মূলনীতিটির প্রমাণে ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.) অনেকগুলো দলিল পেশ করেছেন। তন্মধ্য থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি অন্যতম:

قال النبي ﷺ: إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ের আদেশ প্রদান করি তখন তোমরা তা থেকে যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু আদায় করো।"[৩]

---

[১] ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ৩২২।

[২] ইবনু রজব হাম্বালি, আল-কাওয়াইদ, পৃ. ২৩৭।

[৩] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৯, পৃ. ৯৪- ৯৫, হা. ৭২৮৮। মুসলিম, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হা. ১৩৩৭ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

অতঃপর তিনি হাদিসের ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক বলেন, এজন্যই তো নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্বন্ধে বলেন-

فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

"যদি তার মালিক আসে তাহলে তা তাকে অর্পন করো। অন্যথায় (না আসলে) তা আল্লাহর সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে প্রদান করবেন।"[১]

এই কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু মালিকের সম্পদ ছিলো—যা তার থেকে হাতছাড়া হয়েছে। অতঃপর যখন এই সম্পদের মালিক সম্পর্কে জানা কষ্টকর হয়ে গেছে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিলেন-

هِيَ مَالُ اللهِ يؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ.

"তা আল্লাহর সম্পদ বলে বিবেচিত। আর তিনি যাকে চান প্রদান করেন।"
এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ সম্পদ থেকে প্রকৃত মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত করতে চান, এবং তা কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তিকে দিতে চান। ইমামদের মাঝে এতে কোনো মতভেদ নেই যে, এক বৎসর প্রচার করার পর কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির জন্য তা সদকা করা বা নিজে গরিব হলে তা ভোগ করা (মালিক হওয়া) জায়েজ আছে।[২]

মূলনীতির কতিপয় উদাহরণ:

কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তার কোনো উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। যদিও বাস্তবে তার এমন কোনো উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকে—যার সংবাদ অজ্ঞাত। এমতাস্থায়, যদি উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায়, তখন উক্ত সম্পদ তাকে হস্তান্তর করতে হবে।[৩]

ইবনু তায়মিয়া মূলনীতিটিকে অন্য এক জায়গায় এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "যে সম্পদের মালিক আমরা খুঁজে পাবো না, সে সম্পদ তাকে প্রদান করার অপরিহার্যতা আমাদের ওপর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তা মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। জ্ঞাতব্য যে, সদকা মুসলমানদের জন্য অন্যতম একটি কল্যাণকর খাত। আলোচ্য নীতি একটি সামগ্রিক নীতি যা সব অজ্ঞাতনামা

১ আল-বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, পৃ. ৩১৯, হা. ১২০৮৯।
২ ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ৩২২।
৩ প্রাগুক্ত।

মালিকের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে মালিককে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। যেমন জবরদখলমূলক অর্জিত সম্পদ, ধার নেয়া সম্পদ, আমানতের সম্পদ (যখন মালিক না পাওয়া যাবে) এগুলো মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক, আহমদ, আবু হানিফা প্রমুখের বক্তব্য এক ও অভিন্ন।[১]

---

১ প্রাগুক্ত।

القاعدة الخامسة: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ.

পঞ্চম মূলনীতি

মুসলমানরা যা উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম বলে বিবেচিত[১]

অর্থাৎ যে রায় বা মত উত্তম হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। অতএব এটিকে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা জরুরি।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিস:

এটি বিজ্ঞ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর উক্তি, যা যথাক্রমে ইমাম আহমদ, বাজ্জার ও তাবরানি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁদের প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত। তিনি বলেন-

"যুদ্ধে কিংবা যুদ্ধের বাইরে অশ্বের গলায় কিলাদা (হার) পরানোর মধ্যে কোনো আপত্তি নেই। কারণ এটি যুদ্ধে যারা প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় কিংবা সাধারণভাবে অশ্বে আরোহণ করে থাকে তাদের একটি সাধারণ নিয়ম। আর যে বিষয় মুসলমানরা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।"[২]

---

[১] সারাখসি, শরহুস-সিয়ারিল কবির, খ. ৪, পৃ. ২১৭; আল-বারকাতি, ফিকহুস-সুনান ওয়াল আসার, পৃ. ৭।

[২] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ৮৪, হা. ৩৬০০; বাজ্জার, আল-মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ২১২-২১৩, হা. ১৮১৬; তাবরানি, আল-মুজামুল আওসাত, খ. ৪, পৃ. ৫৮, হা. ৩৬০২; সারাখসি, শরহুস-সিয়ারিল কবির, খ. ৪, পৃ. ২১৭; আল-বারকাতি, ফিকহুস-সুনান ওয়াল আসার, পৃ. ৭।

القاعدة السادسة: مَا غَابَ عَنَّا لَا نُسْأَلُ عَنْهُ.

ষষ্ঠ মূলনীতি

যা আমাদের থেকে অদৃশ্য (দৃষ্টির অগোচরে) সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না[১]

মূলনীতির মর্মার্থ:

যা দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা মুসলমানের দায়িত্ব নয়। সুতরাং জবাইকৃত কোনো জন্তুর ব্যাপারে সেটি কীভাবে জবাই করা হয়েছে? এতে কি জবাইয়ের শর্তসমূহ পাওয়া গেছে? জবাইকৃত জন্তুর ওপর কি বিসমিল্লাহ পড়া হয়েছে? নাকি পড়া হয়নি? এসব জিজ্ঞেস করা তার কর্তব্য না। বরং কোনো মুসলিম চাই সে অজ্ঞ বা পাপিষ্ঠ হোক, কিংবা কোনো আহলে কিতাব (প্রকৃত ইহুদি বা খৃষ্টান) কর্তৃক জবাই করা জন্তু সম্পূর্ণরূপে হালাল গণ্য হবে। তবে এ মূলনীতিটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মাজহাব অনুযায়ী প্রযোজ্য।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

(১) ইমাম বুখারি (রহ.) এর উদ্ধৃত একটি হাদিসে এসেছে যে, একদল সাহাবি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".

"ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিছু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, তারা আল্লাহর নামে জবাই করেছে কি-না? তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, "তোমরাই তাতে আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) বলো। এবং তা ভক্ষণ করো।"[২]

---

[১] কারজাভি, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ৬০।

[২] বুখারি, আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ ৫৪, হা. (২০৫৪), হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

উপর্যুক্ত হাদিস সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম বলেন, এই হাদিসটি থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের কার্যক্রম ও লেনদেনসমূহ সহিহ ও বিশুদ্ধ বলেই গণ্য করা হবে যতোক্ষণ না তা বাতিল ও অসিদ্ধ হওয়ার ওপর কোনো বিশুদ্ধ দলিল প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে ইমাম ইবনু হাজম (রহ.) হাদিসটি থেকে অত্র মূলনীতিটি ইসতিম্বাত (উদ্ভাবন) করেছেন।

(২) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, "তিনি এক সময় রাস্তা পাড়ি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ 'মিযাব' (ছাদের পানি পড়ার ড্রেন) থেকে তাঁর গায়ে পানি পড়লো। তার সাথে যিনি ছিলেন, তিনি মিযাবের মালিককে সম্বোধন করে বললেন, আপনার পানি পাক কি-না? তখন ওমর (রা.) মিযাবের মালিককে বললেন, আপনি আমাদেরকে এ বিষয়ে জানাবেন না। নিশ্চয়ই আমাদেরকে কৃত্রিম (অহেতুক) কষ্ট করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।"

(৩) অনুরূপভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন ইহুদির দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তার খাবারও ভক্ষণ করেছেন। অথচ তিনি জিজ্ঞেস করেননি যে, এটি হালাল কি-না? অথবা পাত্র পবিত্র কি-না?

(৪) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবিগণ কাফেরদের তৈরি করা কাপড় ও পাত্রসমূহ যথাক্রমে পরিধান ও ব্যবহার করতেন।

(৫) অনুরূপভাবে তাঁরা গনিমতে পাওয়া (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) কাপড় এবং পাত্রসমূহ তাঁদের মাঝে বণ্টন করতেন এবং তা ব্যবহারও করতেন। এটিও প্রমাণিত যে, তাঁরা যৌথ পানপাত্রের পানি ব্যবহার করেছেন।

অপরদিকে একদল এমন রয়েছেন যারা এক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করার পক্ষে। তাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিস- "নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) ব্যহারিক সেসব পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যেগুলোতে তারা শূকরের গোশত খেতো এবং মদ পান করতো। তখন তিনি বললেন,

إِنْ لَمْ تَجِدُواغَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا.

"এগুলো ব্যতীত যদি অন্য পাত্র না পাও তাহলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে নাও, অতঃপর তাতে খাও।"

ইবনু রাজাব হাম্বালি (রহ.) বলেন, এর থেকে যে ব্যক্তির সম্পদ হালাল-হারামে মিশ্রিত তার কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট বিধান বের করা যায়। যদি তার অধিকাংশ সম্পদ

হারাম হয়, ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, তাহলে তা থেকে সংযত থাকা উচিত। তবে যদি সামান্য পরিমাণ হারাম হয় কিংবা পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে, তবে এক্ষেত্রে আমাদের হাম্বালি মাজহাবের স্কলারদের বিভিন্ন মত আছে। এটি কি মাকরূহ নাকি হারাম—এ ব্যাপারে দুটি বক্তব্যই বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তার অধিকাংশ উপার্জিত সম্পদ হালাল হয়, তাহলে তার সাথে লেনদেন, তার সম্পদ থেকে ভক্ষণ করা জায়েজ আছে।

(৭) হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাজা-বাদশাহর হাদিয়া-তুহফা (উপঢৌকন) সম্পর্কে বলেন, "এই উপঢৌকন নেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, যা তিনি হালাল সম্পদ থেকে প্রদান করেন, তার পরিমাণ যা তিনি হারাম সম্পদ থেকে প্রদান করেন তার থেকে অনেকগুণ বেশি।" অনুরূপভাবে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সাথে লেনদেন, কাজ-কারবার করতেন। অথচ তাঁরা জানতেন যে, ওরা সবাই হারাম থেকে বাঁচতো না।[১]

[১] কারজাভি, ফিকহুল আওলাভিয়্যাত...দিরাসাতুন জাদিদাতুন ফি জাওইল কুরআনি ওয়ান-সুন্নাহ।

القاعدة السابعة: مَعَارِيْضُ الْكَلَامِ مَنْدُوْحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ.

সপ্তম মূলনীতি

অস্পষ্ট বিশেষ ইঙ্গিতসূচক উক্তি মিথ্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দেয়

মূলনীতির ব্যাখ্যা:

(مَعَارِيْضُ) শব্দটি (مِعْرَاضٌ) এর বহুবচন। (التَّعْرِيْضُ فِي الْقَوْلِ) (তথা স্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীত ইঙ্গিতবহ উক্তি) থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো (প্রকাশ্য) অর্থকে গোপন করে অন্য (অপ্রকাশ্য) অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব বলেন, "তা'রিজ" হচ্ছে এমন উক্তি যার সত্য-মিথ্যা অথবা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দুটি অর্থ রয়েছে। আল্লামা আইনি বলেন, "তারিজ" স্পষ্ট উক্তির বিপরীত এক ধরনের ইঙ্গিত।" "তারিজ"-এর উদ্দেশ্যে হলো- বক্তা মিথ্যা কথন থেকে বাঁচা।

(مَنْدُوْحَةٌ) শব্দটির অর্থ প্রশস্ততা বা অবকাশ। বলা হয়; (نَدَحْتُ الشَّيْءَ) যখন প্রশস্ত করা হয়। (وإنَّكَ لَفِيْ نَدْحَةٍ ومَنْدُوْحَة مِنْ كَذَا) তুমি অমুক বিষয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছো। অর্থাৎ "তারিজ"সম্বলিত উক্তির মধ্যে এমন প্রশস্ততা রয়েছে যা দ্বারা একজন লোক ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে বেঁচে যেতে পারে।

ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ গ্রন্থে "অস্পষ্ট বিশেষ ইঙ্গিত মিথ্যা কথন থেকে নিস্কৃতি দেয়" শীর্ষক একটি অধ্যায় এনেছেন। এর (তারিজ) পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- এমনভাবে কথা বলা শ্রোতা যার একটা প্রকাশ্য অর্থ অনুধাবন করবে কিন্তু কথকের উদ্দেশ্য থাকবে ভিন্ন একটি অর্থ, ঐ উক্তির মধ্যে যার অবকাশ বাঞ্ছনীয়।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র আসর (হাদিস) সমূহ:

(ক) ওমর (রা.) বলেন-

إنَّ مَعَارِيْضَ الْكَلَامِ مَنْدُوْحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ.

"অস্পষ্ট বিশেষ ইঙ্গিত মিথ্যা কথন থেকে নিষ্কৃতি দেয়।"

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ. ৫, পৃ. ২১৫।

এর ব্যাখ্যা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন: "এটি (তারিজ) হচ্ছে এমনভাবে কথা বলা যার একটা প্রকাশ্য অর্থ থাকে কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য থাকে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতে আরেকটা অর্থ।

যেমনটি হজরত আলি (রা.) খন্দক যুদ্ধের দিন করেছিলেন। তিনি আমর ইবনু আবদে ওদ্দ-এর মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, তুমি না আমাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলে যে, আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সহযোগিতা নেবে না? তাহলে এরা কারা যাদেরকে তুমি ডেকে এনেছো? আলি (রা.)-এর কথায় বিস্মিত হয়ে আমর ইবনু আবদে ওদ্দ অন্য দিকে তাকাতেই আলি (রা.) তার পায়ের নলিদ্বয়ে এমনভাবে আঘাত করলেন, যাতে তার পা কেটে যায়। এটি একটি রণকৌশল যে, (সেনাপতি) এমন কথা বলবে যাতে শ্রোতা মনে করবে এতে তাদের জন্য বিজয় রয়েছে কিংবা এমন কথা যা তার সাথীদের মনোবল ফিরিয়ে আনবে। বাস্তবে বিষয়টি এমন না। কিন্তু উক্তিটি এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, তিনি তার উক্তিতে স্পষ্ট মিথ্যাবাদী গণ্য হবে না।[১]

(খ) ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ.

"অস্পষ্ট বিশেষ ইঙ্গিতসূচক উক্তি মিথ্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দেয়।"[২]

(গ) আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

"তিনটি বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। বিষয় তিনটি হলো- এক. স্বামী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে যদি মিথ্যা বলে। দুই. রণক্ষেত্রে মিথ্যা বলা। তিন. মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের জন্য মিথ্যা বলা।"[৩]

(ঘ) অনুরূপভাবে হিজরতের পথে যে ঘটনা ঘটেছিলো। জনৈক শত্রু ব্যক্তির সাথে আবু বকর (রা.)-এর সাক্ষাত হলে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়- আপনার সামনের

---

[১] সারাখসি, শরহুস-সিয়ারিল কাবির, খ. ১, পৃ. ৮৫-৮৬।

[২] ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, খ. ৫, পৃ. ২৮২, হা. ২৬০৯৬; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ২৯৭, হা. ৮৫৭।

[৩] ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ৪৫৪। তিরমিজি, আস-সুনান, হা. ১৯৩৯।

লোকটি কে? তখন তিনি বলেছিলেন, তিনি ঐ লোক যিনি আমাকে পথপ্রদর্শন *করেন।*"[১]

বস্তুত ক্ষেত্র বিশেষে "তারিজ" বৈধ হওয়া ইসলামি শরিয়তের নমনীয়তা ও উদারতার প্রমাণ বহন করে।

[১] ইবনু আবদিল বার, উয়ুনুল আসর, খ. ১, পৃ. ২৪৭। মুবারকপুরি, আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃ. ১৩২।

القاعدة الثامنة: ما ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدّمٌ عَلى ما ثَبَتَ بِالشَّرْطِ. (وبِمَعْناها كُلُّ شَرْطٍ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَرْعِ بَاطِلٌ)

অষ্টম মূলনীতি

শরিয়তসমর্থিত নীতিমালা শর্তসাপেক্ষ নীতিমালার ওপর অগ্রগণ্য থাকবে

(ভিন্ন অর্থে- শরয়ি নির্দেশনাবিরোধী সকল শর্ত ভিত্তিহীন বিবেচিত হবে।)[১]

মূলনীতির মর্মকথা:

الشَرْع। (শরিয়ত) অর্থ:- মহান আল্লাহ বান্দার জন্য যে ধর্মপথ প্রণয়ন করেছেন এবং যে পথের অনুকরণের আদেশ দিয়েছেন তা-ই শরিয়ত।[২]

যেসব মূলনীতির আলোকে পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তন্মধ্যে আলোচ্য মূলনীতিটি অন্যতম। অর্থাৎ, শরিয়ত নির্দেশিত বিধানের সাথে কোনো মানব নির্ধারিত শর্তের বিরোধ দেখা দিলে তখন শরয়ি বিধানটিই অগ্রাধিকার পাবে। এটি ফিকহের (Islamic jurisprudence) বিবিধ অধ্যায়ে প্রয়োগবহুল একটি নীতি। কারণ, মহান আইনপ্রণেতা প্রভু মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বিধানের প্রতি লক্ষ রেখেই আইন প্রণয়ন করেছেন। যেনো এমন এক সুগঠিত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যাতে না থাকবে কোনো অন্যায়, না কোনো অনাচার।

আলোচ্য মূলনীতির দাবি হলো- যখন শরিয়তস্বীকৃত নির্দেশনার সাথে মানবীয় কোনো শর্তের বিরোধ দেখা দেয়, যদি তা চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে হয়ে শরিয়তসমর্থিত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে তখন চুক্তি কিংবা শর্তটি বাতিল পরিগণিত হবে। বিশদভাবে বললে, মানবীয় শর্তটি যখন শরিয়তস্বীকৃত চুক্তির কোনো রুকন-ভিত্তিকে[৩] ব্যাহত করে অথবা চুক্তির কোনো মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তখন এ ধরনের

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃষ্ঠা: ১৪৯।

[২] আল মাউসুআ আল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ্, খ: ২৬, পৃ: ১৭।

[৩] রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অবিদ্যমানতা অন্য একটি বিষয়ের অবিদ্যমানতা আবশ্যক করে। কোনো বিষয়ের রুকন তার অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

শর্তের প্রভাবে স্বয়ং চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন: বিয়ের চুক্তিনামায় স্ত্রী নিজ স্বামীর জন্য বৈধ না হওয়ার চুক্তি করা অথবা বিক্রেতা ক্রেতার জন্য বিক্রিত দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বাধা প্রদানকারী কোনো শর্ত আরোপ করা। আর যখন শর্তটি চুক্তির কোনো মৌলিক বিষয়কে ব্যাহত করে না তখন স্বয়ং শর্তটিই বাতিল বিবেচ্য হয়। যেমন: বিয়ের চুক্তিনামায় স্ত্রী-মিলন না হওয়ার শর্তে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অথবা ক্রেতার জন্য বিক্রিত পণ্যের ব্যবহারকে সীমিত করা অথবা স্ত্রীর সফরকালে স্বামী সাথে না থাকার শর্ত করা। এসব ক্ষেত্রে শর্তটিই বৃথা ও অর্থহীন গণ্য হবে। তবে চুক্তিটি সঠিক হিসেবে বহাল থাকবে। কারণ, পরিণয় সূত্রের আসল উদ্দেশ্যেই হলো- স্ত্রী থেকে স্বামী উপকৃত হবে এবং বিষয়টি শরিয়ত সমর্থিতও বটে।

মূলনীতিটির প্রামাণিক ভিত্তিমূল হাদিস:

নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বাণী-

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"আল্লাহর বিধানে অবিদ্যমান সকল শর্ত অবশ্যই বাতিল, অকার্যকর।"[১]

আল্লাহর বিধানে নেই বলতে- কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত শরয়ি নীতিমালার অন্তর্গত কোনো বিষয়ের বিরোধী হওয়া।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহবিরোধী চুক্তিবন্ধন কিংবা শর্তারোপ বাতিল।

আর উপর্যুক্ত হাদিসে (كِتابُ الله) 'আল্লাহর কিতাব' বলতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যা মানবজাতির জন্য পরিবিধান করেছেন এবং যা তার ওপর অপরিহার্য করে দিয়েছেন তা-ই উদ্দেশ্য। অন্যভাষায়, প্রভুপ্রদত্ত শরিয়ত বা আইন। হাদিসে বর্ণিত 'আল-কিতাব' শব্দটি একটি মাসদার (ক্রিয়াবিশেষ্য), যা 'আল-মাকতুব' কর্তৃবাচ্য অর্থে তথা বিধিত বা বিধিবদ্ধ আইনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক যেমনটা কুরআনুল কারিমের নিম্নবর্তী আয়াতে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا﴾

"অবশ্য সুনির্ধারিত সময়ে সালাত প্রতিষ্ঠা মুমিনের ওপর বিধিবদ্ধ আইন।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩] এখানে كِتابًا অর্থ مَكْتُوْبًا।

আলোচ্য হাদিসটি মূলত হজরত বারিরাহ (রা.)-এর হাদিসের অংশবিশেষ (বারিরাহ রা. দাসী ছিলেন)। যেখানে হজরত বারিরাহকে তার মালিকরা হজরত আয়েশা (রা:)-এর কাছে বিক্রি করার পূর্বে শরিয়তবিরোধী কিছু শর্তারোপ করেছিলো।

[১] বাজ্জার, আল-মুসনাদ, খ: ১১, পৃ: ৩০, হা. ৪৭০৮; তাবরানি, আল মুজামুল কাবির, খ: ১১, পৃ: ১১, হা. ১০৮৬৯। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত।

হাদিসটি ইমাম বুখারি (রহ.) সহিহ বুখারিতে

ما يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكاتَبِ ومَنْ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتابِ اللهِ

"আবদে মুকাতাব" (মুক্তির বিষয়ে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ দাস)-এর শর্তারোপ বৈধ এবং যে আল্লাহর বিধি বহির্ভূত শর্তারোপ করে" শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজরত আয়েশা (রা.)কে বলেন:

اِبْتَاعِي فَأَعْتِقِيْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"তুমি (বারিরাহকে) ক্রয় করে নাও, পরে মুক্ত করে দাও। অবশ্যই মুক্তিদাতার হাতেই অভিভাবকত্ব থাকে।"

অতঃপর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন:

مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَه.

"কী যে হলো! মানুষেরা এমন এমন শর্তারোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে তথা বিধানে নেই? যে এমন শর্তারোপ করলো যা আল্লাহর বিধানে নেই তার সে শর্ত প্রযোজ্য নয়।"

মূলনীতিটির কতিপয় দৃষ্টান্ত:

- (واجب) অবশ্য পালনীয় বস্তুর মানত বৈধ নয়। কারণ, ওয়াজিব বিষয় শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং মানত করার পূর্বেই অবধারিত হয়ে যায়। [তাই ওয়াজিবের মানত বৈধ নয়]। যথা: জুমা ও পাঁচওয়াক্ত নামাজের মানত।
- যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এই শর্তে তালাক দিচ্ছি যে, আমার তোমাকে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা থাকবে। এক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ের কথা বাদ যাবে। তবে 'তালাকে রাজই'[১] পতিত হবে। কারণ, বিনিময়ের বিষয়টি শর্তারোপের মাধ্যমে হলো, আর ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টি শরিয়ত কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। অতএব তা শক্তিমান।

---

[১] 'তালাকে রাজই: মাসিক হয় এমন নারীদের পবিত্রকালে সহবাসমুক্ত অবস্থায় এবং যাদের মাসিক হয় না তাদের যে কোনো অবস্থায় এক তালাক দিলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত উক্ত তালাককে 'তালাকে রাজই' বলে। এরূপ তালাকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরে আসা যায় বলে– একে তালাকে রাজই বলা হয়। (অনুবাদক)

- যে ব্যক্তি পূর্বে হজ করেনি সে যখন নফল কিংবা মানত হজের ইহরাম বাঁধে তখন প্রকৃত অর্থে তার সেই হজ ফরজ হজ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, ফরজ হজের বিষয়টি শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ত আর নফল কিংবা মানতের হজের বিষয়টি নিজ ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত। অতএব প্রথমটি (ফরজ হজ) শক্তিমান।

القاعدة التاسعة: ما كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً.

নবম মূলনীতি

যা কর্মে অধিক (সওয়াব ও) মর্যদায়ও তা অধিক হবে[১]

আলোচ্য মূলনীতির শর্ত: উভয়টি কাজ সমমানের হওয়া।

মূলনীতির প্রামাণিক হাদিস:

মূলত মূলনীতিটি প্রণয়ন করেন ইমাম শাফেয়ি (রহ.)। আর এর প্রমাণ নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি-

أَجْرُكَ على قَدْرِ نَصَبِكَ

"তোমার প্রতিদান তোমার কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।"[২]

মূলনীতির আলোকে কতিপয় শাখাগত মাসআলা:

১. বিতরের তৃতীয় রাকাত আলাদা আদায়ের মাঝে অতিরিক্ত নিয়ত, তাকবির ও সালাম বিদ্যমান থাকে বিধায় এই পদ্ধতি তিন রাকাত একসাথে আদায়ের তুলনায় উত্তম। কারণ, বিতর আদায়ের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

এক. এক তাশাহ্হুদে তিন রাকাত আদায়। নবিজি এভাবে বিতরের নামাজ আদায় করেছেন।

দুই. বিতরকে বিচ্ছিন্ন করে আদায় করা, অর্থাৎ দু'রাকাত পড়ার পর তাশাহ্হুদ ও সালাম ফেরানো। অতঃপর আলাদাভাবে তৃতীয় রাকাত আদায় করা। ঠিক এখানেই বর্ণিত মূলনীতিটির যথাযথ প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ ما كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً "যা কর্মে অধিক, সওয়াব ও মর্যাদায়ও তা অধিক"।

এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত হলো: কিরাত, রুকু, সেজদা। আবার দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহ্হুদ, সালাম। এরপর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে নিয়তকে নবায়ন করা।

---

[১] সুয়ুতি, আল-আশবাহ ওয়াল নাজায়ির, পৃ: ১৪৩

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, খ: ০২, পৃ: ৮৭৬, হা. ১২১১, হজরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত।

আবার তাকবিরে তাহরিমা পাঠ অতঃপর কিরাত পাঠ, সবশেষে দ্বিতীয় তাশাহ্হুদ ও সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করা।

অতএব তাকবিরে তাহরিমার সাথে নিয়ত অতিরিক্ত হলো। এভাবে তাশাহ্হুদ ও সালামও অতিরিক্ত হলো। আর এসব অতিরিক্ত কর্মে অতিরিক্ত সাওয়াব মিলবে। তাই বলা যায়, যা কর্মে অধিক হবে, সাওয়াব, মর্যাদা এবং প্রতিফলও তার অধিক হবে। তবে শর্ত হলো– উভয় কর্ম সমমানের হতে হবে।

২. বসে নফল নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডায়মানের এবং শায়িত অবস্থায় আদায়কারীর তুলনায় বসে আদায়কারীর মর্যাদা ও সওয়াব বেশি হবে।

৩. কুরবানির গোটা পশু সদকা করার চেয়ে বরকতের উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ আহার করে অবশিষ্টাংশ সদকা করা উত্তম।

৪. শীতের সময় সিয়াম-রোজা পালনের চেয়ে গ্রীষ্মে রোজা পালন উত্তম। কারণ, গ্রীষ্মে দিবস তুলনামূলক দীর্ঘ হয় এবং শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে গরমের প্রচণ্ডতা ও কষ্ট অধিক হয়। এজন্যই নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "তোমার কষ্ট-ক্লেশ ও তোমার খরচানুপাতে তোমার প্রতিফল নির্ণয় হবে"।

৫. রজনীর প্রথমাংশে তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে শেষাংশে আদায়ের ফজিলত বেশি এবং নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ আমলই করতেন।

৬. রজনীর প্রথম ভাগে বিতর আদায়ের চেয়ে শেষ ভাগে আদায় উত্তম। এজন্য নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা রাতের সর্বশেষ নামাজে বিতরকে রাখো।

ইমাম সুয়ুতি উল্লেখ করেন, এক ইহরামে হজ ও ওমরা এক সঙ্গে আদায়ের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন ইহরামে আদায় করা উত্তম। এটিই ছিলো হজরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর দৃষ্টিভঙ্গি।

القاعدة العاشرة: ما أدّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ.

দশম মূলনীতি:
হারাম বা অবৈধের দিকে যা নিয়ে যায় তাও হারাম[১]

মূলনীতিটির ভাবচিত্র:

ইসলামের বিধিবদ্ধ নীতিমালার অন্তর্গত একটি নীতি হলো- যখন ইসলাম কোনো বস্তুকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করে তখন অবৈধ বস্তুটির দিকে ধাবিত করে এমন সকল মাধ্যম ও অবলম্বনকেও সমানভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়। যেমন, ইসলাম যখন ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ করে একই সাথে ব্যাভিচারের সকল ভূমিকা ও উপায়-উপলক্ষকেও নিষিদ্ধ করে দেয়। যথা- অনৈসলামিক পদ্ধতিতে রূপ প্রদর্শন, পাপ উদ্রেককারী নির্জনতা, অনৈতিক মেলামেশা, নগ্নচিত্র, নগ্ন সাহিত্য এবং অশ্লীল গান-বাজনা ইত্যাদি সবই হারাম।

এসব বিষয়ের ভিত্তিতে ফিকহবিদগণ মূলনীতিটি প্রণয়ন করে বলেন– "হারাম বা অবৈধের দিকে যা নিয়ে যায় তাও হারাম।"

প্রকৃত অর্থে- বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধকরণ শিরকের নামান্তর। বিষয়টি তাই গুরতর ও বিপদজনক। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"বলো, আমার পালনকর্তা নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, আর পাপ, অন্যায় বিদ্রোহ এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো সনদ তোমাদের দেননি, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না"। [সুরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩]

কতিপয় পণ্ডিতগণ এতোটুকু পর্যন্ত বলেছেন: বস্তুত ধর্মে অনাচারের মূল হলো- সঠিক জ্ঞান না রেখে আল্লাহর (বিধানের) ব্যাপারে উক্তি করা। আর যেসকল বস্তু হারামের দিকে গড়ায় তাও হারাম। উপর্যুক্ত বিষয়টিকে সামনে রেখে (سَدُّ الذَّرِيعَة) হারামের অবলম্বন রোধের নীতিটি বিধানরূপে আসে যা বর্তমানে অনেক আধুনিকতাপন্থীরা

[১] ইউসুফ কারজাভি, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩১।

القاعدة الحادية عشرة: مالُ المُسْلِمِيْنَ لا يَصِيْرُ غَنِيْمَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ بحالٍ.

একাদশ মূলনীতি

মুসলমানের ধন-সম্পদ কোনো অবস্থায় অন্য মুসলমানের জন্য গনিমতরূপে বৈধতা পাবে না[১]

আলোচ্য মূলনীতিটির প্রামাণিকতায় সাহাবির কর্মপদ্ধতি:

বর্ণিত আছে, সিফ্ফিন যুদ্ধে একজন যুদ্ধবন্দীকে হজরত আলি (রা.)-এর কাছে আনা হলে সে বলে, আমাকে হত্যা করবেন না। হজরত আলি (রা.) উত্তরে বলেলন: তোমাকে এরূপ অবস্থায় হত্যা করবো না। কারণ, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর তার অস্ত্র তার বন্দীকারীর জন্য বরাদ্ধ করে দিলেন। মূলত শত্রুর ওপর শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। অবশেষে যুদ্ধ যখন থেমে যায় বন্দী জীবিত থাকলে তার যুদ্ধাস্ত্র তাকে ফিরিয়ে দেয়া হতো। আর মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হতো। ইমাম শাবি থেকে বর্ণিত উক্তির ব্যাখ্যাও এমনই নির্দেশ করে। ইমাম শাবি বলেন: "হজরত আলি (রা:) উষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ যোদ্ধাদের যুদ্ধবাহন ও তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদকে 'গনিমত'-যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে গ্রহণ করেননি।"

উক্তিটির ব্যাখ্যা দাঁড়ায়- তিনি (হজরত আলি) সেগুলো (যুদ্ধবাহন ও তরবারি) যারা বন্দী করেছে তাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন মাত্র। তাদেরকে সেগুলোর মালিকানা প্রদান করেননি। যেনো এ পদ্ধতিতে শত্রুপক্ষের ওপর শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো মুসলমানের ধন-সম্পদ কোনো অবস্থায় অপর মুসলমানের জন্য গনিমতরূপে বৈধতা পায় না। লক্ষণীয় বিষয় হলো- বর্ণিত যুদ্ধে তিনি কোনো সম্পদকে এক পঞ্চমাংশ নীতিতে বণ্টন করেননি। তদুপরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মাঝে যুদ্ধার্জিত সম্পদ বণ্টনের দাবি জানালে তিনি উত্তরে বলেছিলেন: (হজরত আয়েশাও তো বন্দী) তোমাদের কে আয়েশা (রা:)-কে ভাগে গ্রহণ করবে, বলো? মূলত তিনি তা বলেছিলেন তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। অতএব তিনি

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ: ০৩, পৃ: ১৩১।

(বন্দীর) অস্ত্র যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো– সে যেনো বিশেষ প্রয়োজনে অস্ত্রের মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে নিতে পারে। পরে যখন যুদ্ধ স্থিমিত হয়ে আসে, অস্ত্র প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অপরদিকে আরবের কোনো পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের ওপর যখন বিজয় লাভ হয় তখন অবশ্যই তাদের পুরুষ (যুদ্ধাদের) থেকে (গনিমতরূপে) অস্ত্র কিংবা ইসলাম গ্রহণ করা হবে, অন্যকিছু নয়। ইতোপূর্বে যেমনটি আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম।[১]

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, খ: ০৩, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২।

القاعدة الثانية عشرة: مَا حَرُمَ أَخْذُه حَرُمَ إِعْطَاؤُه.

দ্বাদশ মূলনীতি

যা গ্রহণ করা অবৈধ তা প্রদান করাও অবৈধ[১]

القاعدة الثالثة عشرة: مَا حَرُمَ فِعْلُه حَرُمَ طَلَبُه.

ত্রয়োদশ মূলনীতি

যার কর্মসম্পাদন নিষিদ্ধ তার আবেদনও নিষিদ্ধ[২]

القاعدة الرابعة عشرة: مَا حَرُمَ اِسْتِعْمَاله حَرُمَ اِتِّخَاذُه.

চতুর্দশ মূলনীতি

যার ব্যবহার অবৈধ তা গ্রহণ করাও অবৈধ[৩]

উপর্যুক্ত মূলনীতিত্রয় প্রায় সমার্থক। প্রত্যেকটি হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুর সকল দ্বার রূদ্ধ করে দেয়ার অর্থ দেয়, চাই তা গ্রহণ ও প্রদান, কার্যসম্পাদন ও আবেদন, ব্যবহার ও বরণ যে পর্যায়ের হোক না কেনো।

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামল আদালিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ২০, ধারা: ৩৪।

[২] মাজাল্লাতুল আহকামল আদালিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ২০, ধারা: ৩৫।

[৩] সুয়ূতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ১৫০।

মূলনীতিত্রয়ের প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

এর প্রমাণে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস:

لُعِنَتْ الخَمْرُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِها وعاصِرِها، ومُعْتَصِرِها، وبَائِعِها، ومُبْتاعِها، وحامِلِها، والمَحْمُولَةِ لهُ، وآكِلِ ثَمَنِها، وشارِبِها، وساقِيْها.

"মদের ওপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে: স্বয়ং মদ (অভিশপ্ত), মদের উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা ও ক্রেতা, তার বাহক এবং যার কাছে তা বহন করে নেয়া হয়, এর মূল্য ভোগকারী অর্থাৎ এর ওপর জীবিকা নির্বাহী, মদ্যপায়ী, ও তার পরিবেশক। সকলই অভিশপ্ত-মালউন।"[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে- "নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদের ব্যাপারে দশটি বিষয়কে সমানভাবে অভিসম্পাত করেছেন।[২]

ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায়, "মহান আল্লাহ মদকে অভিসম্পাত করেছেন।[৩]

অপর একটি হাদিসে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليْهِمْ الشُحُومُ فَجَمَلُوْها فباعُوْها

হাদিসটির পূর্ণরূপ: (ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন: হজরত ওমরের (রা.)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, হজরত সামুরা (রা.) মদ বিক্রি করেছেন। তখন বললেন, সে কি নবিজির বিখ্যাত উক্তিটির কথা জানে না?)

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليْهِمْ الشُحُومُ فَجَمَلُوْها فباعُوْها

"মহান আল্লাহ ইহুদিদেও ওপর অভিসম্পাত করুন। তাদের জন্য (গরু, ছাগলের) চর্বিকে নিষিদ্ধ করা হয় অথচ তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো।"[৪]

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ১১২১, হা. ৩৩৮০, বর্ণনাকারী: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.)।

[২] প্রাগুক্ত, হা. ৩৩৮১, বর্ণনাকারী: আনাস ইবনু মালিক (রা.)।

[৩] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ: ০৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬, হা. ৩৬৭৪, বর্ণনাকারী: আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর।

[৪] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ: ০৪, পৃ: ১৭০, হা. ৩৪৬০; মুসলিম, আস-সহিহ, খ: ০৩, পৃ: ১২০৭, হা. ১৫৮২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ১১২২, হা. ৩৩৮৩, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

মূলনীতিত্রয়ের কতিপয় দৃষ্টান্ত:

- সুদ গ্রহণ ও প্রদান অবৈধ। নবিজি (সা.) বলেন:

  لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ

  "আল্লাহ সুদখোর, সুদদাতা, তার সাক্ষী ও হিসাবরক্ষক সবাইকে অভিসম্পাত করেন।"[১]

  ব্যাভিচারীনীর অবৈধ রোজগার, গণক বা ভবিষ্যৎবক্তার উপার্জন, ঘুষ বিনিময়, পেশাদার ক্রন্দনী নারীর বিনিময়, বাঁশরীর আয় এগুলোর গ্রহণ-প্রদান সবটাই অবৈধ।
- মদপান, ব্যাভিচার, হত্যা ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি কোনো উপায়ে অন্যের কাছে তার আবেদনও সমানভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, নিষিদ্ধ কাজ করা ও তার নির্দেশ দেওয়া উভয়ই অবৈধ।
- স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত তৈজসপত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসে সেগুলোর ব্যবহারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। এগুলোর পরিগ্রহণ এবং সংরক্ষণও বরাবরই নিষিদ্ধ হবে যেনো এসব তৈজসপত্রের সংরক্ষণ ব্যবহারের একটি উপায় হয়ে না যায়।
- অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি শিকার করে না অথবা যার গবাদি পশু কিংবা ক্ষেত-খামারের পাহারার ইচ্ছা নেই তার জন্য কুকুর লালন নিষিদ্ধ।
- নাচ-গানের বাদ্যযন্ত্র (Musical instruments) গ্রহণ-সংরক্ষণও একই ধারায় নিষিদ্ধ।
- অবিকলভাবে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে সদকা প্রদান করা বৈধ নয়। কারণ, তার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। হাদিসর ভাষ্যমতে,

  لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ قَوِيٍّ أَوْ سَوِيٍّ

  "ধনীর জন্য, সামর্থ-সবল ও সুস্থ ব্যক্তির জন্য দান সদকা (গ্রহণ করা) বৈধ হবে না।"[২]

---

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ: ০৬, পৃ: ২৭, হা. ৩৭২৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ৭৬৪, হা. ২২৭৭, আবু দাউদ, আস-সুনান; খ: ০৩, পৃ: ২৪৪, হা. ৩৩৩৩; তিরমিজি, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ৫০৩, হা. ১২০৬। বর্ণনাকারী: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:), হাদিসটি সহিহ। আল জামিউস সাগির ওয়া জিয়াদাতুহু, ইমাম সুয়ুতীকৃত, খ: ০২, পৃ: ৯০৬, হা. ৫০৮৯।

[২] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, খ: ১১, পৃ: ৮৪, হা. ৬৫৩০ এবং খ: ১১, পৃ: ৪০৩, হা. ৬৭৯৮; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ১১৮, হা. ১৬৩; তিরমিজি, আস-সুনান, খ: ০২, পৃ: ৩৫, হা. ৬৫২, বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা:)। ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ: ০১, পৃ: ৫৮৯, হা. ১৮৩৯; বর্ণনাকারী: হজরত আবু হুরায়রা (রা:), শব্দ গ্রহণে আবু দাউদ।

القاعدة الخامسة عشرة: مَنْ شَرَطَ عَلى نَفْسِه طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.

পঞ্চদশ মূলনীতি

যে চাপের মুখে নয়, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর শর্তারোপ করে তা তার ওপর আবর্তিত হয়

উপর্যুক্ত (Text) বক্তব্যটি একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি যা পরবর্তীতে মূলনীতির রূপ পরিগ্রহণ করে। ইমাম বুখারি (রহ.) প্রমুখ কাজি শুরাইহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। হজরত ইবনু সীরীন (রহ.) [মূলত তিনিই কাজি শুরাইহের উক্তিটি বর্ণনা করেন] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "জনৈক লোক বাহন ভাড়াদাতাকে বলে, "আমি তোমার বাহন ভাড়া নেবো, আমি যদি তোমার সাথে অমুক অমুক দিনে না যায় তাহলে তোমার জন্য একশত মুদ্রা থাকবে; পরে সে সময়টিতে যাত্রা করেনি।" (এমন প্রশ্নের জবাবে) শুরাইহ্ উক্তিটি করেছিলেন: যে চাপে নয়, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর শর্তারোপ করে সেই শর্ত তার ওপর বর্তায়।[১]

তৎকালীন বিচারকদের বিবিধ বক্তব্যে বিষয়টির সুস্পষ্ট বর্ণনা আসে নিম্নরূপে:-
কতিপয় লোক কাজি শুরাইহ (রহ.)-এর কাছে এক ব্যক্তির ব্যাপারে মামলা দায়ের করে যে, সে জনৈক লোক থেকে তার বাহনকে ভাড়ায় নেয়। সে ব্যক্তি (ভাড়াগ্রহীতা) বলে রাখে, আমি যদি অমুক দিনে বের হতে না পারি তোমার ভাড়ায় এই এই পরিমাণ বৃদ্ধি হবে। সেদিন সে বের হয়নি, তো মালিক তাকে বন্দী করে কাজি শুরাইহ (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করলে শুরাইহ্ উক্তিটি করেন– "যে চাপে পড়ে নয়, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর শর্তারোপ করে আমরা তা শর্তারোপকারীর ওপর প্রয়োগ করি।"[২]

কাজি শুরাইহ্ (রহ.) এক্ষেত্রে যেকোনো প্রকারের আইনসম্মত চুক্তিতে মানব-সংযোজিত শর্তারোপের বৈধতা প্রদানে এমন একটি রায় প্রদান করেন যা একটি মূলনীতিরূপে বিবেচ্য হয়। সাথে সাথে সংযোজিত শর্তসমূহ সংশ্লিষ্ট চুক্তির বিবিধ

---

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ: ০৩, পৃ: ১৯৮।

[২] সানআনি, আল-মুসান্নাফ, খ: ০৮, পৃ: ৫৯, হা. ১৪৩০৩; ওয়াকি আদ দাব্বি, আখবারুল কুজাত, খ: ০২, পৃ: ৩৩৯।

আইন ও সিদ্ধান্তে কার্যকর প্রমাণিত হয়। তাছাড়া মূলনীতিটি নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী- الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ। "মুসলমান স্বকৃত শর্তাবলির কাছে দায়বদ্ধ।"[১]

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, খ: ০৩, পৃ: ৩০৪, হা. ৩৫৯৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, খ: ০২, পৃ: ৫৭, হা. ২৩০৯।

القاعدة السادسة عشرة: المَرْءُ مُؤاخَذٌ بِإقْرارِه.

ষষ্ঠদশ মূলনীতি

ব্যক্তি নিজ স্বীকারোক্তির কাছে দায়বদ্ধ[১]

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় স্বীকারোক্তির অর্থ:- নিজের ওপর অন্যের দায় স্বীকার করা। إقْرار (ইকরার) শব্দটি جُحُود (জুহুদ) শব্দের বিপরীত, যার অর্থ অস্বীকার করা।[২]

স্বীকারোক্তি একটি শরয়ি হুজ্জত বা প্রমাণ। আর এর প্রামাণিকতা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে সাব্যস্ত হয়। কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ হলো- ঋণভিত্তিক বা বাকী লেনদেনেকে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে দৃঢ়করণে কুরআনের নির্দেশনা। ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا﴾

"আর ঋণগ্রহীতা যেনো লেখার বিষয় বলে দেয় ও তার প্রতিপালককে ভয় করে আর কিছু যেনো কম না লেখায়।" [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮২]

যদি ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে লিখিয়ে নেয়ার কোনো অর্থ থাকতো না।[৩]

অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ﴾

"হে মুমিনরা! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদি তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও হয়।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫]

আয়াতটিতেও রয়েছে বক্ষ্যমাণ মূলনীতিটির গুরুত্বের প্রতি একপ্রকার নির্দেশনা। আলোচ্য মূলনীতিটি শুধু ওহির ভিত্তিতে নয়, যুক্তির নিরিখেও সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, একজন বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিজের ওপর মিথ্যুক হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে না এবং নিজেকে সুস্পষ্ট ক্ষতির দিকে ঠেলে দিতে পারে না। [কারণ, ব্যক্তি নিজ স্বীকারোক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকে]

---

[১] আল মাজাল্লাহ, পৃষ্ঠা: ৭৯।

[২] জায়লায়ি, তাবয়িনুল হাকাইক: কিতাবুল ইকরার, খ: ০৫, পৃ: ০২।

[৩] জায়লায়ি, তাবয়িনুল হাকাইক, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ০৩।

মূলনীতিটির কতিপয় মাসাআলা (সমস্যা ও সমাধান)

১. যদি কেউ নিজের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ঋণ স্বীকার করে নেয়, পরে আবার ভুল হওয়া বা ভুল করার দাবি করে, তার উক্ত দাবি গৃহীত হবে না। কারণ, ব্যক্তি নিজ স্বীকারোক্তির বিষয়ে দায়বদ্ধ।[১]

২. যদি জমিদার ভাড়া গ্রহণ করার বিষয়টি স্বীকার করার পর দাবি করে যে, যে মুদ্রা সে গ্রহণ করেছিলো তা জাল ছিলো,তখন তার দাবি গৃহীত হবে না।[২]

---

[১] আতাসি, শরহুল মাজাল্লাহ , ১/২২৭

[২] আলি হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, ১/৭০

القاعدة السابعة عشرة: مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ.

সপ্তদশ মূলনীতি

পাওনার [ভাগ-বাটোয়ারা] নিষ্পত্তি [পরস্পরের] শর্তানুযায়ী হবে

মূলনীতিটি ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত সরাসরি একটি উক্তি। যার ভাবচিত্রটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

মূলনীতিটির ব্যাখ্যাঃ

"পাওনা বা অধিকারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ণয় হবে সেসব শর্তানুপাতে যা উভয় চুক্তিপক্ষ নির্ধারণ করে।" স্বকৃত শর্তের কারণে ব্যক্তি শর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে যা শর্ত করেছিলো তা পূরণ করতে বাধ্য।[১]

সুন্নাহর মধ্যেও শর্তের বিষয়ে একটি ভিত্তি রয়েছে, যেমন প্রসিদ্ধ হাদিস আছে-

المسلمون عند شروطهم.

"মুসলমান তার কৃত শর্তের কাছে সদা দায়বদ্ধ।"[২]

---

[১] আল-মাউসুআ, আল বুরনু ৫/৮০৯-৮১০।

[২] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ৯২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, খ. ২, পৃ. ৫৭, হা. ২৩১০।

ঊনবিংশ অধ্যায়

نون/নুন দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ২টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ الَّتِيْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُوْلِ جَائِزٌ.

প্রথম মূলনীতি

হাদিস বিশেষজ্ঞরা যে প্রসিদ্ধ হাদিসকে (হাদিসে মাশহুর) গ্রহণ করেছেন তার মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ (কুরআন)-এর বিধান রহিত করা বৈধ[১]

মূলনীতিটির প্রমাণ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ যে হাদিসটি পেশ করা হয় তা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) তায়েফবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন মুহাররম মাসের সাত তারিখ এবং তাদের বিরুদ্ধে গুলতি (Catapult) তাক করেন। অথচ মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

"তারপর নিষিদ্ধ মাস পার হলে মুশরিকদেরকে তোমরা হত্যা করবে।" [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫]

---

[১] সারাখসি, শরহুস সিয়ারিল কাবির, ১/৬১।

القاعدة الثانية: اَلنَّهْيُ عِنْدَ الإِطْلَاقِ يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

কোনো বিষয়ে সাধারণভাবে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধতার দাবি করে

সকল মুজতাহিদ (ইসলামি আইনগবেষক) ইসলামি আইন বিষয়ক এই মূলনীতিকে সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) স্বরচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-উম্ম'-এ বলেন, মূলত নিষেধাজ্ঞা মৌলিকভাবে চূড়ান্ত নিষিদ্ধতা বোঝায়। তিনি বলেন, "কোনো বিষয়ে নবিজি থেকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসূচক বাণীর প্রকৃত অর্থ হলো–"বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ।" তবে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) যে বিষয় থেকে বারণ করেছেন তা হারাম বা নিষিদ্ধ করার জন্য নয়–এমন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে তখন বিষয়টি ভিন্ন।[১]

মূলনীতির ভিত্তিমূল:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾

"রাসুল যা তোমাদেরকে দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে নিবৃত থেকো।" [সুরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

উল্লেখ্য, কুরআন-সুন্নাহ্য় সন্নিবেশিত অধিকাংশ নিষেধাজ্ঞার ভাষা নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ দিয়েই ব্যবহৃত। আর নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ কোনো বস্তু বা বিষয় চূড়ান্ত ও পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়াকে সাব্যস্ত করে, যদি তাতে এমন কোনো লক্ষণ বা নিদর্শন না থাকে যা সে অর্থকে পরিবর্তন করে।

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপর একটি বাণী :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের ধর্মাদেশের অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

---

[১] শাফেয়ি, আল-উম্ম ৭/৩০৫।

অতএব বর্ণিত কুরআন ও হাদিস দুটি-ই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে- 'নিষেধ' নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দে কিংবা ভিন্ন মাত্রার শব্দে অবতীর্ণ হোক তা সাধারণ নিয়মে চূড়ান্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার আবেদন করে। হোক তা শরিয়ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড, যথা: ব্যভিচার, হত্যা, মদ্যপান অথবা হোক শরিয়ত সমর্থিত কর্মকাণ্ড যেমন- সিয়ামসাধনা, সালাত কায়েম ইত্যাদি।

এই আলোচনাটির বিশদ অবগতির জন্য اقتضاء النهي الفساد أو البطلان (নিষেধাজ্ঞার অন্তর্নিহিত দাবি হলো অসিদ্ধতা কিংবা অকার্যকরতা) শীর্ষক মূলনীতিটির পুনঃঅধ্যয়ন করা যেতে পারে।

বিংশ অধ্যায়

واو /ওয়াউ দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতি

(এ অধ্যায়ের অধীনে ১টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة: اَلْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

মূলনীতি:

বিশেষ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সাধারণ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অপেক্ষা শক্তিশালী হয়[১] (এই মূলনীতি ইমাম আবু হানিফার মাজহাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত)

(الولاية) واو/ওয়াউ বর্ণ যবর বিশিষ্ট হলে এর তার অর্থ দাঁড়ায়– সাহায্য করা। واو বর্ণ যের বিশিষ্ট হলে অর্থ দাঁড়ায়– কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। ফিকহের পরিভাষায়: (نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى) কোনো ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব বা অধিকার চর্চা করা, চাই সে ব্যক্তির ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, একজন কর্তৃত্বশীল অভিভাবক কারো অনুমতি ছাড়াই তার প্রতি ন্যস্ত কর্মে কর্তৃত্ব চর্চার অধিকার লাভ করে থাকে। বক্ষ্যমাণ মূলনীতি (مقاصد الشريعة) শরিয়তের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং মূলনীতিটি শরিয়তভিত্তিক শাসননীতির আওতাধীন হয়ে যায় দুটি বিষয়ে।

এক: অভিভাবকত্বের ক্ষমতাবলে অধীনের যাবতীয় কার্যপরিচালনায়।

দুই: অভিভাবকত্বের মাধ্যমে অধীনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্জিত স্বার্থ ও সুবিধাসমূহের প্রতিরক্ষা। হোক তা অতীব জরুরি বা সাধারণ প্রয়োজনীয় কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে। আর বিষয়টি আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান (Management Science)-এর توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والتدرج في ذلك 'উপযোগিতা ও দায়িত্ব বণ্টনে ক্রমধারায় উন্নতি' শীর্ষক মূলনীতির অধীনে স্বীকৃত। এর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সাধারণত প্রশাসনিক সংগঠনসমূহে নেয়া হয়ে থাকে।

(الولاية العامة) সাধারণ তত্ত্বাবধান বা অভিভাবকত্ব হলো: অপরকে বাধ্য করা ও তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান ছাড়াই তার ওপর কর্তৃত্ব চর্চা করার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করা। আর এ ধরনের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি ও সম্পদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। জাতির যাবতীয় কল্যাণসাধন ও সকল প্রকার

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ পৃ.-২৩, ধারা-৫৯; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ.-৭৩, সুয়ূতি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ-১৫৪।

ক্ষতি দূরীকরণকল্পে জীবনপ্রণালীর নানাক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলোর সাথে এই কর্তৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর রয়েছে নানা স্তর—যা রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে তার কর্মবিধায়ক ও প্রতিনিধিদের হাতে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। এ প্রকারের অভিভাবকত্ব প্রয়োগ হয় সৈন্যপ্রস্তুতি, সীমান্তরক্ষা, দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের মূল অবকাঠামোর সুরক্ষা, স্ব-স্ব স্থান থেকে রাষ্ট্রীয় বিত্ত-সম্পদ সংগ্রহ ও উপযুক্ত স্থানগুলোতে সমবণ্টন, বিচারক নিয়ুক্তি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও নানা দল-উপদল পরিগঠনে। বিদ্রোহী ও বিশৃংখলাকারীদের দমন, মামলা-মুকদ্দমা মীমাংসা, বিতর্ক-বিবাদ খণ্ডন, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও নানা দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়োগদান এবং এদের অডিট করা, অভিভাবকহীন বালক-বালিকাদের বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ—যেগুলো সমাজে নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম হতে পারে এবং যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

বিশেষ অভিভাবকত্বও কখনো ব্যক্তি ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, আবার কখনো শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। দু'কারণে সাধারণ অভিভাবকত্ব অপেক্ষা সবিশেষ অভিভাবকত্ব অধিকতর শক্তিশালী। কারণ দু'টি হলো:

১. অভিভাবকত্ব ও সংশ্লিষ্ট অধীন বিষয়ের মাঝে একমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে, তখন সেই অভিভাবকত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য অন্যান্য সাধারণ অভিভাবকত্বের তুলনায় অধিক নির্দিষ্ট ও খাস হয়ে যায়। ফলে এর প্রভাব তুলনামূলক শক্তিশালী হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত।

২. এক্ষেত্রে পদ-মর্যাদা বিবেচনার চেয়ে গুণাবলি বিবেচনা অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং বিশেষ অভিভাবকত্ব (الولاية الخاصة) এমন কিছু গুণবিবেচনায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে যা বহুলাংশে (الولاية العامة) সাধারণ অভিভাবত্বে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে না। নিচের কতিপয় দৃষ্টান্তে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

- শাসক কোনো নাবালককে তার অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিয়ে দিতে পারবে না। কারণ, সন্তানের পিতা ও দাদার স্নেহ-ভালোবাসার বিষয়টি একটি স্পষ্ট বিষয়।

- অনাথ শিশুর অভিভাবকের বর্তমানে তার সম্পদে কাজি বা বিচারকের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের কোনো অধিকার নেই। যেমন অভিভাবকের বর্তমানে অনাথ বালক-বালিকার বিবাহ তিনি দিতে পারবেন না।

মূলনীতিটির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর সুনানে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে 'নিকাহ অধ্যায়ে' 'অভিভাবকহীন বিয়ে বৈধ নয়' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَه.

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে নারী নিজ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়েতে বসলো তার বিবাহ বাতিল। পরে যদি তারা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয় তখন শাসক যার অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক হবেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, হাদিসটি হাসান।[১]

[১] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, ৪২/১৯৯, হা .২৫৩২৬; দারিমি, আস-সুনান, ৩/১৩৯৭, হা. ২২৩০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ১/৬০৫, হা.২০৮৩; তিরমিজি, আস-সুনান, ২/৩৯৮, হা. ১১০২।

একবিংশ অধ্যায়

ياء/য়া দিয়ে শুরু হওয়া মূলনীতিমালা

(এ অধ্যায়ের অধীনে ৬টি মূলনীতি রয়েছে)

القاعدة الأولى: اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.

প্রথম মূলনীতি

সন্দেহের কারণে দৃঢ়বিশ্বাস দূরীভূত হয় না[১]

'ইয়াকিন' তথা বদ্ধমূল বিশ্বাস: অর্থ স্থিতিশীলতা, ইয়াকিন (اليقين) শব্দটি يَقِرُّ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ। থেকে গৃহীত। বাক্যটি পানি যখন চৌবাচ্চায় স্থির হয়ে যায় তখন ব্যবহার হয়। সুতরাং বক্ষ্যমাণ মূলনীতিতে ইয়াকিন শব্দের অর্থ দাঁড়ায়– এমন জ্ঞান যার মাঝে সন্দেহ-সংশয় নেই।

পারিভাষিক অর্থ: অন্তরের প্রশান্তি। অন্তরে জ্ঞান স্থির হওয়া। অন্য ভাষায় পরম বিশ্বাস।

মূলনীতির মর্মকথা:

মানুষের মনে যখন সন্দেহের উদ্রেক হয় অথচ তার পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিশ্বাস থাকে, তখন সে উৎক্ষিপ্ত সন্দেহ-সংশয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশয়পূর্ব বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দিকে নির্দ্বিধায় ফিরে যাবে।

আলোচ্য মূলনীতিটি শরয়ি দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। যার ওপর নির্ভর করে ফিকহি (ইসলামি আইন বিষয়ক) বহু বিধান। এর মাঝে ইসলামি আইনের সহজসাধ্যতা ও সহানুভূতির একটি বাস্তবরূপ পরিদৃষ্ট হয়।

যেসব স্থানে বিশ্বাস চূড়ান্ত সেখানে মূলনীতিটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়মরূপে সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সন্দেহের নিরসন করে যা প্রায়শ কুমন্ত্রণা থেকে সৃষ্ট হয়। বিশেষত সালাত ও তাহারাতের অধ্যায়ে।

এ কথা সুবিদিত যে, সংশয়-কুমন্ত্রণা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যখন তা ব্যক্তির মাঝে প্রকোপ আকার ধারণ করে এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্ববান ব্যক্তি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে, আর শরয়ি দায়িত্বগুলো আদায়ে একপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন হয়। এভাবে যেসকল সমস্যা ও ফিকহি বিষয়াবলিতে বান্দা থেকে কষ্ট লাঘব ও সহমর্মিতার চিত্র ফুটে ওঠে সেখানে মূলনীতিটি বিদ্যমান। তাই

---

[১] ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৪৭।

আলোচ্য মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে ব্যক্তি তাহারাতে (পবিত্রতায়) বিশ্বাসী অথচ অপবিত্রতায় সংশয়ী, সে নিশ্চিত পবিত্র।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

আলোচ্য মূলনীতির শরয়ি দলিল হলো- ইমাম বুখারি (রহ.) সহিহ বুখারিতে কিতাবুল ওজুতে "দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া শুধু সন্দেহে ওজু করবে না" শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে হজরত ইবাদের একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। "হজরত ইবাদ ইবনু তামিম তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবিজির কাছে এমন এক লোকের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন, যার কাছে মনে হতো- নামাজের মাঝে (নামাজ ভঙ্গের) কিছু একটা ঘটে যায়। উত্তরে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً

সে যেনো তার নামাজ থেকে না ফিরে, না ছাড়ে। অর্থাৎ নামাজরত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্গমনের কোনো শব্দ সে শুনতে না পায় অথবা কোনো গন্ধ বোধ না করে।[১]

একই হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনু জায়েদ থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন: নবিজির নিকট এক লোকের ব্যাপারে অভিযোগ করা হলো, যার নামাজে কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হতো। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আওয়াজ শুনতে না পায় বা কোনো গন্ধ অনুভব না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ ছাড়বে না।[২]

ইমাম নাবাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু জায়েদের হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদিস ইসলামি স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক নীতিমালার অন্যতম একটি এবং ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি (Major Principle of Islamic Jurisprudence)। তা হলো: বস্তু নিজস্ব নীতির ওপর অবশিষ্ট থাকাকে বিবেচনা করা হয় যে পর্যন্ত এর বিপরীতে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয়। আর কোনো উৎক্ষিপ্ত সংশয় বস্তুর চূড়ান্ত নীতির ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না।[৩]

উপরিউক্ত হাদিসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, কোনো ব্যক্তি নিজ পবিত্রতায় পূর্ণ বিশ্বাসী, পরে অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ করে- তার উচিত সে যেনো পবিত্রতার বিবেচনায় নামাজ আদায় করে নেয়। এবং সাময়িক অপবিত্রতার সন্দেহে আস্থা না

[১] বুখারি, আল-জামি আস-সহিহ, ১/৩৯, হা. ১৩৭। মুসলিম, আস-সহিহ, ১/২৭৬, হা. ৩৬১-৩৬২।

[২] মুসলিম, আস-সহিহ, ১/২৭৬, হা. ৩৬১।

[৩] নাবাবি, আল মিনহাজ শরহু সহিহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ৪/৪৯।

রাখে। আর সাময়িক অপবিত্রতাকে গ্রাহ্য না করে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের অর্থে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি বলেন:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِه شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحاً.

যখন তোমাদের কেউ পেটে গোলযোগ অনুভব করে এবং তার সন্দেহ হয় আদৌ কিছু পেট থেকে নির্গত হয়েছে কি হয়নি? তখন সে মসজিদ থেকে মোটেও বের হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সরাসরি কোনো শব্দ পায় কিংবা গন্ধ অনুভব করে।[১]

হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا شَكَّ أَحَدٌ فِيْ صَلَاتِه، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى، ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ.

'যখন কারো নামাজে সন্দেহ চলে আসে– কতো রাকাত আদায় করলো ঠিক বলতে পারে না, তিন রাকাত না চার রাকাত? এমতাবস্থায় সন্দেহকে ছুঁড়ে মারবে (ভ্রুক্ষেপ করবে না) আর যতোটুকু নিশ্চিত তার ওপর বাকিটা পূর্ণ করে দেবে।'[২]

ইমাম তিরমিজি (রহ.) আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবিজি (সা.)-কে বলতে শুনেছি-

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ: صَلّٰى اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً؟ فَلْيَبْنِ عَلٰى اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثاً صَلّٰى أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

'যখন তোমাদের কেউ নিজ সালাতে ভুলে যায় যে, কি এক রাকাত আদায় করেছে না দু'রাকাত? সে এক রাকাতের সাথে দ্বিতীয় রাকাতকে পূর্ণ করবে। আর যদি নিশ্চিত না হয়, দু রাকাত না তিন রাকাত? তখন দু রাকাতের সাথে তৃতীয় রাকাতকে পড়ে নেবে। আর যদি না জানে, তিন রাকাত কি চার রাকাত? তখন তিন রাকাতের ওপর চার রাকাতকে পূর্ণ করে নেবে, তবে শেষ সালামের পূর্বে দুটি সেজদা অবশ্যই আদায় করবে।'[৩]

মূলত এ হাদিসসমূহের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামি আইনবিদগণ আলোচ্য মূলনীতিটি উদ্ভাবন করেছেন। স্পষ্ট যে, অপবিত্রতা তথা বায়ু নির্গমনের বিষয়টি বদ্ধমূল না

---

১ মুসলিম, আস-সহিহ, ১/২৭৬, হা. ৩৬২।

২ মুসলিম, আস-সহিহ, ২/৮৪; তিরমিজি, আস-সুনান, ২/১৯৩।

৩ তিরমিজি, আস-সুনান, তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান সহিহ। নাবাবি, আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব, সালাত অধ্যায়, বাবু সুজুদিস সাহবি, ৪/৩৯।

হওয়া পর্যন্ত নামাজ শুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদিসগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণবহ। তবে হাদিসগুলো শুধু এ দিকটির বর্ণনার ওপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মতো সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যন্ত হাদিসগুলো ব্যাপ্ত। এ ব্যাপ্তি ঘটেছে (تعليل وقياس) কিয়াস ও তা'লিল (কার্যকারণের সুষম প্রয়োগ)-এর সাহায্যে। ফিকহ (ইসলামি আইন)বিশেষজ্ঞরা হাদিসের সিদ্ধান্তকে সেসকল বিষয়গুলোতে (সমানভাবে) সাব্যস্ত করেন যেগুলো উল্লিখিত হাদিসগুলোর কারণতত্ত্ব ও মর্মার্থে অংশীদার বলে প্রমাণিত।

হজরত ইবনু হাজার আসকালানি (রহ.) ইমাম আবু সুলায়মান আল খাত্তাবি (রহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন: 'হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেবল এ দুটি বিষয়কেই ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর সাথে নির্দিষ্ট করা।[১] কারণ, শব্দের অর্থ যখন শব্দ অপেক্ষা ব্যাপকতর হয়, তখন সিদ্ধান্ত অর্থের সপক্ষে যায়।[২] উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এই মূলনীতিটির গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং ইসলামি ফিকহ ও উসুলুল ফিকহে (Islamic Jurisprudence & Fundamentals) মূলনীতিটির আদিগন্ত বিস্তৃতি ফুটে ওঠে। কারণ, ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায় যথা: ইবাদত, লেনদেন, দণ্ডবিধি এবং বিচার ও রায় বিষয়ক সকল অধ্যায়ে মূলনীতিটির দখল রয়েছে।

তাছাড়া এর গুরুত্বের বিষয়ে ফিকহ ও তার মূলনীতি বিশেষজ্ঞদের মত অভিন্ন। ইমাম কারাফি (রহ.) উল্লেখ করেন, এটি এমন একটি মূলনীতি যার ওপর ভিত্তি করে 'ইজমা' গৃহীত হয়, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে– সকল সংশয়পূর্ণ বিষয় নিশ্চিত অবিদ্যমান বিষয়ের ন্যায় বিবেচিত হবে।[৩]

মূলনীতিটির কতিপয় দৃষ্টান্ত:

১. যে ব্যক্তি পবিত্রতায় নিশ্চিত আবার অপবিত্রতায় সংশয়ী, সে তখন অবশ্যই পবিত্রতার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে।

২. যে ব্যক্তি কোনো নামাজের ব্যাপারে সংশয়ে থাকে যে, সে কি নামাজটি আদায় করেছিলো কি করেনি? তখন নামাজটি আদায় করা আবশ্যক ও অপরিহার্য। কারণ, নামাজটির আদায়ের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, আর নামাজ অনাদায় থাকাটাই প্রকৃত বিধান। তাই নামাজ থেকে তার দায় এড়ানো যাবে না, যতক্ষণ না সে নামাজ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে। (তবে) সন্দেহের বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি আলোচ্য মূলনীতির বর্হিভূত। সে এরূপ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।

---

[১] বিষয় দু'টি বলতে: যতক্ষণ পর্যন্ত না (হাদস) বায়ু নির্গমন নিশ্চিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজকে শুদ্ধ ধরে নেয়া।

[২] ইবন হাজার আল আসকালানি, ফাতহুল বারি শরহু সহিহ আল বুখারি, ১/২৩৮ এবং আল খাত্তাবি, আ'লাম আল হাদিস ফি শারহি সহিহ আল বুখারি, ১/২২৮-২২৯।

[৩] কারাফি, আল ফুরুক, ১/১১১।

৩. যখন কোনো ব্যক্তি দূর কোনো দেশে যাত্রা করে আর দীর্ঘদিন যাবৎ তার সংবাদ বিচ্ছিন্ন থাকে, নিরুদ্দেশ থাকে, তার নিরুদ্দেশ হওয়া বা সংবাদ বিচ্ছিন্নতাকে (বড়োজোর) তার জীবিত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে সন্দেহটি একটি চূড়ান্ত বিষয়কে অর্থাৎ বেঁচে থাকাকে রহিত করে দিতে পারবে না। সুতরাং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য নিজেদের মাঝে তার সম্পদ বণ্টন করে নেয়া বৈধ হবে না।

৪. তার বিপরীতে: যদি কোনো জাহাজ গভীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, জাহাজে অবস্থানরত ব্যক্তির মৃত্যুর রায় দেয়া হবে। কারণ তার মৃত্যু হওয়াটা অনেকটা নিশ্চিত। আর প্রবল ধারণাকে নিশ্চিতের স্থানে অধিষ্ঠিত করে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করা যাবে।

القاعدة الثانية: يُسْتَحَبُّ الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ.

দ্বিতীয় মূলনীতি

পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে বহির্গমন মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)[১]

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যা আঁকড়ে ধরা বাঞ্ছনীয়। মূলনীতির গ্রন্থগুলোতে বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞ আলোচ্য মূলনীতির ওপর সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কারণ, এটি অনুসরণের ফলে 'ইহতিয়াত' বা ধর্মপালনে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় ও ধর্মীয় সম্প্রীতি অর্জিত হয়। যেসকল বিষয়ে মতানৈক্যের প্রকৃতি হালকা ও অগভীর সেসকল বিষয়ে মতানৈক্য পরিহারের পথ ধরে সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। সুতরাং যখন কোনো মুস্তাহাব ত্যাগ করার ফলে কল্যাণ সাধিত হয় ও বিরাজমান মতানৈক্য নিরসন হয় তখন বিরোধী পক্ষের প্রামাণ্য উৎস সবল হলে এরূপ মুস্তাহাব ত্যাগ আবশ্যক। যদি এ ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ নীতিমালার অস্তিত্ব না থাকতো যা ইসলামি জীবনবিধানে মহানুভবতার চিত্র ফুটিয়ে তোলে, মানবজাতি কঠিন সমস্যা ও মারাত্মক দ্বৈতমতের শিকার হতো। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে বিশেষজ্ঞরা একজন শাফেয়ি মতাবলম্বীর পেছনে হানাফি মতাবলম্বীর নামাজ কিংবা তার বিপরীত ব্যক্তির নামাজের বৈধতার ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অথচ মাথা মসেহ ও নারী স্পর্শে ওজু ভঙ্গ হওয়া না-হওয়ার মতো শাখাগত বিষয়ে ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আবু হানিফা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (প্রকৃত অর্থে) এ বিষয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে মুজতাহিদ ইমাম এবং তারও পরের যুগ অবধি এ ধারাবাহিকতা চলে আসছিলো। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের গ্রন্থগুলো অসংখ্য বর্ণনা দিয়ে পূর্ণ।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বর্ণনা হলো- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল নাসিকার রক্তক্ষরণ ও হিজামা বা শিঙ্গা লাগানোর কারণে ওজু জরুরি মনে করতেন। একদা তাকে বলা হলো: যদি ইমাম থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ার পরও তিনি ওজু না করেন, আপনি কি তার পেছনে নামাজ আদায় করবেন? উত্তরে তিনি বললেন: কেনো নয়, আমি কি ইমাম মালিক (রহ.) এবং সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহ.)-এর পেছনে নামাজ আদায় করবো না?[২]

ইমাম তাজউদ্দিন সুবকি (রহ.) বলেন: মতবিরোধ থেকে বেরিয়ে আসার গুরুত্ব শুধুমাত্র এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতি প্রমাণিত থাকার কারণে নয়; বরং বাড়তি

---

[১] আলি আহমদ নদভি, আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১৭৩।

[২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, আল ইনসাফ ফি বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা-১১০।

সতর্কতা ও দ্বীনের খাতিরে পূর্ণ অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে। আর তা শরিয়তের একান্ত দাবিও বটে। অতএব, মতানৈক্য থেকে বহির্গমনের বিষয়টি সার্বিকভাবে প্রমাণিত এবং তা বিবেচনায় রাখা শরিয়ত নির্দেশিত তাকওয়া (আল্লাহভীতি)-এর অন্তর্ভুক্তও বটে। তাই যে ব্যক্তি দাবা খেলা হালাল মনে করেও হারাম বা নিষিদ্ধতার ধ্বংস থেকে বাঁচতে তা পরিহার করলো, সে অবশ্যই উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করলো, নিজের প্রভুভীতি প্রমাণ করলো।

আর মতানৈক্য থেকে বহির্গমন তখনই বাস্তবরূপ পাবে, যখন কোনো বস্তু অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত থাকার ফলে তা পরিহার করা হয়; কিংবা কোনো বস্তু আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত থাকার ফলে তা আদায় করা হয় ।[১]

ইমাম বদরুদ্দিন জারকাশি 'আল-খিলাফ' (মতানৈক্য) শীর্ষক শিরোনামে উল্লেখ করেন: যে বস্তুর অবৈধতা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে তা পরিহার করার মাধ্যমে এবং যে বস্তুর অপরিহার্যতা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে তা সম্পাদনের মাধ্যমে মতানৈক্য থেকে বেরিয়ে আসা উত্তম। এটি এজন্য যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের (ইসলামি আইন গবেষক) পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিংবা অন্যভাবে বললে: সঠিক সিদ্ধান্তে কেবল একজন মুজতাহিদ উপনীত হয়। কারণ, যখন একজন মুজতাহিদ তার প্রবল ধারণা ও অনুধাবনের বিপরীতে অন্য মতের বিদ্যমানতাকে অনুমোদন দিয়ে থাকেন এবং ভিন্ন মতাবলম্বী মুজতাহিদের প্রামাণ্য উৎসে সজাগ ও সুগভীর দৃষ্টি প্রদানের পরে এর এক প্রকার গ্রহণযোগ্যতা দেখতে পান, তখন তার জন্য বাঞ্ছনীয় উক্ত উৎসকে একপ্রকার মূল্যায়ন করা।

উল্লেখ্য, মতানৈক্যকে বিবেচনায় নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নীতি হবে প্রতিপক্ষের প্রামাণ্য উৎসটি সবল হওয়া। যদি তা ভিত্তিহীন ও ক্ষীণপ্রাণ হয়, তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষত যখন কেউ শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যে প্রমাণিত সুন্নাহকে অস্বীকার করে। যেমন: যদি কেউ বলে (রফয়ে ইয়াদাইন) নামাজের অভ্যন্তরে হাত উঠানোর ফলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা তার (এরূপ) মতদ্বৈততার কেনো মূল্যই দিতে পারি না। কারণ তা প্রামাণ্যবহুল অসংখ্য হাদিসবিরোধী হয়ে যায়।

মতানৈক্য থেকে বহির্গমন পছন্দনীয় হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো: তা রক্ষা করতে গিয়ে সর্বসম্মত কোনো মতের লঙ্ঘন না হওয়া। যেমন ইবনু সুরাইজ থেকে বর্ণিত: তিনি ওজুতে চেহারার সাথে কর্ণদ্বয়কে ধৌত করতেন আবার মাথার সাথে উভয়টাকে মসেহ করতেন, ফের কর্ণদ্বয়কে আলাদা করে ধৌত করতেন। এ কাজ তিনি করতেন সকলের মতের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য। কারণ, কারো বক্তব্য হলো: কর্ণদ্বয় চেহারার অংশ; আর কেউ বলেন, চেহারা মাথার অংশ; আবার কারো বক্তব্য হলো: উভয়টি ভিন্ন অঙ্গ। তবে এ কাজ করতে গিয়ে তিনি ইজমা পরিপন্থী

[১] সুবকি, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, খ. ১, পৃ. ১১২।

কাজে জড়িয়ে পড়লেন। কারণ, কেউ-ই ধোয়া ও মসেহের সমন্বয় সাধনের কথা বলেননি।[১]

মতানৈক্য থেকে বহির্গমনের নীতিটি তখন দুর্বল ঠেকে যখন প্রতিপক্ষ কোনো বিষয়কে মাকরুহ বলার ফলে মতবিরোধ থেকে বাঁচতে গিয়ে কিছু ইবাদতকে ত্যাগ করা পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। যথা: ইমাম মালিকের (রহ.) মতাবলম্বীদের কাছে একই বৎসরে একাধিকবার ওমরা পালন মাকরুহ-অপছন্দনীয়। হানাফিদের মতে, হজের মাসগুলোতে স্থানীয় ব্যক্তির জন্য কেবল তা মাকরুহ। (ইমাম শাফেয়ির কাছে একই মাসে দু'বার বা তিনবার করা পছন্দনীয়) এবার কোনো শাফে'য়ি মতাবলম্বীর জন্য উচিত হবে না মতদ্বৈততা থেকে প্রস্থান করতে গিয়ে পূর্বোক্ত মত দুটি বিবেচনায় নেয়া। কারণ, এতে অনেক কাজ ও ইবাদত কর্ম তাকে হাতছাড়া করতে হবে।

হ্যাঁ, যখন বিষয়টি সে পর্যায়ের হবে না, তখন মতবিরোধ থেকে বহির্গমন উচিত। বিশেষত যখন এতে বাড়তি ইবাদত ও অতিরিক্ত সতর্কতার বিষয় থাকবে।[২]

মূলনীতিটির প্রামাণ্যসূত্র হাদিসসমূহ:

তৎপ্রসঙ্গে নবিজি (সা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করা হয়–

يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا قَوْمُكَ حَدِيْثَ عَهْدٍ –قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ– لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً يَدْخُلُوْنَ النَّاسَ وَبَاباً يَخْرُجُوْن.

"হে আয়েশা! যদি তোমার সম্প্রদায় নবীন না হতো –ইবনু জুবাইর বলেন, অর্থাৎ, কুফর ও পৌত্তলিকতার নিকটবর্তী সময়ের লোক না হতো– আমি অবশ্যই কাবা শরিফকে ভেঙে ফেলতাম। আর তার দু'টি দরজা/ফটক তৈরি করে দিতাম: একটি দিয়ে মানুষেরা প্রবেশ করতো আর অন্যটি দিয়ে তারা প্রস্থান করতো।[৩]

অনুরূপভাবে হজরত ইবনু মাসউদ (রা.) হজরত ওসমানের (রা.) সফরকালে নামাজ পরিপূর্ণ আদায়ের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। পরে তারই পেছনে পরিপূর্ণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নামাজে দাঁড়ান এবং বলেন:'মতবিরোধ অহিতকর' ভিন্ন একটি বর্ণনায় তিনি বললেন: 'আমি আসলে মতদ্বৈততা ঘৃণা করি।'[৪]

অবশ্যই ইজমা শরিয়তসম্মত অনন্য একটি প্রমাণ। মালিকি মতাবলম্বী ইমাম মাজনি (রহ.) বলেন, আলোচ্য মূলনীতির ওপর ওলামা কিরামগণ ইজমা করেছেন। তিনি

---

[১] জারকাশি, আল মানসুর ফিল কাওইয়িদ ফিকহিয়্যাহ, খ-২, পৃ-১২৭-১৩১।

[২] জারকাশি, আল মানসুর ফিল কাওয়াইদ আল ফিকহিয়্যাহ, খ-২, পৃ-১৩২-১৩৩।

[৩] বুখারি, আস-সহিহ, খ-১, পৃ-৩৭, হা.-১২৬।

[৪] ইবনু হাজার আল আসকালানি, ফাতহুল বারি শরহু সহিহ আল বুখারি, খ-২, পৃ.-৫৬৪।

বলেন: 'মতানৈক্য থেকে প্রস্থান করা কিংবা বেরিয়ে আসা সর্বসম্মত রায়ে প্রীতিকর ও হিতকর।'[১]

উল্লিখিত মূলনীতি থেকে নির্গত কতিপয় শাখাগত মাসআলা:

- ফরজ গোসল ও ওজুতে কুলকুচা ও নাসিকা দিয়ে পানি গ্রহণ 'মানদুব' (শরিয়তে পছন্দনীয়) বিবেচিত হবে। কারণ, হানাফিদের কাছে ফরজ গোসলে ও হাম্বালিদের কাছে ওজু-গোসল উভয় পবিত্রতায় কুলকুচা ও নাসিকা দিয়ে পানি গ্রহণ ওয়াজিব।
- কুকুর চাটার ফলে পাত্রকে সাতবার ধৌত করার বিষয়টি মুস্তাহাব বিবেচিত হবে। কারণ, হাম্বালি মাজহাব মতে এই সংখ্যা ওয়াজিব।
- রজনীর মাঝে নফল রোজার নিয়ত করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। কারণ ইমাম মালেকের মতে তা ওয়াজিব।
- অনুরূপভাবে হজ-ওমরা একত্রে সম্পন্নকারী ব্যক্তি দু'টি 'তাওয়াফ' ও দু'টি 'সায়ি' পালন করবে। কারণ, ইমাম আবু হানিফার মতে তা অপরিহার্য।
- পূর্বোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে আলেমগণ ব্যক্ত করেছেন, পবিত্রতা অর্জনে মর্দন করা ও পুরো মাথা মসেহ করা এবং বিবিধ নামাজের কাজা আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। যারা এগুলো ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতানৈক্য থেকে বেরিয়ে আসার স্বার্থে।

---

[১] আল ইসআফ বিত তালাব, পৃ.-৫১; মুখতাসারু শারহিল মানহাজ আল মুনতাখাব ফি কাওয়াদি মাজহাব আল ইমাম মালিক, আহমদ বিন আল-মানজুরকৃত। সংক্ষেপকৃত: আবুল কাসেম আত-তাওয়াতি কর্তৃক।

القاعدة الثالثة: يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

তৃতীয় মূলনীতি
সামর্থ্যানুযায়ী কৃত শর্ত মেনে চলা আবশ্যক[১]

মূলনীতির মর্মকথা:

অবশ্যই সামর্থ্যানুপাতে কৃত শর্ত মেনে চলতে হবে। আর সামর্থ্যের বাইরের বিষয়টুকু বজায় রেখে চলা আবশ্যক নয়। আর তা বিবেচ্যও না। শর্তের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- যতোটুকু সম্ভব তা পালনে সচেষ্ট থাকা।

যদি আমানত প্রদানকারী আমানতদার ব্যক্তিকে বলে, আমানতটি তোমার হাতেই রাখবে; কোনো অবস্থাতেই অন্যত্র রাখবে না। পরে সে তার ঘরে রাখলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বস্তুটির দায়ভার বা ক্ষতিপূরণ তার ওপর বর্তাবে না। কারণ, তার ওপর যে শর্তটি সে করেছিলো তা স্বাভাবিকভাবে তার সাধ্যের বাইরে। আর যদি তাকে বলে– তুমি যে শহরে থাকো সেখান থেকে আমানতের বস্তু নিয়ে বের হবে না। কিন্তু সে তা নিয়ে অন্য একটি শহরে প্রস্থান করে আর বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমানতটির ক্ষতিপূরণ তাকে বহন করতে হবে।

অপরদিকে যখন আমানতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে যায়, যেমন তার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন কিংবা পরিবার অন্যত্র স্থানান্তর হলে এবং এমতাবস্থায় যদি গচ্ছিত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কারণ সাধ্যানুযায়ী শর্ত রক্ষা করা জরুরি। সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুর জন্য তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে না।

আলোচ্য মূলনীতিতে শর্ত অর্থ: 'প্রযুক্ত শর্ত' তথা বাধ্যতামূলক শর্ত (Restrictive Condition) যা রক্ষা করে চলা অপরিহার্য। এখানে অনিশ্চিত বা নির্ভরশীল শর্ত (Suspensive Condition) উদ্দেশ্য নয়। অনিশ্চিত শর্ত ও বাধ্যতামূলক শর্ত (যা আলোচ্য মূলনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য) এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো- অনিশ্চিত শর্ত হলো- যেখানে শর্তটি অন্য একটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ, বিধান তৎক্ষণাৎ কার্যকর হবে না; বরং শর্তের অস্তিত্বলাভের সময় পর্যন্ত বিধান পিছিয়ে থাকবে। অপরপ্রান্তে প্রযুক্ত কিংবা বাধ্যতামূলক শর্ত হলো: যে শর্তটি বাধ্যতামূলক ও

---

[১] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ, পৃ.-২৬, ধারা. ৮৩; মুস্তাফা আজ-জারকা, আল-মাদখালুল ফিকহি আল আম, খ-২, পৃ-১০৩৪।

সীমাবদ্ধতাজ্ঞাপক হয়। ফলে বিধান তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়। যেমন কেউ একটি বাড়ি ভাড়া দিলো এই শর্তে যে ভাড়া পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে চুক্তি শুদ্ধ ও বহাল থাকবে। ভাড়াগ্রহীতা শর্ত পূরণ করতে বাধ্য থাকবে। আর সেসব শর্তকে রক্ষা করে চলা আবশ্যক যেগুলো শরিয়তসম্মত হবে; যেকোনো প্রকারের শর্ত নয়।

মূলনীতির প্রামাণ্যসূত্র হাদিস:

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বাণী:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً

"মুসলমানগণ তাদের কৃত শর্তের কাছে দায়বদ্ধ। তবে এমন শর্ত নয়, যা হারাম (নিষিদ্ধ) বস্তুকে হালাল করতে কিংবা হালাল (বৈধ) বস্তুকে হারাম করতে আরোপ করা হয়।"[১]

মূলনীতিটির সপক্ষে কতিপয় উদাহরণ:-

১. যদি এই শর্তে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায় যে, (মূল্য আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ) ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বন্ধক রাখতে হবে বা একজন জামিনদার দিতে হবে– বিক্রি শুদ্ধ হবে এবং শর্তটি গ্রহণযোগ্য হবে।

২. যদি কেউ এই শর্তে বিক্রি করে যে, বিক্রিত দ্রব্যটি ক্রেতার মালিকানায় থাকবে, তো শর্তটি বৈধ ও শুদ্ধ। কারণ, তা বিক্রি বা লেনদেনের দাবীও বটে। অথবা বিক্রেতা শর্ত দিলো যে, মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য তার কবজে থাকবে– এই শর্তও বৈধ। কারণ, তা মূলত চুক্তির দাবীকে খুলে বর্ণনা করে।

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, ৩/ ৩০৪, হা. ৩৫৯৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৫৭, হা. ২৩০৯, হজরত আবু হুরায়রা বর্ণিত।

القاعدة الرابعة: اَلْيَدُ تُوْجِبُ إِثْبَاتَ التَّصَرُّفِ، وَلَا تُوْجِبُ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ.

চতুর্থ মূলনীতি

কর্তৃত্ব ক্ষমতাপ্রয়োগ সাব্যস্ত করে তবে মালিকানা সাব্যস্ত করে না[১]

মূলনীতির তত্ত্বকথা:

মূলনীতিতে اليد (হস্ত) থেকে উদ্দীষ্ট অর্থ: অধিকার চর্চার সুযোগ ও সম্ভাবনা। বিষয়টিকে 'হাত' দিয়ে ব্যক্ত করার কারণ হলো- হাত (বস্তুর ওপর) কবজ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার চর্চার মাধ্যম ও অবলম্বন। স্থাবর বা অস্থাবর কোনো বস্তুর ওপর শুধুমাত্র হাত রাখা কবজ করার অধিকারকে বা ব্যক্তির মালিকানাকে প্রমাণ করে না; তবে বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব চর্চা, তা দিয়ে উপকৃত হওয়া ও তার সুবিধা ভোগ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। অতএব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ্য কোনোটাই মালিকানা প্রমাণ করে না। তবে মূল বস্তুটিতে প্রকৃত মালিকানার প্রমাণ হলে তা ভিন্ন বিষয়। (অর্থাৎ এটুকুতে মালিকানা প্রমাণে বাধা নেই)

আলোচ্য মূলনীতির কতিপয় দৃষ্টান্ত ও কিছু সমস্যার সমাধান:

১. কোনো ব্যক্তির হাতে স্থাবর সম্পত্তি, ঘরবাড়ি বা ভূসম্পত্তি রয়েছে যাতে সে বসবাস করে বা ক্ষেত-জিরাত করে, বিনিয়োগ করে। কিন্তু এসব কখনোই প্রমাণ করে না যে তার হাতে থাকা জমির মালিক সে নিজেই। কারণ, মালিকানা প্রমাণ হয় দলিলের মাধ্যমে বা বিচারকের রায়ে স্বীকৃতিলাভের মাধ্যমে। এমনও তো হতে পারে মানুষটির হাতে যা রয়েছে তার তিনি ভাড়াটে।

২. কারো কাছে একটি গাড়ি রয়েছে। সে তা চালায়, এতে সে গাড়িটির মালিক প্রমাণিত হয় না। কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে তা ভাড়ায় চালায় বা সে তা লুণ্ঠন করেছে কিংবা ধারে চালায় অথবা সে তা চুরি করেছে। মালিকানা প্রমাণ হবে কেবল বস্তুটির সরকারি বা অফিসিয়াল কাগজপত্রের মাধ্যমে।

---

[১] আলি আহমদ নদভি, আল কাওয়ায়িদ আল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৩৮৩; ইমাম মাওয়ারদিও বর্ণনা করেন তার "আদাবুল কাজি" গ্রন্থে।

القاعدة الخامسة: يُتحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِمَنْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

পঞ্চম মূলনীতি

ব্যাপক ক্ষতি রোধ করার জন্য বিশেষ ক্ষতি সহ্য করতে হবে

আলোচ্য মূলনীতিটি 'তায়সিরুত তাহরির' গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত ভাষায় এসেছে: [دَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِّ وَاجِبٌ بِإِثْبَاتِ الضَّرَرِ الْخَاصِّ] 'ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি নিরসন করা অপরিহার্য।'[১]

এটি শরিয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। ইসলামি আইনবিশারদগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে নীতিটি আহরণ করেছেন।

মূলনীতিটির কতিপয় সমস্যা ও সমাধান:

১. কোনো কোনো ইসলামি আইনবিদ অনভিজ্ঞ ডাক্তার, কৌতুকপ্রিয় তথা হিল্লাবাজ মুফতি (অর্থাৎ যিনি সাধারণ লোককে হিল্লা শিক্ষা দেন) কপর্দকহীন ভাড়াদাতা (অর্থাৎ যার হাতে ভাড়ায় প্রদত্ত বস্তুর মালিকানা নেই, তবে ভাড়া প্রদান করে)–এদের সবাইকে নিজ নিজ পেশা চর্চা থেকে রুখে দেয়ার ফাতয়া প্রদান করেছেন। প্রথম প্রকার ব্যক্তি থেকে শরীওে, দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি থেকে ধর্মে, তৃতীয় প্রকার ব্যক্তি থেকে সম্পদে ক্ষতি হওয়ার আশংকায় এমন ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।[২]

২. ক্ষতিকারক যাদুকর ও বিভ্রান্তকারী কাফিরের হত্যা করা। কারণ, প্রথম ব্যক্তি সাধারণ লোককে সম্মোহিত করবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মানুষকে কুফরির দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে। অতএব জনগণের ক্ষতি নিরসনে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সহ্য করা হবে/ মেনে নিতে হবে।

৩. যখন স্থাপনা ধ্বংসোন্মুখ ও পতনোন্মুখ হয়, তখন তার সত্বাধিকারীকে তা ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হবে। পথিকদের ওপর তা ভেঙে পড়ার আশংকার ফলে।[৩]

---

[১] তায়সিরুত তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ, খ. ০২, পৃ. ৩০১।

[২] আমির বাদশাহ, তায়সিরুত তাহরির, খ. ২, পৃ. ৩০১।

[৩] দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ৩৬।

৪. প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যমান নির্ধারণ। ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রির ওপর বণিকগোষ্ঠীর সিন্ডিকেট গঠনকে রোধ করতে মূল্যমান নির্ধারণ বৈধ।[১]

[১] আল মুহাসিবি, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৫৬; ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃ. ৯৬।

القاعدة السادسة: يُقَدَّمُ فِيْ كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا.

ষষ্ঠ মূলনীতি

সকল প্রশাসনিক দায়িত্বে স্ব-স্ব স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ বিধানে যোগ্যতর ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে[১]

এই মূলনীতিটি শরিয়তভিত্তিক শাসন পরিচালনাসংশ্লিষ্ট নীতিলামার অন্তর্গত। মূলত এটি একটি শরিয়তস্বীকৃত সূত্র থেকে উৎসারিত। তা হচ্ছে– [جلب المنافع ودرء المفاسد] 'কল্যাণকর সবকিছু আহরণ এবং অকল্যাণকর সবকিছু দূরীকরণ।' এর ওপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ মাসাআলার সমাধান করা হয়।

তন্মধ্যে অন্যতম হলো- বিচারকের পদে ঐ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে যিনি তুলনামূলক সতর্ক, তর্কবিতর্কের নানান পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বাদী-বিবাদীর মামলা-মকদ্দমা পরিচালনার যাবতীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্সে যিনি অধিক পারঙ্গম।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে রণকৌশলসমূহে অভিজ্ঞ এবং অসম সাহসী ও সৈন্য-সামন্তের শাসনে অধিক জ্ঞানীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সরকারি আমানতে, সচিবালয়ে যিনি অনাথ শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও তাদের সম্পদের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে পরিজ্ঞাত তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যিনি অত্যধিক আল্লাহভীরু এবং ফিকহ ও তার মূলনীতির বর্ণনাগুলো সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী, ফাতওয়া প্রদানে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

অনেকসময় একটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি অন্য একটি ক্ষেত্রে পশ্চাদগামী হতে পারে। যেমন পুরুষদেরকে যুদ্ধে ও নেতৃত্বে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, তবে তাদেরকে লালন-প্রতিপালনের বিষয়ে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ওপর নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ শিশুদেরকে বাড়তি সহিষ্ণুতা ও স্নেহ দিয়ে নারীরাই লালনপালন করতে পারে।[২]

---

[১] কারাফি, আল ফুরুক, ৩/১০২ ও ২০৬।

[২] জারকাশি, আল-মানসুর ফিল কাওয়াইদ, খ. ১, পৃ. ৩৮৮।

এ ধারাবাহিকতায় নামাজে ফকিহকে (ইসলামি আইন গবেষক) কারি সাহেবের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কেননা, তিনি নামাজের যথাযথ নিয়মকানুন ও নামাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে সম্যক অবগত। আর সার্বজনীন স্বার্থরক্ষাকল্পে সাধারণ নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রনেতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। কারণ সার্বজনীন স্বার্থ ও সুবিধাকে সর্বদা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়।[১]

---

[১] জারকাশি, প্রাগুক্ত। ১/৩৮৯।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আল-কুরআনুল কারিম ও তাফসির:

- আল-কুরআনুল কারিম
- আল-ওসমানি, মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.), মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

খ. আল-হাদিস:

- ইমাম মালিক, মালিক ইবনু আনাস ইবনুল আসবাহি আল-মাদানি, (মৃত্যু: ১৭৯ হি.), *আল-মুয়াত্তা,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহয়াইত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, (১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.)।
- আল-কাজি, আবু ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম আল-আনসারি, (মৃত্যু-১৮২ হি.), *আল-খারাজ,* নিরীক্ষণ: তহা আবদুর রউফ সাআদ, সাআদ হাসান মুহাম্মদ, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত-তুরাসি, কায়রো, মিসর, (১০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.)।
- আল-কুরাশি, আবু জাকারিয়া, ইয়াহয়া ইবনু আদাম ইবনু সুলায়মান, আল-কুফি আল-আহওয়াল, (মৃত্যু: ২০৩ হি.), *আল-খারাজ,* আত-তাবআতুস-সালাফিয়্যাহ, (২য় মুদ্রণ: ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.)।
- আত-তায়ালাসি, আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-বাসরি, (মৃত্যু-২০৪ হি.), *আল-মুসনাদ,* নিরীক্ষণ: ড. আবদুল মুহসিন আত-তুরকি, দারুল হাজর লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশ্‌র ওয়াত-তাওজিহ ওয়াল-ইলান, কায়রো, মিসর, (১ম সংস্করণ: ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.)।
- আশ-শাফেয়ি, আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইদরিস, আল-কুরাশি, (মৃত্যু-২০৪), *আল-উম্ম,* দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন।
- আস-সানআনি, আবু বকর আবদুর রজ্জাক ইবনু হুমাম ইবনু নাফি আল-হুমায়রি, আল-ইয়ামানি, (মৃত্যু: ২১১ হি.), *আল-মুসান্নাফ,* নিরীক্ষণ: হাবিবুর রহমান আল-আযামি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪০৩ হি./১৯৯২ খ্রি.)।
- আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম ইবনু আবদুল্লাহ আল-হারাউই, আল-বাগদাদি, (মৃত্যু: ২২৪ হি.), *আল-মুসান্নাফ,* নিরীক্ষণ: খলিল মুহাম্মদ হারাস, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
- আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু হিলাল ইবনু আসাদ আশ-শায়বানি, (মৃত্যু: ২৪১ হি.), *আল-মুসনাদ,* নিরীক্ষণ: শুআইব আল-আরনাউত, আদিল মুরশিদ ও অন্যরা,

মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪২১ হি./২৯৯১ খ্রি.)।

- বুখারি, আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহিম ইবনুল মুগিরা, (মৃত্যু: ২৫৬ হি.), *আল-জামি আস-সহিহ,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ইবনু যুহাইর আন-নাসির, দারু তাওকিন-নাজাত, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.)।
- মুসলিম, আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আল-কুশাইরি আন-নিশাপুরি, (মৃত্যু: ২৬১ হি.), *আস-সহিহ,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১২ হি./ ১৯৯১ খ্রি.)।
- আদ-দারিমি, আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনু অবদুর রহমান, আত-তামিমি, (মৃত্যু- ২৫৫ হি.), *আস-সুনান,* নিরীক্ষণ: হুসাইন সালিম আসদ আদ্দারানি, দারুল মুগনি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজি, রিয়াদ, সৌদি আরব (১ম সংস্করণ: ১৪১২ হি. ২০০০ খ্রি.)।
- ইবনু মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ আল-কাজভিনি, (মুত্যু: ২৭৩ হি.), *আস-সুনান,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
- আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস ইবনু ইসহাক আল-আজদি, আস-সিজিসতানি, (মৃত্যু: ২৭৫ হি.), *আস-সুনান,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ মহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সিদা, বৈরুত, লেবানন।
- সাঈদ ইবনু মানসুর, আবু ওসমান সাঈদ ইবনু মানসুর ইবনু শুবা, আল-খুরাসানি, আল-জাওজাযানি, (মৃত্যু: ২২৭ গি.), *আত-তাফসির মিন সুনানি সাঈদ ইবনু মানসুর,* নিরীক্ষণ: ড. সাআদ ইবনু আবদুল্লাহ আলে হুমাইদ, দারুস সামিয়ি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজিহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।
- আত-তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মুসা, (মৃত্যু: ২৭৯ হি.), *আস-সুনান,* নিরীক্ষণ: বাশ্শার আউওয়াদ মারুফ, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.)।
- আল-বাজ্জার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবদুল খালিক, আল-আতাকি, (মুত্যু: ২৯২ হি.), *মুসনাদুল বাজ্জার/আল বাহরুজ জাখ্খার,*

নিরীক্ষণ: ড. মাহফুজুর রহমান জায়নুল্লাহ, আদিল ইবনু সাআদ ও সাবরি আবদুল খালিক আশ-শাফেয়ি, মুআস-সাসাতুল উলুমিল কুরআন, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, আল-মদিনা, সৌদি আরব, (১ম সংস্করণ: ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.)।

- আন-নাসায়ি, আবু আবদির রহমান, আহমদ ইবনু শুআইব ইবনু আলি আল-খুরাসানি, (মৃত্যু: ৩০৩ হি.), *আস-সুনানুল কুবরা,* নিরীক্ষণ: আবু গুদ্দাহ, আবদুল ফাত্তাহ, মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, হালব, (২য় মুদ্রণঃ: ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।
- আত-তাহাবি, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু সালামাহ, আল-আযদি, আল-মিসরি, (মৃত্যু: ৩২১হি.), *মুখতাসারু ইখতিলফিল ওলামা,* নিরীক্ষণ: ড. আবদুল্লাহ নজির আহমদ, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.)।
- আল-হারিসি, আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইয়াকুব, আল-বুখারি, (মৃত্যু: ৩৪০ হি.), *মুসনাদুল ইমাম আল-আযাম আবি হানিফা নুমান ইবনু সাবিত আল-কুফি,* নিরীক্ষণ: লতিফুর রহমান আল-বাহরাইজি আল-কাসেমি, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, মক্কা, সৌদি আরব, (১ম সংস্করণ: ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.)।
- ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান ইবনু আহমদ আত-তামিমি, আল-বুসতি, (মৃত্যু: ৩৫৪ হি.), *সহিহু ইবনি হিব্বান বিতারতিবি ইবনি বালবান,* নিরীক্ষণ: শুআইব আল-আরনাউত, মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবান, (২য় মুদ্রণ: ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।
- আত-তাবরানি, আবুল কাসেম, সুলায়মান ইবনু আহমদ ইবনু আইয়ুব আশ-শামি, (মৃত্যু: ৩৬০ হি.):

- *মুসনাদুশ শামিয়্যিন,* নিরীক্ষণ: হামদি ইবনু আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. /১৯৮৪ খ্রি.)।
- *আল-মুজামুল কাবির,* নিরীক্ষণ: হামদি ইবনু আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, মাকতাবাতু ইবনু তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, (২য় সংস্করণ)।
- *আল-মুজামুল আউসাত,* নিরীক্ষণ: হামদি ইবনু আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, দারুল হারামাইন লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজিহ, কায়রো, মিসর, (১ম সংস্করণ: ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.)।

- আদ-দারাকুতনি, আবুল হাসান, আলি ইবনু আহমদ ইবনু মাহদি আল-বাগদাদি, (মৃত্যু: ৩৮৫ হি.), *আস-সুনান,* নিরীক্ষণ: শুআইব আল-আরনাউত, হাসান আবদুল মুনিম শিবলি, আবদুল লতিফ হিরযুল্লাহ, আহমাদ বারহুম, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবান, (১ম সংস্করণ: ১৪২৪ হি./২৯৯৪ খ্রি.)।
- আল-খাত্তাবি, আবু সুলায়মান, হামদ ইবনু ইবরাহিম ইবনুল খাত্তাব আল-বুসতি, (মৃত্যু: ৩৮৮ হি.):

- *মাআলিমুস-সুনান,* আল-মাতবাআতুল ইলমিয়্যাহ, হালব, (১ম সংস্করণঃ: ১৩৫১ হি. /১৯৩২ খ্রি.)।
- *আলামুল হাদিস ফি শরহি সহিহিল বুখারি,* মারকাজুল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ও ইহয়াউত-তুরাসিল ইসলামি, মাক্কাতুল মুকাররাম, আল-মামলাকুতল আরাবিয়্যাহ আস-সাউদিয়্যাহ, (১ম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. / ১৯৮৮ খ্রি.)।

- আল-হাকিম, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আন-নিশাপুরি, (মুত্যু: ৪০৫ হি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহিহাইন,* নিরীক্ষণ: মুসতাফা আবদুল কাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)।
- আল-কুজায়ি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু সালামা আল-মিসরি, (মৃত্যু: ৪৫৪ হি.), *মুসনাদুশ-শিহাব,* নিরীক্ষণ: হামদি ইবনু আবদুল মাজিদ আস-সালাফি, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।
- আল-বায়হাকি, আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলি আল-খুরাসানি, (মৃত্যু-৪৫৮ হি.), *আস-সুনানুল কুবরা,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ আবদুল কাদির, আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪২৪ হি./ ২০০৩ খ্রি.)।
- আন-নাবাবি, আবু জাকারিয়া, মহিউদ্দিন ইবনু শরফুদ্দিন, (মৃত্যু-৬৭৬ হি.):

- *আল-আরবাউন আন-নাবাউইয়্যা,* নিরীক্ষণ: কুসাই মুহাম্মদ নৌরাস আল-হাল্লাক, আনওয়ার ইবনু আবিশ-শায়খি, দারুল মিনহাজ লিন নাশর ওয়াত-তাওজি, বৈরুত, লেবানন, (১ম মুদ্রণ: ১৪৩০ হি. / ২০০৯ খ্রি.)।
- *আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ,* দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ ১৩৪৭ হি./১৯২৯ খ্রি.)।

- আজ-জাইলায়ি, আবু মুহাম্মদ জামালুদ্দিন, আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, (মৃত্যু: ৭৬২ হি.), *নাসবুর রায়াহ লি-আহাদিসিল হিদায়াহ,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ইউসুফ আল-বিননুরি, মুআস্সাসাতুর রাইয়ান লিত-তাবাআহ, ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, লেবানন। দারুল কিবলাহ লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, জেদ্দা, সৌদি আরব, (১ম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. / ১৯৯৭ খ্রি.)।
- আল-আসকালানি, আবুল ফজল আহমদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু হাজর, (মৃত্যু: ৮৫২ হি.)।

- *বলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম,* নিরীক্ষণ: ড. মাহির ইয়াসিন আল-ফাহাল, দারুল কাবাস লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজিহ, রিয়াদ, সৌদি আরব (১ম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ২০১৪ খ্রি.)।
- *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব, দারুল মারিফা, বৈরুত, (১৩৭৯ হি./১৯৫৯ খ্রি.)।
- *আদ-দিরায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়াহ,* নিরীক্ষণ: আস-সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ হাশিম আল-ইয়ামানি আল-মাদানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন।

- ইবনুল কাইয়্যিম, শামসুদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনু আবি বকর ইবনু আইয়ুব, (মৃত্যু: ৭৫১):

- *ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শায়তান,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ হামেদ আল-ফাকি, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব।
- *ইলামুল মুআক্কিইন আন রব্বিল আলামিন,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ আবদুস সালাম ইবরাহিম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১১হি./১৯৯১ খ্রি.)।

- আল-আলায়ি, সালাহুদ্দিন আবু সাঈদ, খলিল ইবনু কাইকালদি ইবনু আবদিল্লাহ আদ-দিমাশকি, (মৃত্যু: ৭৬১ হি.), *আল-মাজমুউল মুজহাব ফি কাওয়াইদিল মাজহাব,* নিরীক্ষণ: ড. মুহাম্মদ ইবনু আবদুল গাফফার, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত, (১ম সংস্করণ: ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)।
- আল-আইনি, বদরুদ্দিন, আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনু আহমদ ইবনু মুসা আল-হানাফি, (মৃত্যু: ৮৫৫ হি.), *উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি,* দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন।

◆ আশ-শাওকানি, মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবদ, আল-ইয়ামানি, (মৃত্যু: ১২৫০ হি.), *নাইলুল আওতার*, নিরীক্ষণ: ইসামুদ্দিন আস-সাবাবিতি, দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর, (১ম সংস্করণ: ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।

গ. ফিকহ:

◆ আল-কুদুরি, আবুল হুসাইন, আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু জাফর, (মৃত্যু: ৪২৮ হি.), *আল-মুখতাসার*, নিরীক্ষণ: কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ উওয়াইসাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.)।

◆ আল-কাসানি, আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনু মাসউদ ইবনু আহমদ আল-হানাফি, (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.), *বাদায়িউস-সানায়ি ফি তারতিবিশ-শারায়ি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।

◆ আল-মারগিনানি, বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান, আলি ইবনু আবি বকর ইবনু আবদুল জলিল আল-ফারগানি, (মৃত্যু: ৫৯৩ হি.), *আল-হিদায়াহ*, নিরীক্ষণ: তালাল ইউসুফ, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।

◆ ইবনু কুদামাহ, আবু মুহাম্মদ মুওয়াফফাক উদ্দিন, আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি সুম্মাদ- দিমাশকি আল-হাম্বলি, (মৃত্যু: ৬২০ হি.), *আল-মুগনি*, মাকতাবুল কাহিরাহ, কায়রো, মিসর, (১ম সংস্ক্রণ: ১৩৮৮ হি./ ১৯৬৮ খ্রি.)।

◆ আল-খাসসাফ, আহমদ ইবনু ওমর ইবনু মুহাইর আশ-শায়বানি, (মৃত্যু: ২৬১ হি.), *শরহু আদাবিল কাজি*, নিরীক্ষণ: মহিউদ্দিন হিলাল আস-সারহান, মাতবাআতুল ইরশাদ, বাগদাদ, ইরাক, (১ম সংস্করণ: ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খ্রি.)।

◆ আল-হুসাইরি, জামালুদ্দিন আবুল মাহামিদ, মাহমুদ ইবনু আহমদ ইবনু আবদুস-সাইয়্যিদ আল-বুখারি, (মৃত্যু: ৬৩৬ হি.), *আত-তাহরির শরহুল জামিয়িল কাবির*, নিরীক্ষণ: ড. আলি আহমদ গোলাম মুহাম্মদ আন-নাদাভি, *আল-কাওয়াইদি ওয়াদ-দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফিত-তাহরিরি শরহিল জামিয়িল কাবির: দিরাসাহ তাতবিকিয়্যাহ*, (রিসালাতুন

মুকাদ্দামাতুন লিলহুসুলি আলা দারজাতিদ-দাকতুরাহ ফিল উসুল, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.)।

- ইবনু দাকিকিল ঈদ, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু ওয়াহাব আল-কুশাইরি, (মৃত্যু: ৭০২ হি.), *ইহকামুল আহকাম শরহু উমদাতিল আহকাম*. মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ।
- ইবনু তায়মিয়া, তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু আবদুল হালিম আল-হারানি, (মৃত্যু: ৭২৮ হি.), *মাজমুউল ফাতাওয়া,* নিরীক্ষণ: আবদুর রহমান, ইবনু মুহাম্মদ ইবনু কাসেম, মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ লিতাবাআতিল মুসহাফিশ-শরিফ, মদিনা, সৌদি আরব, (১ম সংস্করণ: ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)।
- ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল ওয়াহিদ আস-সিওয়াসি, (মৃত্যু: ৮৬১ হি.) *ফাতহুল কাদির,* দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
- শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভি, আহমদ ইবনু আবদুর রহিম ইবনুশ-শহিদ ওয়াজিহুদ্দিন ইবনু মুআজ্জম, (মৃত্যু: ১১৭৬ হি.):
  - *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,* দারুল জিল, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. /২০০৫ খ্রি.)।
  - *আল-ইনসাফ ফি বায়ানিল ইখতিলাফ,* নিরীক্ষণ: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, দারুন-নাফায়িস, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪০৪ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।
- আল-কারজাভি, ড. ইউসুফ আবদুল্লাহ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম,* মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কায়রো, মিসর, (২২তম মুদ্রণ: ১৪১৮ হি. /১৯৯৭ খ্রি.)।

ঘ. উসুলুল ফিকহ এবং কাওয়াইদুল ফিকহ:

- আল-কারখি, আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনু দিলাল, (মৃত্যু: ৩৪০ হি.), *আল-উসুল,* মাতবাআতু জাবেদ প্রেস, করাচি, পাকিস্তান।
- আদ-দাবুসি, আবু জায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনু ঈসা আল-হানাফি, (মৃত্যু: ৪৩ হি.), *তাসিসুন-নজর,* নিরীক্ষণ: মুস্তাফা মুহাম্মদ আল-কুব্বানি আদ-দিমাশকি, দারু ইবনি যাইদুন, লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজি, বৈরুত, লেবানন। মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, মিসর।

- আস-সারাখসি, শামসুল আয়িম্মা, মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু আবি সাহাল, (মৃত্যু: ৪৩৮ হি.):

  - *শরহুস-সিয়ারিল কবির,* দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।
  - *আল-মাবসুত,* দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।
  - *আল-উসুল,* নিরীক্ষণ: আবুল ওয়াফা আল-আফগানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন।

- আল-গাজালি, আবু হামেদ, মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আত-তুসি, (মৃত্যু: ৫০৫ হি.), *আল-মুসতাসফা,* আল-মাতবাআতুল আমিরিয়্যাহ, বৌলাক, মিসর, (১ম সংস্করণ: ১৩২২ হি./ ১৯০৪ খ্রি.)।
- কাজি খান, ফখরুদ্দিন হাসান ইবনু মানসুর আল-ফারগানি আল-হানাফি, (মৃত্যু: ৫৯২ হি.), *শরহুজ-জিয়াদাত,* বৌলাক, মিসর।
- আল-আমেদি, সাইয়্যিদ উদ্দিন আবুল হাসান, আলি ইবনু আবি আলি ইবনু মুহাম্মদ আস-সালাবি, (মৃত্যু- ৬৩১ হি.), *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম,* নিরীক্ষণ: আবদুর রাজ্জাক আফিফি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)।
- আজ-জানজানি, শিহাবুদ্দিন আবুল মানাকিব, মাহমুদ ইবনু আহমদ ইবনু মাহমুদ, (মৃত্যু: ৬৫৬ হি.), *তাখরিজুল ফুরু আলাল উসুল,* নিরীক্ষণ: ড. মুহাম্মদ আদিব সালিহ, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, (৪র্থ মুদ্রণ: ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)।
- ইবনু আবদিস সালাম, ইজ্জুদ্দিন আবু মুহাম্মদ, আবদুল আজিজ আবদুস সালাম ইবনু আবিল কাসেম আস-সুলামি, আদ-দিমাশকি, (মৃত্যু: ৬৬০ হি.), *কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম,* নিরীক্ষণ: তহা আবদুর রউফ সাআদ, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, কায়রো, মিসর, (১৪১৪ হি./১৯৯১ খ্রি.)।
- আল-কারাফি, শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনু ইদরিস, আল-মালিকি, (মৃত্যু: ৬৮৪ হি.), *আল-ফুরুক, (আনওয়ারুল বুরুক ফি আনওয়াইল ফুরুক),* আলামুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন।
- আন-নাসাফি, হাফিজ উদ্দিন, আবুল বারাকাত, আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু মাহমুদ, (মৃত্যু: ৭১০ হি.), *কাশফুল আসরার শরহুল মুসান্নাফ আলাল মানার,*

আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, বৌলাক, মিসর, (১ম মুদ্রণ: ১৩১৬ হি./১৮৯৮ খ্রি.)।

- আলাউদ্দিন বুখারি, আবদুল আজিজ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, আল-হানাফি, (মৃত্যু: ৭৩০ হি.), *কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাভি,* দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন।
- আল-ইসপাহানি, শামসুদ্দিন, আবুস-সানা, মাহমুদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আহমদ, (মৃত্যু: ৭৪৯ হি.), *বায়ানুল মুখতাসার শরহু মুখতাসারিল মুনতাহা লি ইবনি হাজেব ফি উসুলিল ফিকহি,* নিরীক্ষণ: ড. মুহাম্মদ মুজহির বাকা, মারকাজু ইহয়ায়িত তুরাসিল ইসলামি, মক্কা, সৌদি আরব (১ম মদ্রণ: ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।
- আস-সুবকি, তাজউদ্দিন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনু তাকিউদ্দিন, (মৃত্যু: ৭৭১ হি.), আল-*আশবাহ ওয়ান-নাজায়ির,* দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১১ হি. /১৯৯১ খ্রি.)।
- আশ-শাতিবি, ইবরাহিম ইবনু মুসা ইবনু মুহাম্মদ আল-লাখমি, আল-গারনাতি, (মৃত্যু: ৭৯০ হি.), *আল-মোয়াফাকাত,* নিরীক্ষণ: আবু উবাইদাহ, মাশহুর ইবনু হাসান আলে সুলায়মান, দারু ইবনি আফফান লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজিহ, মক্কা, সৌদি আরব (১ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।
- আত-তাফতাযানি, সাআদুদ্দিন মাসউদ ইবনু ওমর, (মৃত্যু: ৭৯৩ হি.), *আত-তালবিহ আলাত-তাওজিহ,* তাবআতু মুহাম্মদ আলি সাবিহ, আল-মাতবাআতুল খাইরিয়্যাহ, মিসর, (১ম সংস্করণ: ১৩২২ হি./১৯০৪ খ্রি.)।
- আজ-জারকাশি, বদরুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বাহাদুর, (মৃত্যু: ৭৯৪ হি.), *আল-মানসুর ফিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ,* নিরীক্ষণ: ড. কবির ফায়িক, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত, (২য় মুদ্রণ: ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.)।
- ইবনু রজব আল-হাম্বালি, যাইনুদ্দিন আবদুর রহমান, ইবনু আহমদ ইবনু রজব, আস-সুলামি, আল-বাগদাদি, সুম্মাদ-দিমাশকি, (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.), আল-কাওয়াইদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
- আল-মাহাল্লি, জালালুদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনু আহমদ, (মৃত্যু: ১৩৫৭ হি.), *শরহুল জালাল আল-মাহাল্লি আলা জামইল জাওয়ামি,* মাতবাআতু মোস্তফা আল-হালাবি, (১৩৫৬ হি./১৯৩৭ খ্রি.)।

- আস-সুয়ুতি, জালালুদ্দিন, আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর, (মৃত্যু: ৯১১ হি.):
  - *আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ির,* দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। (১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি.)।
  - *আল-জামিউস-সাগির ওয়া জিয়াদাতুহু,* নিরিক্ষণ: মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১১ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।
- ইবনু নুজাইম, যায়নুদ্দিন ইবনু ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মদ আল-মিসরি, (মৃত্যু: ৮৭৯ হি.), *আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ির আলা মাজহাবি আবি হানিফাতান নোমান,* নিরীক্ষণ: আশ-শায়খ জাকারিয়া উমাইরাত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।
- আল-বান্নানি, আবদুর রহমান ইবনু জাদুল্লাহ আল-মাগরিবি, (মৃত্যু: ১১৯৮ হি.), *হাশিয়াতুল বান্নানি আলা শারহিল জালাল আল-মাহাল্লি আলা জামইল জাওয়ামি,* মাতবাআতু মোস্তফা আল-হালাবি, (১৩৫৬ হি./১৯৩৭ খ্রি.)।
- আশ-শাওকানি, মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানি, (মৃত্যু: ১২৫০ হি.), *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হক্কি মিন ইলমিল উসুল,* নিরীক্ষণ: আহমদ আযূউ ইনায়াহ, দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।
- আহমদ আজ-জারকা, আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ওসমান, (মৃত্যু: ১৪৮৫ হি.), *শরহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ,* নিরীক্ষণ: মোস্তফা আহমদ আজ-জারকা, দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া, (২য় মুদ্রণ: ১৪০৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।
- মাহমুদ আফেন্দি হামজা, মাহমুদ ইবনু মুহাম্মদ নুসাইব ইবনু হুসাইন ইবনু ইয়াহইয়া হামজা আল-হুসাইনি, আল-হামজাভি, আল-হানাফি, (মৃত্যু: ১৩০৫ হি.), *আল-ফারায়িদুল বাহিয়্যাহ ফিল-কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ,* মাতবাআতু হাবিব আফেন্দি, দামেশক, সিরিয়া, (২য় মুদ্রণ: ১২৯৮ হি./১৮৮৯ খ্রি.)।
- আল-বারকাতি, মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদি, আল-হুসাইনি, আল-বাংলাদেশি, আল-হানাফি, (মৃত্যু: ১৩৯৫ হি.):

- *কাওয়াইদুল ফিকহ,* আস-সাদাফ পাবলিশার্স, করাচি, পাকিস্তান, (১ম সংস্করণ: ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)।
- *ফিকহুস-সুনান ওয়াল-আসার,* আল-মাতবাআতুল মাজিদিয়্যাহ, কানপুর, হিন্দুস্তান, (১ম সংস্করণ: ১৩৫৯ হি./১৯৪০ খ্রি.)।

◆ মোস্তফা আজ-জারকা, মোস্তফা আহমদ আজ-জারকা, (মৃত্যু: ১৪১৬ হি.), *আল-মাদখালুল ফিকহিল আম ইলাল হুকুকিল মাদানিয়্যাহ ফিল বিলাদিল আরাবিয়্যাহ,* দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া, (১ম সংস্করণ: ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.)।

◆ আলি জুমুআহ, ড. আলি জুমুআহ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব, *আল-মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাজাহিবিল ফিকহিয়্যাহ,* দারুস-সালাম লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজিহ ওয়াত-তারজামাহ, কায়রো, মিসর, (৪র্থ সংস্করণ: ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.)।

◆ আন-নদভি, আলি আহমদ ইবনু গোলাম মুহাম্মদ, *আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ: মাফহুমুহা ওয়া নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা ওয়া দিরাসাতু মুআল্লাফাতিহা, আদিল্লাতুহা, মাহাম্মাতুহা তাতবিকাতুহা,* দারুল কলম লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজি, দামেশক, সিরিয়া, (৩য় মুদ্রণ: ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)।

◆ আল-খিন, ড. মোস্তফা সাঈদ, *আসারুল ইখতিলাফি ফিল কাওয়াইদিল উসুলিয়্যাতি ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা,* মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজি, বৈরুত, লেবানন, (৩য় মুদ্রণ: ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)।

◆ মুহাম্মদ সিদকি আলে বরনো, ড. আবুল হারিস, মুহাম্মদ সিদকি ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আল-গাজ্জি, *আল-ওয়াজিয ফি ইদাহি কাওয়াইদিল ফিকহিল কুল্লিয়াহ,* মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ লিত-তাবাআহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওজি, বৈরুত, লেবানন, (৪র্থ মুদ্রণ: ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.)।

◆ লাজনাতুন মুকাউওয়ানাতুন মিন ইদ্দাতি ওলামা ওয়া ফুকাহা ফিল খিলাফাতিল ওসমানিয়্যাহ, *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ,* নিরীক্ষণ: নজিব হুওয়াউইনি, কারখানায়ে তিজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান।

ঙ. অভিধান:

- আর-রাগিব আল-ইসপাহানি, আবুল কাসেম আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ, (মৃত্যু: ৫০২ হি.), *আল-মুফরাদাতু ফি গারিবিল কুরআন,* নিরীক্ষণ: মুহাম্মদ সাইয়্যিদ কিলানি, তাবআতু মোস্তফা আল-হালাবি, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৩৮১ হি./১৯৬১ খ্রি.)।
- আশ-শরিফ আল-জুরজানি, আলি ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলি আজ-জাইন, (মৃত্যু: ৮১৬ হি.), *আত-তারিফাত,* দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)।
- আবুল বাকা আল-কাফাভি, আইয়ুব ইবনু মুসা আল-হুসাইনি আল-কুরাইমি, আল-হানাফি, (মৃত্যু: ১০৯৪ হি.), *আল-কুল্লিয়াত: মুজামুন ফিল-মুসতালাহাতি ওয়াল-ফুরুকি আল-লুগাভিয়্যাহ,* নিরীক্ষণ: আদনান দরবেশ ও মুহাম্মদ আল-মিসরি, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, (২য় মুদ্রণ: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)।
- আত-থানভি, মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনুল কাজি মুহাম্মদ হামেদ ইবনু মুহাম্মদ সাবের আল-ফারুকি আল-হানাফি, (মৃত্যু: ১১৮৫ হি.), *মাওসুআতু কাশ্‌শাফি ইসতিলাহাতিল ফুনুন ওয়াল-উলুম,* নিরীক্ষণ: ড. আলি দাহরুজ, মাকতাবাতু লুবনান, নাশিরুন, বৈরুত, লেবানন, (১ম সংস্করণ: ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.)।

নোট

القواعد الفقهية والأصولية

في ضوء الأحاديث النبوية

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ